

दृष्टि-प्रदीप

জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে খেতে বসেছিলাম আমি আরদাদা। ছোট কাকীমা ডাল দিয়ে গেলেন, একটু পরে কি একটা চচ্চড়িও নিয়ে এলেন। শুধু তাই দিয়ে খেয়ে আমরা দু'জনেভাত প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় ছোট কাকীমাআবার এলেন। দাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কাকীমা, আজ মাছ ছিল যে, মাছ কই ?

আমি অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম, লজ্জা ওঅস্বস্তিতে আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। দাদা যেন কি ! এমনবোকা ছেলে যদি কখনো দেখে থাকি। আমার অনুমানইঠিক হ'ল, কাকীমা একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন—মাছযা ছিল, আগেই উঠে গেছে বাবা, ওই দিয়ে খেয়ে নাও। আর একটু ডাল নিয়ে আসবো ?

দাদার মুখ দেখে বুঝলাম, দাদা যেন হতাশ হয়েছে। মাছখাবার আশা করেছিল, তাই না পেয়ে। মনটায় আমার কষ্ট হ'ল। দাদা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না—দেখছেএখানে আমরা কি অবস্থায় চোরের মত আছি, পরের বাড়ি, তাদের হাত-তোলা দু-মুঠো ভাতে কটি ভাইবোনকোনরকমে দিন কাটিয়ে যাচ্ছি, এখানে আমাদের না আছেজোর, না আছে কোনো দাবি—তবুও দাদার চৈতন্য হয় না, সে আশা ক'রে বসে থাকে যে এই বাড়ির অন্যান্যছেলেদের মত সেও যত্ন পাবে, খাবার সময় ভাগের মাছপাবে, বাটি-ভরা দুধ পাবে, মিষ্টি পাবে। তা পায়ও না, নাপেয়ে আবার হতাশ হয়ে পড়ে, আশাভঙ্গের দৃষ্টিতে এদিকওদিক চায়—এতে আমার ভারি কষ্ট হয়, অথচ দাদাকেওআসল অবস্থাটা খুলে বলতে পারিনে, তাতেও কষ্ট হয়।

দাদা বাইরে এসে বললে—মাছ তো কম কেনা হয়নি, তার ওপর আবার মাঠের পুকুর থেকে মাছ এসেছিল—এত মাছ সব হারু আর ভুন্টিরা খেয়ে ফেলেচে ! বাবারে, রান্নোস সব এক-একটি ! একখানা মাছও খেতে পেলাম না।

দাদাকে ভগবান এমন বোকা ক'রে গড়েছিলেন কেনতাই ভাবি।

সীতা এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এই সে-দিনও তো দেখেছি সীতা রান্নাঘরে খেতে বসেচে—সামনেই জ্যাঠাইমাও খেতে বসলেন। জ্যাঠাইমাকে ভুবনের মা এককাঁসি মাছের তরকারি দিয়ে গেল, বড় বড় দাগা মাছ আট-দশখানা তাতে—আর সীতাকে দিলে তার বরাদ্দমতএকটুকরো—জ্যাঠাইমা মাছ যত পারলেন খেলেন, বাকীটাকাঁসিতেই রেখে দিলেন, সেই পাতে তাঁর ভাগ্নে-বৌবসবে। সীতার পাতে তো একখানা মাছও নিজের পাতথেকে দিতে পারতেন। কিন্তু কই, তা নিয়ে সীতা তো কখনোকিছু বলে না, দুঃখ করে না, নালিশ করে না ! আমি জানতে পারলাম এই জন্যে যে, আমি সে-সময় নিতাইকাকার জন্যেআগুন আনতে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম—সীতা কোন কথা আমায় বলেনি। এ বাড়ির কাণ্ডই এ রকম, আজ এক বছরেরওপর তো দেখে আসচি। অবিশ্যি নিজের জন্যে আমি গ্রাহ্যও করিনে, আমার দুঃখ হয় ওদের জন্যে।

মায়ের দুঃখও এ বাড়িতে কম নয়। অত খাটুনির অভ্যেস মায়ের ছিল না কোনো কালে। এই শীতকালে মাকে গোছাগোছা বাসন নিয়ে ভোরে পুকুরের জলে নামতে হয়, মা'কে আর সীতাকে। খিড়কি পুকুরের জল সকালে থাকে ঠাণ্ডাবরফ, রোদ তো পড়ে না জলে কোন কালেই, চারিধারে বড়বড় আম আর সুপুরির বাগান। এতটুকু রোদ আসে না ঘাটে, সেই কনকনে হিমজলে বসে বাসন মাজা, যেমন তেমন ক'রে মাজলে তো এ বাড়িতে চলবে না, কোথাও দাগথাকবার জো নেই একটু, জ্যাঠাইমা দেখে নেবেন নিজে। সে যে কি কষ্ট হয় মায়ের, মা মুখ বুজে কাজ করে যান, বলেন না কিছু, আমি তো বুঝতে পারি ! ও-সব কাজ কি মাকরেছেন কখনো ?

সকলের চেয়ে কাজ বাড়ে পূজো-আচার দিনে—এবাড়িতে বারো মাসের বারোটা পূর্ণিমাতে নিয়মিত ভাবে সত্যনারায়ণের সিন্ধি হয়। গৃহদেবতা শালগ্রামের নিত্যপূজা তো আছেই। তা ছাড়া লক্ষীপূজা মাসে একটা লেগেইথাকে। এ-সব দিনে সংসারের দৈনিক বাসন বাদে পূজোরবাসন বেরোয় ঝুড়িখানেক। এঁদের সংসার অত্যন্ত সাত্ত্বিকগোঁড়া হিন্দুর সংসার—পূজো-আচার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবার জো নেই। সে ব্যাপারে

দেখাশুনো করেন জ্যাঠাইমা স্বয়ং। ফলে ঠাকুরঘরের কাজ নিয়ে যাঁরা খাটাখাটুনি করেন, তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

পুজোর বাসন যে-দিন বেরোয়, মা সে-দিন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যান ঘাটে। সে যতটা পারে মাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাতে ও-সব কাজে তার অভ্যেস নেই একেবারেই। জ্যাঠাইমার পছন্দমত পুজোর বাসন মাজতে সক্ষম হওয়া মানে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া—বরং বোধ হয় শেষেরটাই কিছু সহজ। জ্যাঠাইমাবলবেন,—কোষাকুশি মাজবার ছিরি কি তোমার সেজবৌ ?কতদিন ব'লে দিইচি তামার পাওরে তেঁতুল নেবু না দিলেম্যাড়ম্যাড় করবেই—শুধু বালি দিয়ে ঘষলে কিআর—ঠাকুরদেবতার কাজগুলোও তো একটু ছেঁদা ক'রেলোকে করে ?সব তাতেই খিরিস্টানি—

মা জবাব খুঁজে পান না। যদি তিনি বলতে যান—“নাবড়দি, নেবু ঘষেই তো ঠাকুর ঘরের তামার বাসনবরাবরই—”

জ্যাঠাইমা বাধা দিয়ে বলবেন, আমার চোখে তো এখনো ঢালা বেরোয়নি সেজবৌ ?অম্বলতা দিয়ে বাসনমাজলে অমনি ছিরি হয় বাসনের ?কাকে শেখাতে এসেচ?কি বলব, ভুবনের মা হেঁসেলের কাজ সেরে সময় করতেপারে না, নইলে বাসন-মাজা কাকে বলে—

জ্যাঠাইমা নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না, আর কেনই বা পারবেন, তিনিই যখন এ বাড়ির কত্রী, এ বাড়ির সর্বসর্বা পুত্রবধূরা, জায়েরা, ভাগ্নেবৌ, মাসীর দল, পিসির দল, সবাই যখন মেনে চলে—ভয় করে।

আমার ইস্কুলের পড়াটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচি, এদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাই তা'হলে।

ভুবনের মা সকালে আমাকে ডেকে বললে, জিতু, তুমি যখন ইস্কুলে যাও, ভুবনকেও নিয়ে যেও না ?ওর লেখাপড়া তো হ'ল না কিছু, আমি মাসে মাসে আট আনা মাইনেদিতে পারি, জিজ্ঞেস করে এসো তো ইস্কুলে, তাতে হয়কিনা ?

আমি বললাম—দেবেন কাকীমা, ওতেই হয়ে যাবে, ওরতো নিচু ক্লাসের পড়া, আট আনায় খুব হবে।

ভুবনের মা আঁচল থেকে একটা আধুলি বের ক'রেআমায় দিতে গেল। বললে—তাহলে নিয়ে রেখে দাও, আরআজ ভাত খাওয়ার সময়ে ভুবনকেও ডেকে খেতে বসিও।ও আমার কথা শোনে না—তুমি একবার ইস্কুলেভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলে তারপরথেকে ভয়ে ভয়ে আপনি যাবে। মাথার ওপর কেউ নেই,বেজায় বেয়াড়া হয়ে উঠে দিন দিন।

তার পর আমার হাত দুখানা খপ্ ক'রে ধরে ফেলেমিনতির সুরে বললে, এই উব্গারটুকু তোমাকে করতে হবে বাবা জিতু—আমার কেউ নেই, কাউকে বলতে পারি নে, বৌ মানুষ, কপালই না হয় পুড়েচে, কিন্তু কি ব'লে যার-তার সঙ্গে কথা কই বলো তো বাবা ?ব'লো একটু ভুবনকেবুঝিয়ে।

এই ভুবনের মা এ বাড়িতে কি রকমে ঢুকলো, মার মুখেসে কথা আমি শুনেচি। এই গাঁয়েই ওর বাড়ি। ওর একসতীন আছে, স্বামী মারা যাওয়ার পরে সম্পত্তির অর্ধেকভাগ পাছে দখল করতে না পেরে ওঠে, এই ভয়েজ্যাঠামশায়ের নামে বুঝি লেখাপড়া ক'রে দেয়। কথা থাকে, এরা ওদের দুজনকে চিরকাল খেতে পরতে দেবে। কিন্তু এ বাড়িতে ভুবনের মা আছে চাকরানীরও অধম হয়ে।রাঁধুনীকে রাঁধুনী, চাকরানীকে চাকরানী। আর এত হেনস্থাওসবাই মিলে করে ওকে !

ভুবনের মা হয়েছে এ সংসারে অমঙ্গলের থার্মোমিটার।অর্থাৎ মঙ্গল যখন আসে, তখন ভুবনের মায়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই—অমঙ্গল এলেই কিন্তু ভুবনের মায়েরদোষ। জ্যাঠাইমা অমনি বলবেন—যেদিন থেকে

ও আমারবাড়ি ঢুকেচে, সেইদিন থেকেই জানি এ বাড়ির আর ভাষ্যনেই। সাত কুল খেয়ে যে আসে, তার কি আর—তখুনি কর্তাকে বলেছিলাম ও পাপ ঢুকিও না সংসারে, তা কাঙালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে !

আমি নিজের কানে কতদিন এ ধরনের কথা শুনেচি। মা বলেন, ভুবনের মায়ের মত বোকা লোক তিনি কখনো দেখেননি।

চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে মেজকাকার ছেলে সলিলবললে—জানো জিতুদা, মঙ্গলবারে আমাদের বাড়িতেগোপীনাথ জীউ ঠাকুর আসবেন ও পাড়ায়মেজ-জ্যাঠামশায়দের বাড়ি ঠাকুর এখন আছেন, মঙ্গলবারেআসবেন, দু-মাস থাকবেন, তারপর আবার হরিপুরেরবন্দাবন মুখুয়োর বাড়ি থেকে তারা নিতে আসবে। বছরেএই দু-মাস আমাদের পালা।

দাদাও সেখানে ছিল, বললে,খুব খাওয়ান-দাওয়ান হবে?

সলিল বললে—যে-দিন আসবেন, সে-দিন তো গাঁয়েরসব ব্রাহ্মণের নেমস্তম্ভ, তা ছাড়াও রোজ বিকেলে শেতলহবে, রাত্তিরে ভোগ—সে ভারি খাওয়ার মজা।

দাদা ও আমি দু-জনেই খুশী হয়ে উঠি। মঙ্গলবার সকালথেকে বাড়িতে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেল, ঠাকুরঘর ধোওয়া শুরু হ'লবাসন-কোসন কাল বিকেল থেকেই মাজাঘষাচলচে, ভুবনের মা রাত থাকতে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেছে, পাড়ার অনেক ঝি-বউ অবিশ্যি যথেষ্ট কাজে সাহায্য করচে, একটি দল তো কাল রাত থেকে তরকারি কুটচে একরাশ।

কাকীমারা কাল বিকেল থেকে ক্ষীরের সন্দেশ ও নারকেলের লাডু গড়তে ব্যস্ত আছেন। ঝিটুকিপোতার গোলাবাড়ি থেকে গাড়িখানেক আখ, শশা, কলা, নারকোল এসেচে, সেগুলো কাটা, ছাড়ানোব্যাপারে বাড়ির ছোটছোট মেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে ধোওয়া কাপড় পরিয়েলাগানো হয়েছে।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকাল সকাল স্নান সেরে ধোয়াধুতি-চাদর গায়ে ঠাকুর আনতে গেল কর্তাদের সঙ্গে, তাঁরাও গরদের জোড় পরে আগে আগে চলেচেন। ছেলেরাকাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বেলা দশটার সময় তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর নিয়ে ফিরলো। জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে দরজাথেকে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন।মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন। ধূপধূনোর ধোঁয়ায় ঠাকুরঘরের বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এ-দৃশ্য কখনো দেখিনি—আমার ভারি আনন্দ হ'ল, ইচ্ছে হ'ল আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরের দোরে দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তুভয় হ'ল পাছে জ্যাঠাইমা বকুনি দেন, বলেন—তুই এখানেদাঁড়িয়ে কেন ?কি কাপড়ে আছিস্ তার নেই ঠিক, যা সরেযা।

এমন অনেকবার বলেচেন—তাই ভয় হয়।

বেলা একটা পর্যন্ত আমাদের পেটে কিছু গেল না। বাড়িরঅন্যান্য ছেলেমেয়েদের কথা স্বতন্ত্র—তাদেরই বাড়ি, তাদেরই ঘরদোর। তারা যেখানে যেতে পারে, আমরা তিনভাইবোনেই লাজুক, সেখানে আমরা যেতে সাহস করি না, কারুর কাছে খাবার চেয়েও খেতে পারিনে। মা ব্যস্ত আছেননানা কাজে, অবিশ্যি হেঁসেলের কাজে তাঁকে লাগানো হয়না এ বাড়িতে, তা আমি জানি। কিন্তু ঝিয়ের কাজ করতে তো দোষ নেই ! বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা কোনদিনইআমাদের খাওয়াদাওয়ার খোঁজ করেন না, আজ তোসকলেই মহাব্যস্ত।

বেলা যখন দেড়টা আন্দাজ, রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমাল ও জ্যাঠাইমার গলার চীৎকার শুনে ব্যাপার কিদেখতে গেলাম ছুটে। গিয়ে দেখি, রান্নাঘরের কোণেছেঁচতলার কাছে দাদা একটা লাউপাতা হাতে দাঁড়িয়ে। জ্যাঠাইমা বকচেন—ওই ঝাড় তো, আর কত ভাল হবেতোমাদের ?এখনো বামুন-ভোজন হ'ল না, দেবতার ভোগ রইল পড়ে, উনি এসেছেন ভোগের আগে পেরসাদ পেতে, —দেবতা নেই, বামুন নেই, ওর শুয়ার-পেট পোরালেই আমার স্বর্গে ঘণ্টা বাজবে যে ! বুড়ো দামড়া কোথাকার—ও-সব খিরিস্টান চাল এ বাড়িতে চলবে

না বোলে দিচ্ছি, মুড়োবাঁটামেরে বাড়ি থেকে বিদেয় ক'রে দেবো জানো না? আমার বাড়ি বসে ও-সব অনাচার হবার জো নেই, যখন করেচ তখন করেচ।

মা কোথায় ছিলেন আমি জানিনে। পাছে তিনি শুনতেপান এই ভয়ে দাদাকে আমি সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে এলাম। দাদা লাউপাতাটা হাতে নিয়েই বাইরে চলে এল। আমি বললাম—ওখানে কি কচ্ছিলে?

দাদা বললে—কি আবার করবো? ভুবনের মা কাকীমার কাছে দুখানা তিলপিটুলি ভাজা চাইছিলাম—বড্ড খিদেপেয়েচে তাই। জ্যাঠাইমা শুনতে পেয়ে কি বকুনিটাই—

ব'লেই লজ্জা ও অপমান ঢাকবার চেষ্টায় কেমন একধরনের হাসলে। হয়তো বাড়ির কোনো ছেলেই এখনোখায়নি, কিন্তু আমরা জানি দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না, চা-বাগানে থাকতে ভাত নামতে-না-নামতেসকলের আগে ও পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরে খেতে বসে যেত। বয়সে বড় হ'লে কি হবে, ও আমাদের সকলের চেয়েছেলেমানুষ।

আজকার সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর আমার বিতৃষ্ণা হ'ল। এদের দয়ামায়া নেই, এই যে ঠাকুর-পুজোর ধুমধাম, এর যেন কোথায় গলদ আছে। কোথায়—তা বোঝা আমারবুদ্ধিতে কুলোয় না, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই যেন কেমনমনের সঙ্গে খাপ খেলোনা আদৌ।

আর কিছুদিন পরে একটু বয়স হ'লে আমি বুঝেছিলামযে, এদের ভক্তির উৎসের মূলে এদের বিষয়-বুদ্ধি ওসাংসারিক উন্নতি। ভগবান এদের উন্নতি করছেন, ফসল বাড়াচ্ছেন, মান-খাতির বাড়াচ্ছেন—এঁরাও ভগবানকে খুবতোয়াজ করছেন—ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে। প্রতিপূর্ণিমায় ঘরে সত্যনারায়ণ পূজো হয়, সংক্রান্তিতে-সংক্রান্তিতেদুটি ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হয়, শুধু তাই নয়—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিয়ে থাকেন বইকেনার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরেরধান, জালাভরা কই মাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিস নৌকা বোঝাই হয়েআসতো। ভক্তিতে আশ্রিত হয়ে তাঁরা প্রতিবার এই সময়পাঁঠাবলি দিয়ে মনসাপূজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণদেরখাওয়াতেন। এদের সত্যনারায়ণ পূজো ঘরের সচ্ছলতা বৃদ্ধিকরার জন্যে, লক্ষীপূজো ধনধান্য বৃদ্ধির জন্যে, গৃহ-দেবতারপূজো, গোপীনাথ জীউর পূজো—সবারই মূলে—হে ঠাকুর, ধনেপুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তা হ'লে তোমাকেওখুশী রাখবো।

বাবার মুখে শুনেচি, এ সমস্ত বাড়িঘর আমার ঠাকুরদাদাগোবিন্দলালমুখুয়োর তৈরি। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন বয়স বেশী নয়। তিনি আমার বাড়িতে মানুষ হন এবং তারপর চাকরি নিয়ে বিদেশে বার হয়ে যান। জ্যাঠামশাইয়ের বাবা নন্দলালমুখুয়ে নায়েবী কাজে বিস্তরপয়সা রোজগার করেছিলেন এবং আবাদ অঞ্চলে একশোবিঘে ধানের জমি কিনে রেখে যান। আবাদ-অঞ্চল মানে কি, আমি এতদিনেও জানতাম না, এই সেদিন জ্যাঠামশাইদেরআড়তের মুহুরী যদু বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছি।

জ্যাঠামশাই পাটের ব্যবসা ক'রে খুব উন্নতি করেছেন। এঁদের বর্তমান উন্নতির মূলেই এঁদের পাটের ও ধানেরকারবার। জ্যাঠামশাইরা তিন ভাই—সবাই এই আড়তেরকাজেই লেগে আছেন দেখতে পাই। এঁরা বাবার খুড়তুতো ভাই, বাবাই ঠাকুরদাদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। বাবা কোনোকালেই এ-গাঁয়ে বাস করেননি, জমিজমা যা ছিলতাও এখন আর নেই, বাবা বেঁচে থাকতে জ্যাঠামশাইকে বলতে শুনেছিলাম যে, সব নাকি রোডসেস্ নীলামে বিক্রি হয়ে গেছে। সে-সব কি ব্যাপার যত বুঝি আর না বুঝি, এটুকু আজকাল বুঝেছি যে, এখানে আমাদের দাবি কিছু নেই এবং জ্যাঠামশাইদের দয়ায় তাঁদের সংসারে মাথা গুঁজে আমরা আছি।

জ্যাঠাইমাকে আমার নতুন নতুন ভারি ভাল লাগতো, কিন্তু এতদিন আমরা এ বাড়িতে এসেচি, একদিনের জন্যেওআমাদের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেননি—আমাকে ও দাদাকে তো নখে ফেলে কাটেন এমনি অবস্থা। অনবরতজ্যাঠাইমার কাছ থেকে গালমন্দ অপমান খেয়ে খেয়েআমারও মন বিরূপ হয়ে উঠেচে। আজকাল আমি তো জ্যাঠাইমাকে এড়িয়ে চলি, সীতাও তাই, দাদা ভালমন্দ কিছুতেমন বোঝে না, ও নবান্নের দিন বাটি হাতে জ্যাঠাইমায়েরকাছে নবান্ন চাইতে গিয়ে বকুনি খেয়ে ফিরেআসবে—পুকুরের ঘাটে নাকি জ্যাঠাইমা নেয়ে

উঠেআসছিলেন, ও সে-সময় বাঁপিয়ে জলে পড়ার দরুন জলছিটিয়ে তাঁর গায়ে লাগে, সেজন্য মার খাবে—বাসি কাপড়েজ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকে এই সেদিনও মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েচে। কেন বাপু যাওয়া ?

কিন্তু না গেলেই যে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ায় তা নয়, এক সংসারে থাকতে গেলে ছোঁয়াছুঁয়িঠেকাঠেকি না হয়ে তো পারে না, অথচ হ'লেই আর রক্ষেনেই।

জ্যাঠাইমাদের রোয়াকে বসে আমি আর ভুবন খেলছি—এমন সময় জ্যাঠাইমা ওপরের দালান থেকে ঝিন্টু, বাদল, উষা, কাতু—ওদের ডাক দিলেন। ডাকলেন কেন, আমি তা জানি, খাবার খাওয়ার জন্যে—আমি আর ভুবন যে সেখানেআছি, তা দেখেও দেখলেন না। আমি ভুবনকে বসতে ব'লেমায়ের কাছ থেকে বড় এক বাটি মুড়ি নিয়ে এসে দু'জনে খেতে লাগলাম। কাতু ফিরে এলে বললাম—ভাই, এক ঘটিজল নিয়ে আয় না খাবো ! খাবার খাওয়া সেরে আমরা আবার খেলা করছি, এমন সময়ে জ্যাঠাইমা সেখানে এলেন কাপড় তুলতে। রোয়াকের ধারে আমাদের মুড়ির বাটিটার দিকে চেয়ে বললেন—এ বাটিতে হাত ধুয়েচে কে ?এ ঠিকজিতুর কাজ, নইলে অমন মেলোছো এ বাড়ির মধ্যে তোআর কেউ নেই।

কি ক'রে ফেলেছি না জানি ! ভয়ে ভয়ে বললাম—কিহয়েচে জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা মারমুখী হয়ে বললেন—কি হয়েচে দেখতে পাচ্চো না ?দুকুরবেলা কাপড়খানা কেচে আলনায় রেখে গিইচি, কাচা কাপড়খানা জল ছিটিয়ে এঁটো ক'রে বসেআছো ?

মেজকাকীমার এক পিসী না মাসী এ বাড়িতে থাকে, বুড়ী ভারি ঝগড়াটে আর জ্যাঠাইমা খোশামুদে। বয়স পঞ্চাশ ষাটহবে, কালো, একহারা দড়িপাকানো গড়ন—সীতা আর আমিআড়ালে বলি—তাড়কা রাকুসী। নানা ছুতোনাতায় মাকেঅনেকবার বকুনি খাইয়েচে জ্যাঠাইমা-কাকীমাদের কাছে। ওকে দু-চক্ষে আমরা দেখতে পারিনে। জ্যাঠাইমার গলারস্বর শুনে রান্নাঘরের উঠোন থেকে বুড়ী ছুটে এল।—কিহয়েচে বৌমা, কি হয়েচে?

জ্যাঠাইমা বললেন—সন্দেবেলা আফিক ক'রবো বলেকাপড়খানা কেচে আলনায় দিয়ে রেখেচি মাসী—আর বুড়োধাড়ী ছোঁড়া করেচে কি, এখানে মুড়ি খেয়ে সেই বাটিতেই জল দিয়ে হাত ধুয়েচে, আর এই রোয়াকের ধারেই তো কাপড়—তুমি কি বলতে চাও কাপড়ে লাগেনিজলের ছিটে ?

বুড়ী অবাক হবার ভান ক'রে বলে—ওমা সেকি কথা !লাগেনি আবার, একশো বার লেগেচে।

আমি ভাবলাম, বারে ! এতে আর হয়েচে কি ?জল যদি লেগেই থাকে, দু-চার ফোঁটা লেগেচে বই তো নয় ?জ্যাঠাইমাকে বললাম—জল তো ওতে লাগেনি জ্যাঠাইমা, আর যদিও একটু লেগে থাকে, এখনও রোদ রয়েছে, এফুনিশুকিয়ে যাবে'খন।

বুড়ী বললে—শোনো কথা; ও ছোঁড়ার জ্ঞান-কাণ্ডএকেবারেই নেই—একেবারে মেলোছো—ওর মাও তাই হিঁদুয়ানি তত শেখেনি কোনোদিন—

—তোমরা শোন মাসী, আমি শুনে শুনে হৃদ হয়েগিয়েচি। ঘরে ঠাকুর রয়েছেন, আর এই সব অনাচার কিক'রে বরদাস্ত করি বল তো তুমি ?আমার কোনোছেলেমেয়ে ওরকম করবে ?অত বড় ধাড়ী ছেলে হ'ল, মুড়ির বাটিতে জল ঢাললে যে সকড়ি হয় সেও জানে না ! শুনবেকোথা থেকে, মেলোছো খিরিস্টানের মধ্যে এতকালকাটিয়ে এসেচে, ভালো শিক্ষে দিয়েচে কে ?হিঁদুর বাড়িতেকি এ সব পোষায় ?বল তো তুমি—

বুড়ী বললে—ওর মা জানে না তা ও জানবে কোথাথেকে ?সেদিন ওর মা করেছে কি, পুকুরঘাটে তো বড়নৈবিদ্যির বারকোশখানা ধুতে নিয়ে গিয়েচে—যেদিন ঠাকুরএলেন (বুড়ী দু-হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে) তার পরের দিন—আমি দাঁড়িয়ে ঘাটে, কাপড় কেচে যখন উঠলিতখন ধোওয়া বারকোশখানা আর একবার জলে ডুবো—না ডুবিয়েই অমনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখে বলি, ওকি কাণ্ড বউ ?ভাগ্যিস দেখে ফেললাম তাই তো—

মায়ের দোষ দেওয়াতেই হোক, বা আমাকে আগের ওই-সব কথা বলাতেই হোক, আমার রাগ হ'ল। তা ছাড়া আমার মন বললে এতে কোন দোষ হয়নি—মুড়ির বাটিতে জল ঢালার দরুন মুড়ির বাটি অপবিব্রহবে

কেন ? মাঝারকোশ ধুয়ে জলের ধারে রেখে স্নান সেরে উঠে যদি সেবারকোশ নিয়ে এসে থাকেন, তাতে মা কোন অন্যায কাঙ্করেননি। বললাম—ওতে দোষ কি জ্যাঠাইমা, মুড়িও খাবারজিনিস, জলও খাবার জিনিস— দুটোতে মেশালে খারাপহবে কেন, ছুঁতে থাকবেই বা না কেন ?

জ্যাঠাইমা অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন—তোর কাছে শাস্তরশুনতে আসিনি, ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার—তোরা তোখিরিস্টান, হিঁদুর আচারব্যভার তোরা জানিস কি, তোর মা-ই বা জানে কি ? ওইটুকু ছেলে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার আমায় শাস্তর বোঝাতে আসেন ! শিখবিকোথেকে, তোর মা তোদের কি কিছু শিখিয়েচে, না কিছুজানে ? পয়সা রোজগার করেচে আর দু-হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা—মদ খেয়ে খিরিস্টানি কোরে—

বুড়ী বললে—মোলোও সেই রকম। যেমন-যেমনকম্মফল তেমন-তেমন মিত্যু ! দশেধম্মে দেখলে সবাই, যেকম্মের যে শাস্তি—ঘর থেকে মড়া বেরোয় না, ও-পাড়ারহরিদাস না এসে পড়লে ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতো—

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে এ কথা বলাতে আমার রাগ হ'ল। মরণের পরে এখনো তার কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়, যদিও সে কথা কাউকে বলিনে। বললাম—ভাল মরণ আর মন্দমরণ নিয়ে বাহাদুরি কি দিদিমা ? এই তো মাঘ মাসে ওইতৈঁতুলতলায় যাদের বাড়ি, ওই বাড়ির সেই বুড়োগাঙ্গুলীমশায় মারা গেলেন, তিনি তো ভালমানুষ ছিলেনসবাই বলে, পুকুরের ঘাটে এক বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েআফ্রিক করতেন, তবে তিনি পেন্সন্ আনতে গিয়ে ও-রকমক'রে সেখানে মারা গেলেন কেন ? সেখানে কে তাঁর মুখেজল দিয়েচে, কে মড়া ছুঁয়েছে, কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, ও-রকম হ'ল কেন ?

আমার বোকামি, আমি ভেবেছিলাম ঠিকমত যুক্তিদেখিয়ে বুড়ীকে তর্কে হারাবো, কিন্তু তার ধরনের ঝগড়ায়মজবুত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে অত সহজে হার মেনে নেবে, এ ধারণা করাই আমার ভুল হয়েছিল। সে যুক্তির পথেগেলই না।

—মরুক বুড়ো গাঙ্গুলী, তবুও খবর পেয়ে তারছেলেজামাই গিয়ে তাকে এনে গঙ্গায় দিয়েছিল, তোরবাবার মত দোগেছের মাঠে ডোবার জলে আধ-পোড়া ক'রেফেলে রেখে আসেনি ! আমি সব জানি, আমায় ঘাঁটাস্নে, অনেক আদিনাড়ির কথা বেরিয়ে যাবে। কাঠ জোটেনিখেজুরের ডাল দিয়ে পুড়িয়েছিল, সব শুনিচি আমি। দোগেছের মাঠে সন্দের পর লোক যায় না, সবাই বলেএখনও ভূত হয়ে—

কথা সবই সত্যি, শেষেরটুকু ছাড়া। ঐটুকুর ওপরই জোরদিয়ে বললাম—মিথ্যে কথা, বাবা কখখনো,—তার যুক্তিরঅকাট্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এমন একটা কথা ব'লেফেললাম যা কখনো কারুর কাছে বলিনি বা খুব রেগেমরীয়া না হয়ে উঠলে বলতামও না এদের কাছে। বললাম—জানেন, আমি ভূত দেখতে পাই, অনেক দেখেচি, বাবাকে তা হলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম, জানেন ? চা-বাগানে থাকতে আমি কত—

এই পর্যন্ত বলেই আমি চুপ করে গেলাম। দিদিমা খিলখিল করে হেসেই খুন।—হি হি, এ ছোঁড়াও পাগল ওর বাপের মত—হি হি—শুনেচো বউমা, হি হি— কিবলেশুনেচো একবার—

জ্যাঠাইমা বললেন—যা এখন থেকে এই মুড়ির বাটিতুলে ধুয়ে নিয়ে আয় পুকুর থেকে, এখনটা গাড়ুর জলদিয়ে ধুয়ে দে। আমার কাপড়খানাও কেচে নিয়ে আয় অমনি, তোর সঙ্গে কে এখন সন্দে অবধি তক্কো করে ? তবে ব'লে দিচ্ছি, হিঁদুর ঘরে হিঁদুর মত ব্যাভার না করলে এ বাড়িতেজায়গা হবে না। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। কই আমাদের বলু, ভুন্টি, হাবু কি সতীশ তো কখনো এমন করে না, যা বলি তখুনি তাই তো শোনে, কই এক দিনের জন্যেও তো—

দিদিমা বললেন—ওমা; বলু, হাবু, সতীশের কথা ব'লোনা, তারা আমার বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে সব। তারা হিঁদুয়ানির যা জানে ওর মা তা জানে না তো ও ! সেদিন সতীশকে বলচি, সতু দাদাভাই, তেলের ভাঁড়টা বাইরের উঠোনে নিমু কলুকে দিয়ে এসো তো ? তো বলচে—আমারবিছানার কাপড়, আমি তোভাঁড় ছোঁব

না। আমি মনে মনেভাবলাম, দ্যাখো শিক্ষের গুণ দ্যাখো—কেমন ঘরে মানুষতারা। আহা বেঁচে থাক—সব বেঁচে থাক—

মনে মনে সতীশের প্রশংসা করতে চেষ্টা করলাম। সতীশ যে স্বীকার করেছে তার কাপড় বাসি, এটা অবিশ্যি প্রশংসারযোগ্য। কিন্তু বাসি কাপড়ে কিছু ছোঁয়া যে খারাপ কাজ, এ বিশ্বাস যার নেই, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে, এআমি বুঝতে পারিনে। যেমন এখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, নিমু কলু কি কাচা, ধোয়া, শুদ্ধ গরদের জোড়প'রে তেল বেচতে এসেছিল ?সতীশের ভেবে দেখবারক্ষমতা ও বুদ্ধির চেয়ে যদি কারুর বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তিবেশী থাকে, তার জন্যে তাকে কি নরকে পচে মরতে হবে ?

তিন বছর এখনও হয়নি, আমরা এ গাঁয়ে এসেছি। তার আগে ছিলাম কার্শিয়াঙের কাছে একটা চা-বাগানে, বাবা সেখানে চাকরি করতেন। সেখানেই আমি ও সীতা জন্মেছি, (কেবল দাদা নয়, দাদা জন্মেছে হনুমান-নগরে, বাবা তখনসেখানে রেলের কাজ করতেন) সেখানেই আমরা বড় হয়েছি, এখানে আসবার আগে এত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-বোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুরা গাছের বন, পাহাড়ী ডালিয়ার বন, ঝর্ণা, কনকনে শীত, দূরে বরফে ঢাকা বড় বড় পাহাড়-পর্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি। এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে চা-বাগানের কথা, আমাদের নেপালী চাকর থাপার কথা, উম্প্লাঙের ডাক-রানার খড়া সিং যে আমাদের বাংলাতে মাঝে মাঝেভাত খেতে আসতো—তার কথা, মিস নর্টনের কথা, পচাংবাগানের মাসীমার কথা, আমাদের বাগানের নীচের সেই অদ্ভুত রাস্তাটার কথা, মনে হয়।

সেই সব দিনই আমাদের সুখে কেটেচে। দুঃখের শুরু হয়েছে যে-দিন বাংলা দেশে পা দিয়েছি। এই জন্যে এইতিন বছরেও বাংলা দেশকে ভাল লাগলো না—মন ছুটে যায় আবার সেই সব জায়গায়, চা-বাগানে, শেওলা-ঝোলাবড় বড় ওকের বনে, উম্প্লাঙের মিশন হাউসের মাঠে—যেখানে আমি, সীতা, দাদা কতদিন সকালে ফুল তুলতে যেতাম, বড়দিনের সময় ছবির কার্ড আনতে যেতাম, কেমন মিষ্টি কথা বলতো; ভালবাসতো মিস নর্টন। ভাবতে বসলে এক একটা দিনের কথা এমন চমৎকার মনে আসে !...

শীতের সকাল।

বাড়ির বার হয়েই দেখি চারিধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পাইন গাছের ফাঁকে বেশ রোদ। আমি উঠতাম খুব সকালেই, সীতা ও দাদা তখন লেপের তলায়, চা নাপেলে এই হাড়কাঁপানো শীতে উঠতে কেউ রাজী নয়।

শীতও পড়েছে দস্তুরমত। আমাদের বাগানের দক্ষিণে কিছু দূরে যে বড় চা-বাগানটা নতুন হয়েছে, যার বাংলাগুলোর লাল টালির ঢালু ছাদ আমাদের এখান থেকে দেখা যায় পাইন গাছের ফাঁকে, আজ তাদের লোকজনেরা চায়ের চারাগাছ খড়ের পালুটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে বোধ হয় বরফ পড়বার ভয়ে। আকাশ পরিষ্কার, সুনীল, কোনোদিকে এতটুকু কুয়াশা নেই; বরফ পড়বার দিনবটে।

একটু পরে সীতা উঠল। সে রোগা, ফর্সা, ছিপছিপে। সেও দাদা খুব ফর্সা, তবে অত ছিপছিপে আর কেউ নয়। সীতা বললে, থাপা কোথায় গেল দাদা ? আজ ও সোনাদা যাবে ? বাজার থেকে একটা জিনিস আনতে দেবো।

আমি বললাম—কি জিনিস রে ?

সীতা দুষ্টমির হাসি হেসে বললে, বলবো কেন ? তোমরা যে কত জিনিস আনাও, আমায় বলো ?

একটু পরে থাপা এল। সে হুগুয় দু-দিন সোনাদা বাজারে যায় তারকারি আর মাংস আনতে। সীতা চুপি চুপি তাকে কি আনতে ব'লে দিলে, আড়ালে থাপাকে জিজ্ঞেসক'রে জানলাম জিনিসটা একপাতা সেফটিপিন্। এর জন্যে এতো !

একটু বেলায় বরফ পড়তে শুরু হ'ল। দেখতে দেখতে বাড়ির ছাদ, গাছপালার মাথা, পথঘাট যেন নরম থোকাকথোকা পেঁজা কাপাস তুলোতে ঢেকে গেল। এই সময়টা ভারি ভাল লাগে, আগুনের আংটাতে গনগনে আগুন—হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুনের চারিধারে বসে আমি দাদা ও সীতা লুডো খেলতে শুরু ক'রে দিলাম।

এই সময় বাবা এলেন আপিস থেকে। ম্যানেজারেরকুঠীর পাশেই আপিস-ঘর, আমাদের বাংলা থেকে প্রায়মাইলখানেক, কি তার একটু বেশী। বাবা বেলা এগারোটাসময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করেন, তিনটের পরে বেরোন, ওদিকে রাত আটটা-ন'টায় আসেন।

বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে ভালবাসেন।সীতাকে ডেকে বললেন—খুকী থাপাকে বলে দে নাইবার জন্যে জল গরম করতে—আর তোরা সব আজ আমারসঙ্গে খাবি—নিতুকে বলিস নইলে সে আগেই খাবে।

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সীতা গিয়ে বললে—মা,দাদাকে আগে ভাত দিও না, আমরা সবাই বাবার সঙ্গেখাবো।

সীতার কথা শেষ হ'তে না হ'তে দাদা গিয়ে রান্নাঘরেহাজির। দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না—তাই আমাদের সকলের আগে মা তাকে খেতে দিতেন। এদিকে আমাদের ক' ভাই-বোনের মধ্যে বাবা সকলের চেয়েভালবাসতেন দাদাকে ও সীতাকে। দাদাকে খাওয়ার সময়েকাছে বসে না খেতে দেখলে তিনি কেমন একটু নিরাশ হতেন, যেন অনেকক্ষণ ধরে যেটা চাইছিলেন সেটা হ'লনা।

সীতা বললে—দাদা তুমি খেও না, বাবা আজ সকলকেনিয়ে খাবেন। বাবা নাইচেন, এফুনি আমরা খেতেবসবো—

দাদা কড়া থেকে মাকে একটুকরো মাংস তুলে দিতেবললে এবং গরম টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে আবার তখুনি তাড়াতাড়ি বার ক'রে ফেলে বার-দুই ফুঁ দিয়ে আবার মুখেপুরে নাচতে নাচতে চলে গেল। দাদাকে আমরা সবাই খুব ভালবাসি, দাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হলেও এখনোসকলের চেয়ে ছেলেমানুষ। ও সকলের আগে খাবে, সকলের আগে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুরিয়ে কথা বললে বুঝবেনা, অন্ধকারে একলা ঘরে শুতে পারবে না—ওর বয়স যদিও বছর চোদ্দ হ'ল, কিন্তু এখনও আমাদের চেয়ে ওছেলেমানুষ, প্রথম সন্তান ব'লে বাপ-মায়ের বেশী আদরওরই ওপর।

আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা সীতাকেএকপাশে ও দাদাকে আর একপাশে নিয়ে খেতে বসেচেন।মাংসের বাটি থেকে বাবা চর্বি বেছে বেছে ফেলে দিতেইসীতা বললে—বাবা আমি খাবো—

দাদা বললে—তুই সব খাস্নে, আমাকে দু'খানা দে সীতা—

বাবা অত চর্বি ওদের খেতে দিলেন না। ওদের এক একটুকরো দিয়ে বাকি টুকরোগুলো বেড়ালদের দিকে ছুঁড়েফেলে দিলেন। আমায় বললেন—জিতু, গায়ের মাপটা দিসতো তোর, ওবেলা সায়েবের দর্জি আসবে, তার কাছেতোর জামাকরতে দেবো—

সীতা বললে—আমার আর একটা জামা দরকার বাবা—

—তবে তুইও দিস গায়ের মাপটা,—ওই সঙ্গেই দিস—

মা বললেন—তার দরকার কি, তুমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিও না। আমি সব দেখেশুনে দেবো— আরওকরবার জিনিস রয়েছে—নিতুর মোটে দুটো জামা, ওর ওভারকোটটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে—যেমন শীতপড়েছে এবার, ওর একটা ওভারকোট করে দাও—

বিকলে মেমেরা মাকে পড়াতে এল।

মাইল দুই দূরে মিশনারীদের একটা আড্ডা আছে। আমিএকবার মেমসাহেবের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানথেকে খোসালডি চা-বাগানে যে রাস্তাটা পাহাড়ের ঢালুবেয়ে নেমেচে—তারই ধারে ওদের বাংলা। অনেকগুলোলাল টালির ছোট বড় ঘর, বাঁশের জাফরির বেড়ায় ঘেরাকম্পাউন্ড, এই শীতকালে অজস্র ডালিয়া ফোটে, বড় বড়ম্যাগ্নোলিয়া গাছ। আমাদের বাগানে ও বড় সাহেবেরবাংলাতে ম্যাগ্নোলিয়া গাছ আছে।

এরা মাকে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস্ নর্টনদিনাজপুরে ছিল, বেশ বাংলা বলতে পারে। নানা ধরনের ছবিওয়ালা কার্ড, লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট ছাপানোকাগজ, তাতে অনেক মজার গল্প থাকে। দাদার পড়াশুনোয়তত ঝাঁক নেই, আমি ও সীতা পড়ি। একবার একখানা বইদিয়েছিল—একটা গল্পের বই—‘সুবর্ণবণিক পুত্র’। এ কথায়আমি বুঝেছিলাম বণিকপুত্র সোনা দিয়ে গড়া অর্থাৎ সোনারমত ভালো। পাপের পথ থেকে উক্ত বণিকপুত্র কি করেফিরে এসে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে, তারই গল্প। অনেক কথাবুঝতে পারতাম না, কিন্তু বইখানা এমন ভাল লাগতো !...

মেম আসতো দু-জন। একজনের বয়স বেশী—মায়ের চেয়েও বেশী। আর একজনের বয়স খুব কম। অল্পবয়সী মেমটির নাম মিস্ নর্টন—একে আমার খুব ভাললাগতো—নীল চোখ, সোনালী চুল, আমার কাছে মিস্ নর্টনের মুখ এত সুন্দর লাগতো, বার বার ওর মুখের দিকেচাইতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেমন লজ্জা হ’ত—ভালো করেচাইতে পারতাম না—অনেক সময় সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকবার সময় লুকিয়ে এক চমক দেখে নিতাম। তখনি ভয় হ’ত হয়ত সীতা দেখছে—সীতা হয়ত এ নিয়েঠাটা করবে। ওরা আসতো বুধবারে ও শনিবারে। সপ্তাহেরঅন্যদিনগুলো যেন কাটতে চাইত না, দিন গুনতাম কবেবুধবার আসবে, কবে শনিবার হবে। মিস্ নর্টনের মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি—আমার এই এগারো-বারোবছরের জীবনে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি হতাশ হ’তে হ’ত ! দিন গুনে গুনে বুধবার এল, কিন্তু প্রোঁটা মেমটি হয়তো সেদিন এল একা, সঙ্গে মিস্ নর্টন নেই—সারা দিনটা বিশ্বাস হয়ে যেতো, মিস্ নর্টনের ওপর মনে মনে অভিমান হ’ত, অথচ কেনআজ মিস্ নর্টন এল না সে কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতেনলজ্জা হ’ত।

মেমেরা এক-একদিন আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনাকরতে শেখাতো। মা তখন থাকতেন না। আমি, সীতা ও দাদা চোখ বুজতাম—মিস্ নর্টন ও তার সঙ্গিনী চোখবুজতো। ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু’—সবাইএকসঙ্গে গম্ভীর সুরে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতুম সবাই চোখ বুজে আছে, কেবল সীতা চোখ খুলে একবার জিব বার করেই আমার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টমির হাসি হাসলে—পরক্ষণেই আবার প্রার্থনায় যোগ দিলে।

সীতা ঐ রকম, ও কিছু মানে না, নিজের খেয়াল-খুশীতেথাকে, যাকে পছন্দ করবে তাকে খুবই পছন্দ করবে, আবারযাকে দেখতে পারবে না তার কিছুই ভাল দেখবে না। ওরসাহসও খুব, দাদা যা করতে সাহস করে না, এমন কিআমিও যা অনেক সময় করতে ইতস্তত করি—ও তানির্বিচারে করে। আমাদের বাংলো থেকে খানিকটা দূরেবনের মধ্যে একটা দেবস্থান আছে—পাহাড়ীদের ঠাকুরথাকে। একটা বড় সরল গাছের তলায় কতকগুলোপাথর—ওরা সেখানে মুরগী বলি দেয়, ঢাক বাজায়। সবাই বলে ওখানে ভূত আছে, জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনিনির্জন—একবার দাদা তর্ক তুলে বললে আমরা কখনোইওখানে একা যেতে পারবো না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সীতাবাংলোর বার হয়ে চ’লে গেল একাই—কোনো উত্তর না দিয়েই ছুট দিলে পাহাড়ীদের সেই নির্জন ঠাকুরতলারদিকে।...ওই রকম ওর মেজাজ।...

মিস্ নর্টন সীতাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে সীতাকেসঙ্গে নিয়ে যায় ওদের মিশন বাড়িতে, ওকে ছবির বই, পুতুল, কেক, বিস্কুট কত কি দেয়—ছবি আঁকতে শেখায়, বুনতে শেখায়—এরই মধ্যে সীতা বেশ পশমের ফুল তুলতেপারে, মানুষের মুখ, কুকুর আঁকতে পারে। ওরা আমাকেওঅনেক বই দিয়েচে—মথি-লিখিত সুসমাচার, লুক-লিখিতসুসমাচার, যোহন-লিখিত সুসমাচার, সদাপ্রভুর কাহিনী—আরো অনেক সব। যীশু একটুকরো মাছ ও আধখানারুটিতে হাজার লোককে ভোজন করালেন—গল্পটা পড়েএকবার আমার হঠাৎ মাছ ও রুটি খাবার সাধ হ’ল। কিন্তুমাছ এখানে মেলে না—মা ভরসা দিলেন খাওয়াবেন, কিন্তুদু মাসের মধ্যেও সেবার মাছ পাওয়া গেল না, আমার শখও ক্রমে ক্রমে উবে গেল।

বাবার বন্ধু দু-একজন বাঙালী মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে দু-একদিন থাকেন। মেমেরা মাকে পড়াতে আসে, এ ব্যাপারটা তাঁদের মনঃপূত নয়। বাবাকে তাঁরা কেউ কেউ বলেছেনও এ নিয়ে। কিন্তু বাবা বলেন—ওরা আসে, এজন্যে এক পয়সা নেয় না—অথচ সীতাকে ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে—কি

ক'রে ওদের বলিতোমরা আর এসো না ?তা ছাড়া ওরা এলে মেয়েদেরসময়ও ভালোই কাটে, ওদের কেউ সঙ্গী নেই, এই নির্জন চাবাগানের এক পাশে পড়ে থাকে—একটা লোকের মুখ দেখতে পায় না, কথা বলবার মানুষ পায় না—ওরা যদি আসেই তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কি ?

মায়ের মনের একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী ক'রেখেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতেহয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধোর করেন। সে সময়ে তাঁকেআমরা যমের মত ভয় করি—একা সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মত পালায় না—চা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতেচায় না। সে বাংলাতে থাকে, বলে—মারবে বাবা ?...নাহয়ে মরে যাবো—তা কি হবে ?রোজ এ রকম ছুটোছুটি করার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বাবার এই ব্যাপারেরজন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই—অথচ বাবা যখনপ্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়াভার—এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছেডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান—কিন্তুমদ খেলেই একেবারে বদলে গিয়ে অন্য মূর্তি ধরেন, তখনবাংলো থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্যউপায় থাকে না।

মা'র ইচ্ছে ছিল মেমেদের ধর্মের এই বই পড়ে যদিবাবার মতিগতি ফেরে। মেমেরা মদ্যপানের কুফলেরবর্ণনাসূচক ছোট ছোট বই দিয়ে যেতো—মা সেগুলো বাবার বিছানায় রেখে দিতেন—কে জানে বাবা পড়তেন কিনা—কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে আমাদের মাসের মধ্যেতিন-চারবার চা-ঝোপের আড়ালে লুকোনো বন্ধ হয়নি।

প্রায়ই আমি আর সীতা কোর্ট রোড ধ'রে বেড়াতেবেরুই। আমাদের বাগান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ছোটঘর আছে, আগে এখানে পোস্ট আপিস ছিল, এখন উঠেযাওয়াতে শুধু ঘরটা পড়ে আছে—উম্প্লাণ্ডের ডাক-রানারঝড়-বৃষ্টি বা বরফপাতের সময়ে এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয়। এই ঘরটা আমাদের ভ্রমণপথের শেষসীমা, এরওদিকে আমরা যাই না যে তা নয়, কিন্তু সে কালেভদ্রে, কারণ ওখানে থেকে উম্প্লাং পর্যন্ত খাড়া উৎরাই নাকি একমাইলের মধ্যে প্রায় এগারো শ ফুট নেমে গিয়েচে, মিস্টটনের মুখে শুনেচি—যদিও বুঝি নে তার মানে কি।আমাদের অত দূরে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, যা আমরাচাই তা পোস্ট আপিসের ভাঙা ঘর পর্যন্ত গেলেই যথেষ্ট পেতাম—দু-ধারে ঘন নির্জন বন। আমাদের বাগানের নীচেগেলে আর সরল গাছ নেই—বনের তলা আর পরিষ্কারনেই, পাইন বন নেই, সে বন অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, যেমন দুশ্রবেশ্য তেমনি অন্ধকার, কিন্তু আমাদের এত ভাললাগে ! বনে ফুলের অন্ত নেই—শীতে ফোটে বুনো গোলাপ, গ্রীষ্মকালে রডোডেনড্রন বনের মাথায় পাহাড়ের দেওয়ালেলাল আগুনের বন্যা আনে, গায়ক পাখীরা মার্চ মাসেরমাঝামাঝি থেকে চারিধারের নির্জন বনানী গানে মুখরিতকরে তোলে। ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে আমরা শুকনো ঝর্ণারপাশের পথে পাথর ধ'রে ধ'রে নীচের নদীতে নামতাম—অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের দেওয়াল ধ'রে ধ'রে, সীতাপেছনে, আমি আগে। দাদাও এক-একদিন আসতো, তবেসাধারণত সে আমাদের এই সব ব্যাপারে যোগ দিতেভালবাসে না।

এক-একদিন আমি একাই আসি। নদীর খাতটা অনেক নীচে—তার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমেগিয়েচে—যেমন পিছল তেমনি দুর্গম—নদীর খাতে একবারপা দিলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার পিপের মধ্যে ঢুকেগিয়েচি। দু-ধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে—জলতাদের গা বেয়ে ঝরে পড়চে জায়গায় জায়গায়—কোথাওঅনাবৃত, কোথাও গাছপালা, বনফুল, লতা—মাথার ওপরেআকাশটা যেন নীল কার্ট রোড—ঠিক অতটুকু চওড়া, ঐরকম লম্বা, এদিকে-ওদিকে চলে গিয়েচে, মাঝে মাঝেটুকরো মেঘ কার্ট রোড বেয়ে চলেচে, কখনও বা পাহাড়েরএ-দেওয়াল ও-দেওয়াল পার হয়ে চলে যাচ্ছে—মেঘের ঐ খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। নদী-খাতের ধারে একখানা শেওলা ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর বসে ঘণ্টারপর ঘণ্টা মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—বাড়ি ফিরবার কথা মনেই থাকত না।

মাঝে মাঝে আমার কি একটা ব্যাপার হ'ত। ওই রকমনির্জন জায়গায় কতবার একটা জিনিস দেখেচি।...

হয়তো দুপুরে চা-বাগানের কুলীরা কাজ সেরে সরলগাছের তলায় খেতে বসেচে—বাবা ম্যানেজারের বাংলাতে গিয়েচেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্ছে—আমি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধ'রে অনেক দূরে চলেযেতাম—আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে উম্প্লাণ্ডের সেই পোড়ো পোস্ট আপিস ছাড়িয়েও চলে যেতাম - পথ ক্রমেযত নীচে নেমেচে, বনজঙ্গল ততই ঘন, ততই অন্ধকার, লতাপাতায় জড়াজড়ি ততই বেশী—বেতের বন, বাঁশের বনশুরু হ'ত—ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিড ততই ঘন, পাখীডাকত—সেই ধরনের একটা নিস্তন্ধ স্থানে একা গিয়েবসতাম।

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে দেখেচি অনেক দূরেপাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেনআর একটা পথ—আর একটা পাহাড়শ্রেণী—সব যেন মৃদুহলুদ রঙের আলো দিয়ে তৈরি—সে অন্য দেশ, সেখানেওএমনি গাছপালা, এমনি ফুল ফুটে আছে, হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্বতশ্রেণীর ওপরদিয়ে শূন্য ভেদ করে মেঘরাজের ওদিকে কোথায় চলে গিয়েছে—দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ে বাড়িঘর, তাদের লোকজনও দেখেচি, তারা আমাদের মত মানুষ না—তাদের মুখ ভাল দেখতে পেতাম না—কিন্তু তারাওআমাদের মত ব্যস্ত, হলুদ রঙের পথটা তাদের যাতায়াতেরপথ। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখেছি সে-সব মেঘ নয়, মেঘের ওপর পাহাড়ী রঙের খেলার ধাঁধা নয়—সে-সবসত্যি, আমাদের এই পৃথিবীর মতই তাদের বাড়িঘর, তাদের অধিবাসী, তাদের বনপর্বত, সত্যি—আমার চোখের ভুল যেনয় এ আমি মনে মনে বুঝতাম, কিন্তু কাউকে বলতে সাহসহ'ত না—মাকে না, এমন কি সীতাকেও না—পাছে তারাহেসে উঠে সব উড়িয়ে দেয়।

এ রকম একবার নয়, কতবার দেখেছি। আগে আগেআমার মনে হ'ত আমি যেমন দেখি, সবাই বোধ হয় ওরকমদেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি একদিনমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা মা, পাহাড়ের ওদিকেআকাশের গায়ে ও-সব কি দেখা যায় ?...

মা বললেন—কোথায় রে ?

—ওই কার্ট রোডের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম, তাই দেখলাম আকাশের গায়ে একটা নদী—আমাদের মত ছোট নদী নয়—সে খুব বড়, কত গাছপালা—দেখনি মা ?

—দূর পাগলা—ও মেঘ, বিকেলে ওরকম দেখায়।

—না মা, মেঘ নয়, মেঘ আমি চিনিনে ?ও আর একটাদেশের মত, তাদের লোকজন পষ্ট দেখেচি যে—তুমি দেখনিকখনও ?

—আমার ওসব দেখবার সময় নেই, ঘরের কাজ তাইঠেলে উঠতে পারিনে, নিতুটার আবার আজ প'ড়ে পা ভেঙে গিয়েচে—আমার মরবার অবসর নেই—ও-সব তুমিদেখগে বাবা।

বুঝলাম মা আমার কথা অবিশ্বাস করলেন। সীতাকেওএকবার বলেছিলাম—সে কথাটা বুঝতেই পারলে না।দাদাকে কখনো কিছু বলিনি।

আমার মনে অনেকদিন ধ'রে এটা একটা গোপনরহস্যের মত ছিল—যেন আমার একটা কি কঠিন রোগ হয়েছে—সেটা যাদের কাছে বলছি, কেউ বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না, সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আমারসয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছি—ও সবাই দেখে না—যারাদেখে, চুপ ক'রে থাকাই তাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো।

আমাদের বাসা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব সময়ই চোখে পড়ে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসচি বহুদূর দিক্চক্রবালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তুম্বারমৌলি গিরিচূড়ারসারি—বাগানের চারিধারের পাহাড়শ্রেণীর যেন একটুখানিওপরে বলে মনে হত—তখনো পর্যন্ত বুঝিনি যে ওগুলোকত উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটা অনেকদিন পর্যন্ত জানতাম না, আমাদের চাকর থাপাকে জিজ্ঞেস করলে বলত, ও সিকিমের পাহাড়, সেবার বাবা আমাদের

সবাইকে (সীতা বাদে) দার্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে—বাবার পরিচিত একহিন্দুস্থানী চায়ের এজেন্ট ওখানে থাকে, তার বাসায় গিয়ে দু-দিন আমরা মহা আদর-যত্নে কাটিয়েছিলাম—তখন বাবার মুখে প্রথম শুনবার সুযোগ হল যে ওর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। সীতার সেবার যাওয়া হয়নি, ওকে সাঙ্ঘনা দেবার জন্যে বাবা বাজার থেকে ওর জন্যে রঙীন গার্টার, উল আর উলবুনবার কাঁটা কিনে এনেছিলেন।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।...

সেদিনটা আমাদের বাগানের কলকাতা আপিসের বড়সাহেব আসবেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিটন সাহেব। বাবা ও ছোট সাহেব তাকে আনতে গিয়েচেন সোনাদা স্টেশনে—আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েছে। তখন মেমেরা পড়াতে আসত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলোর উঠোনে লাটু খেলছিলাম। সূর্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই—মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোড়া সাবান জলফোটাচ্ছিলেন, থাপা লর্ঠন পরিষ্কারের কাজে খুব ব্যস্ত—এমন সময় আমার হঠাৎ চোখ পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট-বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন—অস্তসূর্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েছে তা নয়—তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব ধরনের। সে-দেশও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ মহাসাগরের তীরে—কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলিগিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেছে, ভুটানের দিকে গিয়েছে। তার কুলকিনারা নেই; যদি কাউকে দেখাতাম সেহয়তো বলত আকাশ ওইরকম দেখায়, আমায় বোকা বলত কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখছি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়—সে সত্যিই সমুদ্র। আমি সমুদ্র কখনো দেখিনি, তাইকি, সমুদ্র কি রকম তা আমি জানি। বাবার মুখে গল্প শুনে আমি যে রকম ধারণা করেছিলাম সমুদ্রের, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরকার সমুদ্রটা ঠিক সেই ধরনের। এর বছর দুই পরে মেমেরা আমাদের বাড়ি পড়াতে আসে, তারা দাদাকে একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজী গল্পের বই দিয়েছিল, বইখানার নাম রবিন ক্রুশো—তাতে নীল সাগরের রঙীন ছবি দেখেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, এ আমি দেখেছি, জানি—আরও ছেলেবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর একসন্ধ্যায় এই ধরনের সমুদ্র আমি দেখেছিলাম—কুলকিনারানেই, অপার...ভুটানের দিকে চলে গিয়েছে...

মিস্ নটনকে এ-সব কথা বলবার আমার ইচ্ছে ছিল। অনেকদিন মিস্ নটন আমায় কাছে ডেকে আদর করেছে, আমার কানের পাশের চুল তুলে দিয়ে আমার মুখ দু-হাতের তেলের মধ্যে নিয়ে কত কি মিষ্টি কথা বলেছে, হয়তো অনেক সময়—তখন বুড়ী মেম ছাড়া ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না—অনেকবার ভেবেছি এইবার বলব—কিন্তু বলি-বলিকরেও আমার সে গোপন কথা মিস্ নটনকে বলা হয়নি। কথা বলা তো দূরের কথা, আমি সে-সময়ে মিস্ নটনের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারতাম না—আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, কপাল ঘেমে উঠত...সারা শরীরের সঙ্গে জিবও যেন অবশ হয়ে থাকত...চেষ্টা করেও আমি মুখ দিয়ে কথাবার করতে পারতাম না। অথচ আমার মনে হত এবং এখনো মনে হয় যদি কেউ আমার কথা বোঝে, তবে মিস্ নটনই বুঝবে।

মাস দুই আগে আমাদের বাড়িতে এক নেপালী সন্ন্যাসী এসেছিলেন। পচাং বাগানের বড়বাবু বাবার বন্ধু, তিনি বাবার ঠিকানা দেওয়াতে সন্ন্যাসীটি সোনাদা স্টেশনে যাবার পথে আমাদের বাসায় আসেন। তিনি একবেলা আমাদের এখানে ছিলেন, যাবার সময় বাবা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, তিনি নেননি। সন্ন্যাসী আমায় দেখেই কেমন একটু বিস্মিত হলেন, কাছে ডেকে তাঁর পাশে বসালেন, আমার মুখের পানে বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন—আমি কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর তিনি আমার হাত দেখলেন, কপাল দেখলেন, ঘাড়ের দাগ দেখলেন। দেখা শেষ করে তিনি চুপ করে রইলেন, কিন্তু চলে যাবার সময় বাবাকে নেপালী ভাষায় বললে—তোমার এই ছেলে সুলক্ষণযুক্ত, এ জন্মেছে কোথায় ?

বাবা বললেন—এই চা-বাগানেই।

সন্ন্যাসী আর কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিলেন, বাবাএগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ওর হাত কেমন দেখলেন?

সন্ন্যাসী কিছু জবাব দিলেন না, ফিরলেনও না, চলেগেলেন।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মাঝে মাঝেই জানি যে অন্যান্য অদ্ভুত জিনিস দেখি সন্ন্যাসী সে সম্বন্ধেই বলেছিলেন। সে যে আর কেউই বুঝবে না, আমি তাজানতাম। সেই জন্যেই তো আজকাল কাউকে ও-সব কথাবলিওনে।

পচাং চা-বাগানের কেরানীবাবু ছিলেন বাঙালী। তাঁর স্ত্রীকে আমরা মাসীমা ব'লে ডাকতাম। তিনি তাঁর বাপেরবাড়ি গিয়েছিলেন রংপুরে, সোনাদা স্টেশন থেকে ফিরবার পথে মাসীমা আমাদের বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতেএলেন। মা না খাইয়ে তাঁদের ছাড়লেন না, খেতে দেতেবেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের বাসা থেকে পচাংবাগান তিন মাইল দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্তী সরু পথ বেয়ে যেতে হয়, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। আমি সীতা ও দাদা তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলাম—পচাং পৌঁছতে বেলা তিনটে বাজল। আমরা তখনই চলে আসছিলাম, কিন্তুমাসীমা ছাড়লেন না, তিনি ময়দা মেখে পরোটা ভেজে, চাতৈরি করে আমাদের খাওয়ালেন; রাত্রে থাকবার জন্যওঅনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাদের ভয় হ'ল বাবাকে বলে আসা হয়েছে—বাড়ি না ফিরলে বাবা আমাদেরওবকবেন, মাও বকুনি খাবেন। বনজঙ্গলের পথ হলেওআরো অনেকবার আমরা মাসীমার এখানে এসেছি। আমিএকই কতবার এসেছি গিয়েছি। আমরা যখন রওনা হইতখন বেলা খুব কম আছে। অন্ধকার এরই মধ্যে নেমেআসছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। পচাংবাগান থেকে আধ মাইল যেতেই ঘন জঙ্গল—বড় বড় ওকআর পাইন—আবার উৎরাইয়ের পথে নামলেই জঙ্গল অন্যধরনের, আরো নিবিড় গাছের ডালে পুরু কষলের মতশেওলা ঝুলছে, ঠিক যেন অন্ধকারে অসংখ্য ভূত-প্রেত ডালে নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। সীতা খুশির সুরে বললে—দাদা, যদি আমাদের সামনে ভালুক পড়ে ?...হি হি—

সীতার ওপর আমাদের ভারি রাগ হ'ল,সবাই জানেএ পথে ভালুকের ভয় কিন্তু সে কথা ওর মনে করিয়েদেওয়ার দরকার কি ছিল ?বাহাদুরি দেখাবার বুঝি সময়অসময় নেই ?

অন্ধকার ক্রমেই খুব ঘন হয়ে এল, আর খানিকটা গিয়েসরু পায়ে-চলার পথটা বনের মধ্যে কোথাও হারিয়েগেল—সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল—তেমনিকনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীতে হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। গাছের ডালে শেওলা বৃষ্টিতে ভিজে এত ধরনের গন্ধবার হয় এ আমরা সকলেই জানতাম, কিন্তু সীতা বার বারজোর ক'রে বলতে লাগল ও ভালুকের গায়ের গন্ধ।—দাদাআমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, মাঝখানে সীতা, পেছনেআমি—হঠাৎ দাদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে একটাঝর্ণা—তার ওপরটায় কাঠের গুঁড়ির পুল ছিল—পুলটা ভেঙে গিয়েছে। সেটার তোড় যেমন বেশী, চওড়াও তেমনি। পারহ'তে সাহস করা যায় না। দাদা বললে—কি হবে জিতু !...চল পচাঙে মাসিমার কাছে ফিরে যাই। সীতা বললে বাবাপিঠের ছাল তুলবে আজ না ফিরে গেলে বাসায়। না দাদা, বাড়িই চলে।

দাদা ভেবে বললে—এক কাজ করতে পারবি ?পাকদণ্ডীর পথে ওপরে উঠতে যদি পারিস—ওখান দিয়েলিন্টন বাগানের রাস্তা। আমি চিনি, ওপরে জঙ্গলও কম। যাবি ?

দাদা তা হ'লে খুব ভীতু তো নয় !

পাকদণ্ডীর সে পথটা তেমনি দুর্গম, সারা পথ শুধু বনজঙ্গল ঠেলে ঠেলে উঠতে হবে, পা একটু পিছলে গেলেই, কি বড় পাথরের চাঁই আলগা হয়ে খসে পড়লে আটশ' কিহাজার ফুট নীচে প'ড়ে চুরমার হ'তে হবে। অবশেষে ঘন বনের বৃষ্টিভেজা পাতা-লতা, পাথরের পাশের ছোট ফার্নেরঝোপ ঠেলে আমরা ওপরে ওঠাই শুরু করলাম—অন্যকোনো উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড় মাথার চুল বৃষ্টিতেভিজে একাকার হয়ে গেল—রক্ত জমে হাত-পা নীল হয়েউঠল। পাকদণ্ডীর পথ খুব সরু, দুজন মানুষে কোনোগতিকেপাশাপাশি যেতে পারে, বাঁয়ে

হাজার ফুট খাদ, ডাইনে ঈষৎঢালু পাহাড়ের দেওয়াল খাড়া উঠেছে তাও হাজার-বারোশফুটের কম নয়। বৃষ্টিতে পথ পিছল, কাজেই আমরা ডাইনের দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষেই উঠছি। পথ মানুষের কেটে তৈরি করা নয় ব'লেই হোক, কিংবা এ পথে যাতায়াত নেই বলেই হোক—ছোটখাটো গাছপালার জঙ্গল খুব বেশী। ডাইনেরপাহাড়ের গায়ে বড় গাছের ডালপালাতে সারা পথটা ঝুপসিক'রে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেগুলো এত নিবিড় যে সামনেকি আছে দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমরা ক'জনই থমকেদাঁড়ালুম। সবাই চুপ ক'রে গেলাম। আমরা বুঝতেপেরেছিলাম শব্দটা কিসের। ভয়ে আমাদের বুকের স্পন্দনবন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সীতাকে আমি জড়িয়ে ধ'রেকাছে নিয়ে এলুম। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম নাবটে, কিন্তু আমরা জানতাম ভালুক যে পথে আসে পথেরছোটখাটো গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে আসে। একটা কোনোভারী জানোয়ারের অস্পষ্ট পায়ের শব্দের সঙ্গে কাঠকুটোভাঙার শব্দে আমাদের সন্দেহ রইল না যে, আমরা যে-পথদিয়ে এইমাত্র উঠে এসেছি, সেই পথেই ভালুক উঠে আসছেআমাদের পেছন পেছন। আমরা প্রাণপণে পাহাড় ঘেঁষেদাঁড়ালাম, ভরসা যদি অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে সামনেরপথ দিয়ে চলে যায়...আমরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিঃশ্বাস পড়ে কি না-পড়ে—এমন সময়ে পাকদণ্ডীরমোড়ে একটা প্রকাণ্ড কালো জমাট অন্ধকারের স্তূপ দেখা গেল—স্তূপটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে বেঁকে বেঁকেআসছে—যতটা ডাইনে, ততটা বাঁয়ে নয়—আমরা যেখানেদাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দশ গজের মধ্যে এল—তারঘন ঘন হাঁপানোর ধরনের নিঃশ্বাসও শুনতে পাওয়াগেল—আমাদের নিজেদের নিঃশ্বাস তখন আর বইছেনা...কিন্তু মিনিটখানেকের জন্য—একটু পরেই আর স্তূপটাকেদেখতে পেলাম না—যদিও শব্দ শুনে বুঝলাম সেটাপাকদণ্ডীর ওপরকার পাহাড়ী ঢালুর পথে উঠে যাচ্ছে। আরোদশ মিনিট আমরা নড়লাম না, তারপর বাকী পথটা উঠে এসে লিন্টন বাগানের রাস্তা পাওয়া গেল। আধ মাইল চলে আসবার পরে উমপ্লাণ্ডের বাজার। এই বাজারের অমৃত সাউমিঠাই দেয় আমাদের বাসায় আমরা জানতাম—দাদা তারদোকানটাও চিনত। দোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সে বাইরেএসে আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদেরতাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আঙনের চারিধারেবসিয়ে দিলে—আঙনে বেশী কাঠ দিলে ও বড় একটা পেতলের লোটায় চায়ের জল চড়ালে। তার বৌ উঠেআমাদের শুকনো কাপড় দিলে পরবার ও ময়দা মাখতেবসল। রাত তখন দশটার কম নয়। আমরা বাসায় ফিরবারজন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি—বললাম—আমরা কিছু খাব না, আমরা এবার যাই। অমৃত সাউ একা আমাদের ছেড়ে দিলে না, তার ভাইকে সঙ্গে পাঠালে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। বাবা বাসায়নেই তিনি সেদিন খুব মদ খেয়েছিলেন, ফেরেননি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাঙে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেছে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যেরআগেই সেখান থেকে রওনা হয়েছে। এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েছে, আমরা আরও উঁচুতে থাকবার জন্যে ঝড়পাইনি—নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। এইসব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলোয় খবরপাঠান—ছোট সাহেব চারিধারে আমাদের খুঁজতে লোকপাঠিয়েছে। মা এতক্ষণ কাঁদেননি, আমাদের দেখেই জড়িয়েধরে কেঁদে উঠলেন—সে এক ব্যাপার আর কি !

কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানিনা। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার উপর সন্তুষ্টছিল না, সেল মাস্টার বাগান দেখতে এসে বাবার নামে কোম্পানির কাছে কয়েকবার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদখেয়ে ইদানীং কাজকর্ম নাকি ভাল ক'রে করতে পারতেন না, এই সব জন্যে। আমরা যে-রাতে পথ হারিয়ে যাই, সে-রাতে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়েছিলেন—বড় সাহেব সেজন্যে ভারি বিরক্ত হয়। আরোেকি ব্যাপার হয়েছিল না হয়েছিল আমরা সে-সব কিছুশুনিনি।

বাবা যখন সহজ অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনিদেবতুল্য মানুষ। তখন তিনি আমাদের ওপর অত্যন্তম্নেহশীল, অত ভালোবাসতে মাও বোধ হয় পারতেন না। আমরা যা চাইতাম বাবা দার্জিলিং কি শিলিগুড়ি থেকে আনিতে দিতেন। আমাদের চোখছাড়া করতে চাইতেন না। আমাদের নাওয়ানো-খাওয়ানোয় গোলমাল বা এতটুকুব্যতিক্রম হলে মাকে

বকুনি খেতে হ'ত। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে যেতেন, সামান্য ছল-ছুতোয় আমাদেরমারধর করতেন। হয়তো আমায় বললেন এক্সারসাইজকরিস্ নে কেন ?বলেই ঠাস্ ক'রে এক চড়। তারপর বললেন—উঠবস্ কর। আমি ভয়ে ভয়ে একবার উঠিআবার বসি—হয়তো ত্রিশ-চল্লিশবার ক'রে ক'রে পায়ে খিলধ'রে গেল—বাবার, সেদিকে খেয়াল নেই। মা থাকতে না পেরে এসে আমাদের সামলাতেন। সেইজন্যে ইদানীং বাবাসহজ অবস্থায় না থাকলেই আমরা বাসা থেকে পালিয়েযাই—কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে ?

এই সবের দরুন আমরাও বাবাকে ভয় যতটা করিততটা ভালোবাসিনে।

দু-চারদিন ধরে বাবা-মায়ে পরামর্শ চলল, কি করা যাবে এ অবস্থায়। আমরা বাইরে বাইরে বেড়াই কিন্তু সীতা সব খবর রাখে। একদিন সীতাই চুপিচুপি আমায়বললে—শোনো দাদা, আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাববাবা বলেছে। বাবার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই কিনা—তাইদেশে ফিরে দেশের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। শীগগির যাব আমরা—বেশ মজা হবে দাদা—না ? ...দেশেচিঠি লেখা হয়েছে—

আমরা কেউ বাংলা দেশ দেখিনি, আমাদের জন্মএখানেই। দাদা খুব ছেলেবেলায় একবার দেশে গিয়েছিলমা-বাবার সঙ্গে, তখন ওর বয়স বছর তিনেক—সে-কথাওর মনে নেই। আমরা তো আজন্ম এই পর্বত, বনজঙ্গল, শীত, কুয়াশা, বরফ-পড়া দেখে আসছি—কল্পনাই করতেপারিনে এ-সব ছাড়া আবার দেশ থাকা সম্ভব। তা ছাড়াসমাজের মধ্যে কোনো দিন মানুষ হইনি বলে আমরাকোনো বন্ধনে অভ্যস্ত ছিলাম না, সামাজিক নিয়ম-কানুনওছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মানুষ হয়েছি এরই মধ্যে, যেখানে খুশী গিয়েছি, যা খুশী করেছি। কাজেই বাংলা দেশেফিরে যাওয়ার কথা যখন উঠল, তখন একদিকে যেমন অজানা জায়গা দেখবার কৌতূহলে বুক টিপ টিপ করেউঠল, অন্যদিকে মনটা যেন একটু দমে গেল।

থাপাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সে আমাদের মানুষকরেছিল, বিশেষ করে সীতাকে। তাকে এক মাসের বেশীমাইনে, দুখানা কাপড় আর বাবার একটা পুরোনো কোটদেওয়া হ'ল। থাপা বেশ সহজ ভাবেই বিদায় নিলে, কিন্তু বিকালে আবার ফিরে এসে বললে সে আমাদের যাওয়ারদিন শিলিগুড়ি পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তবে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। শিলিগুড়ি স্টেশনে সে আমাদের সবাইকে সন্দেশ কিনে খাওয়ালে—ওর মাইনের টাকা থেকেই বোধ হয়। মা রাঁধলেন, সে সব যোগাড় করে দিলে। ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও থাপা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্বত-প্রাচীর, ওক্-পাইনের বন, অর্কিড, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী; মেঘ-রোদ-কুয়াশারখেলা—এরই মধ্যে আমরা জন্মেছি—এদের সঙ্গে আমাদেরবত্রিশ নাড়ীর যোগ।...তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়েরচালুতে রাঙা রডোডেনড্রন ফুলের বন্যা এসেছে—সারা পথদাদা বলতে বলতে এল চুপিচুপি—কেন বাবা অত মদ খেতেন, তা না হ'লে তো আর চাকরি যেত না—বাবারইতো দোষ !

আমাদের দেশের গ্রামে পৌঁছলাম পরদিন বেলা নটারসময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, স্টেশন থেকে মাইল দুই আড়াই দূরে, জেলাচব্বিশ-পরগণা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে মনে বড় আনন্দ হ'ল। আমরা কখনো ফসলের ক্ষেতদেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত কোন্টা, ধানেরক্ষেত কোন্টা। এ ধরনের সমতলভূমি আমরা দেখিনিকখনো—রেলের আসবার সময় মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়াই বুঝি পাহাড় আরস্ত হবে। সেটা পার হয়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় তো কোথাও নেই, জমি উঁচু-নীচুওনয়, কি অদ্ভুত সমতল ! যতদূর এলাম শিলিগুড়ি থেকেসবটা সমতল—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, সবদিকে সমতল, এক আশ্চর্য ব্যাপার। দাদা এর আগে সমতলভূমি দেখেছে, কারণ সে জন্মেছিল হনুমান নগরে, নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আমার ও সীতার।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়, দোতলা, কিছু পুরনোধরনের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোট একটা পুকুর। আমরাযখন গাড়ি থেকে নামলাম—বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউদোরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মধ্যে জ্যাঠাইমা, কাকীমারাও ছিলেন। মা বললেন, প্রণাম করো। পাড়ার অনেক মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তারা সীতাকে দেখেবলাবলি করতে লাগলেন, কি চমৎকার মেয়ে দেখেছ ?এমনরঙ আমাদের দেশে হয় না, পাহাড়ের দেশে ব'লে হয়েছে।দাদাকে নিয়েও তারা খুব বলাবলি করলে, দাদার ও সীতাররঙ নাকি 'দুধে-আলতা'—আমার মুখের চেয়ে দাদার মুখসন্দর, এ-সব কথা আমরা শুনলাম। চা-বাগানেএসব কথাকেউ বলেনি। আর একটা লক্ষ্য করলাম আমাদের গাঁয়েরমেয়েরা প্রায়ই কালো, চা-বাগানের অনেক কুলীমেয়ে এরচেয়ে ফর্সা।

আমাদের থাকবার ঘর দেখে তো আমরা অবাক। এতবড় বাড়িতে এ-ঘরটা ছাড়া তো আরো কত ঘর রয়েছে !নীচের একটা ঘর, ঘরের ছাদে মাটির নীচের কড়িকাঠ ঝুলেপড়েছে ব'লে খুঁটির ঠেকনো। কেন ওপরে দোতলায় তো কত ঘর, এত বড় বাড়ি তো ! অন্য ঘরে জায়গা হবে নাকেন ?এই খারাপ ঘরটাতে আমরা থাকবো কেন ?

দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেইআমাদের জিনিসপত্র তুললেন।

দিন-চারেক পরে জ্যাঠাইমা একদিন আমায় জিজ্ঞেসকরলেন—হ্যাঁ রে, তোর মাকে নাকি সেখানে মেমেপড়াতো ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা।

গর্বের সুরে বললাম—আমাকে, দাদাকে, সীতাকেওপড়াতো।

জ্যাঠাইমা বললেন—তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছিলনাকি তোদের ?

আমি বাহাদুরি ক'রে বললাম—তারা এসে চা খেতআমাদের বাড়ি। আমাদের বিস্কুট দিত, কেক দিত খেতেতাদের ওখানে গেলে—চা খাওয়াতো—

জ্যাঠাইমা টানা-টানা সুরে বললেন—মাগো মা ! কি হবে, আমাদের ঘরে-দোরে তো যখন-তখন উঠছে, হিঁদুরঘরে জাতজন্ম আর রইল না।

আমি তখন বুঝতে পারিনি কেন জ্যাঠাইমা এ রকমবলছেন। কিন্তু শুধু এ কথা নয়—আমি ছেলেমানুষ, অনেক কথাই তখন জানতাম না। জানতাম না যে এই বাড়িতেআমার বাবার অংশটুকুঅনেক দিন বিক্রী হয়ে গিয়েছে, এখন যে এঁদো ঘরে আমরা আছি, সে ঘরে কোনো ন্যায্যঅধিকার আমাদের নেই—জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা অশ্রদ্ধা ওঅবজ্ঞার সঙ্গে থাকতে দিয়েছেন মাত্র। জানতাম না যে, আমার বাবা বর্তমানে অর্থহীন, অসুস্থ ও চাকুরিহীন, সরিকের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। আরোজানতাম না যে, বাবা বিদেশে থাকেন, ইংরেজী জানেন ও ভাল চাকুরি করেনব'লে এঁদের চিরদিন ছিল হিংসে—আজ এ অবস্থায় হাতেরমুঠোর মধ্যে পেয়ে তাঁরা যে

এতদিনের সঞ্চিত গায়ের ঝাল মেটাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায্যসঙ্গত। চাকুরির অবস্থায় মাকে নিয়ে বাবা কয়েকবার এখানে এসে চাল দেখিয়েছিলেন, এঁরা সে-কথা ভোলেননি। ছেলেমানুষ বলেই এত কথা তখন বুঝতাম না।

আমরা কখনো দোতলা বাড়ি দেখিনি—গাঁয়ে ঘুরেঘুরে দোতলা কোঠা বাড়ি দেখতে আমাদের ভারি ভালো লাগতো, বিশেষ করে সীতার। সীতা আজ এসে হয়তো বললে—কাল যেও আমার সঙ্গে দাদা, ও-পাড়ায় বাঁড়ুয়ে-বাড়ি কত বড় দেখে এসো—দোতলার ওপরে আবার একটা ছোট ঘর, সত্যি দাদা !

আমাদের গ্রামে খুব লোকের বাস—এক একপাড়াতেই ষাট-সত্তর ঘর ব্রাহ্মণ। এত ঘন বসতি কখনো দেখিনি—কেমন নতুনতর মনে হয়, কিন্তু ভাল লাগে না। এতে যেন মন হাত পা ছড়াবার জায়গা পায় না। সদাই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়—রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরনো নোনাধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রীছাঁদনেই—পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে-সব গাছপালা আমি চিনি নে, নামও জানি নে, কেবল চিনি কচুগাছ ওলালবিছুটি। এদের হিমালয়ে দেখেছি বলে নয়, কচুর ডাঁটার তরকারি এখানে এসে খেয়েছি বলে। আর আমার খুড়তুতো ভাই বিশু একদিন সীতাকে বিছুটির পাতা দেখিয়ে বলেছিল—এর পাতা তুলে গায়ে ঘষতে পারিস ? ...বেচারী সীতা জানত না কিছু, সে বাহাদুরি দেখিয়ে একমুঠো পাতা তুলে বাঁ-হাতে আবছা করে ঘষেছিল—তারপর আর যায়কোথা !

এ-সব জায়গা আমার চোখে অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয়, মন ভরে ওঠে এমন একটা দৃশ্য এর কোনো দিকেই নেই—ঝর্ণা নেই, বরফ-মোড়া পর্বত-পাহাড় নেই—আরোকত কি নেই। সীতারও তাই, একদিন সে চুপিচুপি বললে—এখান থাকতে তোমার ইচ্ছে হয় দাদা ? আমায় যদি এখুনি কেউ বলে চা-বাগানে চল, আমি বেঁচে যাই। আর একটা কথা শোনো দাদা-জ্যাঠাইমা কি খুড়ীমার ঘরে অত যেও না যেন। ওরা আমাদের দেখতে পারে না। ওদের বিছানায় গিয়ে বসেছিলে কেন দুপুরবেলা ? তুমি উঠে গেলে কাকীমা তোমায় বললে, অসভ্য পাহাড়ী ভূত, আচার নেই বিচার নেই, যখন-তখন বিছানা ছোঁয় ! যেও না ওদের ঘরে যখন-তখন, বুঝলে ?

ছোট বোনের পরামর্শ বা উপদেশ নিতে আমার অগ্রজগর্ভ সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললাম—যা যা, তোকেশে খাতে হবে না। কাকীমা মন্দ ভেবে কিছুই বলেননি, আমায় ডেকে তার পরে কত বুঝিয়ে দিলেন পাছে আমি রাগ করি। জানিস তা ?

বলা বাহুল্য আমায় ডেকে কাকীমার কৈফিয়ত দেওয়ার কথাটা আমার কল্পনাগ্রসূত। আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এই চার মাসের মধ্যেই সঞ্চয় করেছি, তা বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলবো না। আমরা সত্যি জানতাম না যে, সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিস আছে, মানুষমানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হতে পারে, যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে গিয়েছি, তারা এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার সত্যিই করতে পারে ! কি করে জানবই বা এ সব ?

মুশকিল এই যে এত সাবধানে চললেও পদে পদে আমরা জ্যাঠাইমাদের কাকীমাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ি। আমরা লোকালয়ে কখনো বসবাস করিনি বলেই হোক বা এদের এখানকার নিয়ম-কানুন জানিনে বলেই হোক, বুঝতে পারিনে যে কোথায় আমাদের অপরাধ ঘটছে বা ঘটতে পারে। রাত্রে যে কাপড়খানা প'রে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরনে থাকলে সকালে যে আলনা ছুঁতে নেই, তার দরুন আলনসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায়, বা বাড়ির আশপাশের খানিকটা সুনির্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরদোরে ঢুকতে নেই—এ-সব কথা আমরা জানিনে, শনিওনি—নিযুক্তির দিক দিয়েও বুঝতে পারিনে। আমাদের বাড়ির খিড়কিতে খানিকটা বন, একদিন বিকেলে আমি, সীতা ও দাদা সেখানে কুঁড়েঘর বাঁধবার জন্যে নোনাগাছের ডাল কাটছি—কাকীমা দেখতে পেয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে জুটেছ সব ? ভাগ্যিস চোখে পড়ল ! এক্ষুনি তো ওই সব নিয়ে উঠতে এসে দোতলার দালানে ! ...মা গো মা, মেলেছ খিরিস্টানের মত ব্যাভার, আঁস্কা কুড়ে ঘেঁটে খেলা হচ্ছে দ্যাখো !

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আঁস্তাকুড়ের অন্য কোনো লক্ষণ তো নেই ! দিব্যি পরিষ্কারজায়গা, ঘাসের জমি আর বনের গাছপালা। আমি অবাকহয়ে বললাম—কাকীমা, এখানে তো কিছুর নোংরা নেই ? ...এসে দেখুন বরং কেমন পরিষ্কার—

কাকীমার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথা বার হ'ল না—তিনি এমন কথা জীবনে কখনো শোনেননি। তারপর বললেন—চোখে কি ঢালা বেরিয়েছে নাকি ? এঁটোহাঁড়িকলসী ফেলা রয়েছে দেখছ না সামনে ? ...কাচা কাপড়প'রে কোন ছেলেমেয়েটা এই বিকেলে পথ থেকে অত দূরেবনজঙ্গলের মধ্যে যায় ? ওটা আঁস্তাকুড় হ'ল না ? আবারসমানে তক্কো !

তারপর খুড়ীমা হুকুম দিলেন আমাদের সবাইকেএক্ষুনি নাইতে হবে। আমরা অবাক হয়ে গেলাম—নাইতেহবে কেন ?

সামনে হাত তিন-চারেক দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়িকুড়ি পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার দরুন গোটা বনটাঅপরিষ্কার কেন হবে তা বুঝতে পারলাম না আমরাতিনজনে কেউ। বিশেষ ক'রে এটা আরো বুঝতে পারলাম না যে, পথ থেকে দূরে বনের মধ্যে বিকেলে কাপড় প'রেযেতে দোষটা কিসের ! চা-বাগানে থাকতে তো কত দূর দূরআমরা চলে যেতাম, কার্ট রোড, পচাঙের বাজার; এখানেইবা কি বন, সেখানকার সেই সুনিবিড় বনানী পদচিহ্নহীন, নির্জন, আধ-অন্ধকার—কতদূরে, যেখানে যেখানে গিয়েছি কাপড় প'রেই তো গিয়েছি—

দাদা একটু ভীতু, সে ভয়ে নাইতে রাজী হ'ল। আমি বললাম—সীতা, তুই আর আমি নাইবো না, কখখনো না।

আমি যা বলি তাই শোনা সীতার স্বভাব—সে বললে, খুড়ীমা খুন ক'রে ফেললেও আমি নাইবো না দাদা।

খুড়ীমা আমাদের সাধ্যমত নির্যাতনের কোনো ক্রটি করলেন না। বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, তাঁর বড় ছেলেহরুদাকে বলে দিলেন আমাদের শাসন করতে, মাকে বললেন—তোমার ওই ডাকাত মেয়ে আর ডাকাত ছেলেকেআজ কি দশা করি তা টেরই পাবে—আমার সঙ্গে সমানেতক্কো তো করলেই আবার আমার কথার ওপরএকগুঁয়েমি !

মা ওঁদের বাড়িতে এখন এসে রয়েছে, ভয়ে কিছুবলতে পারলেন না। আমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকেচলে গেলাম। ও-পাড়ায় পথের ধারে শ্যাম বাগচীদের পোড়ো বাড়ি, পেছনে তাদের বাগান, সেও পোড়ো। সারাক্ষণ আমরা সেখানে কাটালাম, সন্ধ্যার সময় দাদা গিয়েডেকে আনলে। বাড়িতে ঢুকতে যাব কাকা দোতলা থেকেহেঁকে বললেন—ওদের বাড়ি ঢুকতে দিও না বলছি—ওরাযেন খবরদার আমার বাড়ি না মাড়ায়, সাবধান !—যেখানে হয় যাক, এত বড় আস্পদা সব—

মা কিছু বলতে সাহস করলেন না, বৌমানুষ ! বাবাবাড়ি ছিলেন না, চাকরির চেষ্টায় আজকাল তিনি বড় এখানেওখানে ঘোরেন, কিছু পান না বোধ হয়—দু-একদিন পরেশুকনো মুখে ফিরে আসেন—সংসার একেবারে অচল। আমরা এক প্রহর রাত পর্যন্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়েইলাম। জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, জ্যাঠামশাই, দিদিরা কেউএকটা কথাও বললেন না। তারপর যখন ওদের দোতলায়খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল,আলো নিবল, মা চুপিচুপিআমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে নিলেন, বললেন—জিতু, খুড়ীমারকথা শুনলি নে কেন ? ছি—

আমি বললাম—উনি যে কথা বলেন মা, তার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমরা সেখানে বনে বনে বেড়াতাম না ? আমরা কি নাইতুম ? আর বন কি আঁস্তাকুড় ? অন্যায় কথা ওঁর কখখনো শুনব না মা। এতেউনি মারুন আর খুনই করুন—

মা অতি কষ্টে কান্না সামলাচ্ছেন মনে হ'ল। বললেন—তুই যদি এরকম করিস তা হলে এ বাড়িতে ওরা আমাদের থাকতে দেবে না। আমাদের কি চেষ্টিয়ে কথা বলবার জোআছে এখানে ? ছি বাবা জিতু, ওরা যা বলে

শুনবি। ওরা লোক ভাল না—আগে জানলে ভিক্ষে করে খেতাম, তবুও এখানে আসতাম না। তোর বাবার যে একটা কিছু হ'লেহয়।

বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড়-জামা এত ময়লা কখনো বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন—শোন্ জিতু, এই পুঁটলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভটচাষীদের নস্যির কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েছে—ওদের দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসব'খন, তুমি বসে চা-টা খাও। বাবা শুনলেন না, চলে গেলেন। বাবার মুখ শুকনো, দেখে বুঝলাম যেজন্যে গিয়েছিলেন তার কোনো যোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হ'লেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে এসেছে। আমরা নীচেরঘে ঘরে থাকি, গোরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল, এই চার মাসেই যাদেখেছি শুনেছি, তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলব না। যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটেযাই, তারা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাইনে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনোই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িসুদ্ধ লোকের আমাদের ওপর এত রাগ ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ওঁরা হলেন খুড়তুত-জাঠতুত ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভালো—পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজদেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল, সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে। মেজকাকার তিন মেয়ে—ছেলে হয়নি, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে—আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়—বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যা নেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ সুন্দরী—একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এঁর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ—তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোশামোদ ক'রে বলে—আমার সামনেই আমি কতবার শুনেছি—তোমার মত ভাগ্যমালিনী ক'জন আছে বড়-বৌ ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উথলে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে ! সামনে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে? দেওয়ায়-থোওয়ায়, খাওয়ানোয়-মাখানোয়—আমার কাছে বাপু হ'ক কথা।

মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভালো লোক। কিন্তু তিনি কারুর স্বপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভালকরবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলেন, শুকনো মুখে কতবার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললুম—চাহিয়েছে সীতা ?

সীতা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে—চা আর হবে না। মা বলেছে চা-চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে ?

কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না, সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেছি, এই রকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম,—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি !

চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ারঅভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থাআমরা কল্পনাই করতে পারিনে।

সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো—চাহছে না। তারপর বিজ্ঞের সুরে বললে—বাবার যে চাকরিহছে না, মা বলছিল দু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা ! ...আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতরমূর্তিতে আমার চোখের সামনে ফুটল। জানতুম যে আমরাগরিব হয়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদেরকারুর কাছে মান নেই সবই জানি। কিন্তু এ সবোও নিজেদের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন ক'রে বুঝিনি, আজ সকালে চা নাখেতে পেয়ে সেটা যেমন ক'রে বুঝলুম।

বিকেলের দিকে বাবা দেখি পথ বেয়ে কোথা থেকেবাড়িতে আসছেন। আমায় দেখে বললেন—শোন্ জিতু, চলিশমুলের তুলো কুড়িয়ে আনিগে—

আমি শিমুল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছিএখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজালাগল—উৎসাহ ও খুশির সুরে বললুম—শিমুল তুলো ?কোথায় বাবা ?..চলো যাই—সীতাকে ডাকবো ?

বাবা বললেন—ডাক ডাক, সবাইকে ডাক—চল্ আমরাযাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্মবার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধযোগাড় ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ায় উনুনে বসে বসে ক্ষীরেরপুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরেজ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে কি জন্যে চাইলেন—তারপরপুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরেঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে খেলা করগে যা—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বলতে যাচ্ছিলাম, মা, বাবাযে শিমুল তুলো কুড়োবার—কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়েআমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েছেযেন—কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়েআসেননি নিশ্চয়—মদ খেলে আমরা বুঝতে পারি—খুবছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, দেখলেই বুঝি। তবেবাবার কি হ'ল ?

অবাক হয়ে বাইরে চলে এলুম।

এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আরপড়তে চাইলে না ব'লে তাকে ভর্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্যে মাস্টার মশায়ের তাগাদার চোটে আমারচোখে জল আসত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকেচেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।

শনিবার, সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরানীরামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনেরতাগাদা শুরু করলেন। আমার মাইনে বাকিদু-মাসের—আমায় ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়িগিয়ে মাইনে নিয়ে এসো খোকা, নইলে আর ক্লাসে বসতেদেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—দুঃখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সামনে—ভারি—

দুপুরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। স্কুলের বাইরে একটানিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানেদাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বলব বাড়িগিয়ে ?কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবো, পাবে কি না পাবে, ছোট মুখ ক'রে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক হয়ে পথের ওপারে চেয়েরইলুম—ওপারে সামু নাপিতের মুদিখানার দোকানটা আরনেই, পাশেই সে ফিতে-ঘুঙ্গির দোকানটাও নেই, তারপাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি, কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হ’তে পারে।

নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনোতাই আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছেরসারি—দূরের সাদা বাড়িটা। দু মিনিট...পাঁচ মিনিট।তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম, আবার চাইলুম—এখনও অবিকলতাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুনতেপারি, পাখিদের ডানার সব রঙ বেশ ধরতে পারি।

তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সবশূন্য—তার পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেইফিতে-ঘুঙ্গির দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এই রকম দেখি, তখনআমার গা কেমন করে—হাতে পায়ে যেন জোর নেই এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমনি হয় আমার ?কেন আমি এ-সব দেখি ?কাউকে এ কথা বলতে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমনি কোনোবন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস ক’রে সব কথা খুলে বলি। আমার মনে মনে যেন কে বলে—এরা এ-সববুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে, কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।

ওবেলা খেয়ে যাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়েদেখি শুধু সিমভাতে আর কুমড়োর ডাঁটা চচ্চড়ি। আমি ডাঁটাখাইনে—সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাললাগে না। মাকে রাগ ক’রে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি করে ?সিমভাতে দিলে কেন ?সিমভাতে আমি খাইকখনও ? কিন্তু মাকে যখন আমি বকছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভালখাওয়াতে মায়ের যত্নের ত্রুটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখনমা অক্ষম, অসহায়—হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাকলেওনিরুপায়। মায়ের এই বর্তমান অক্ষমতার দরুন মায়ের ওপরযে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্তিত হয়ে। চেয়েদেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ’ল এ সেই মা—চা-বাগানেথাকতে মিস্ নর্টনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্যেকেক্ তৈরি করবার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি ময়দাকিশমিশ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রমক’রে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরেট ময়দার টিপি বানিয়েবাবার কাছে ও পরদিন মিস্ নর্টনের কাছে হাস্যাস্পদহয়েছিলেন ! তার পর অবিশ্যি মিস্ নর্টন ভাল ক’রে হাতেধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেকই গড়তেপারতেন।

মা বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের ধরন-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জানতেন না—অল্প বয়সে বিয়ে হয়েচা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একাকাটিয়েছেন চিরকাল সমাজের বাইরে—পাড়াগাঁয়েরব্রত-নেম্ পূজোআচ্চা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না।ওদের এই ঘোর আচারী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাকলেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েছে কম নয়। পয়সাথাকলে যেটা হয়ে দাঁড়াত গুণ—হাত খালি থাকতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষের ব্যাপার—জংলীপনাথিরিস্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহ্যগুণ ছিল অসাধারণ, মুখবুজে সব সহ্য করতেন, কোনোদিন কথাটিও বলেননি। ভয়েভয়ে ওদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টাকরতেন—নকল করতে যেতেন—তাতে ফল অনেক সময়েহ’ত উল্টো।

আরও মাসকতক কেটে গেল। সেই ক-মাসে আমাদেরযা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিওনি কোনো দিন যেঅত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরাভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাত্রে কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হত না। ভাত খেয়ে স্কুলেযাওয়াটা ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের যোগাড়করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার ক’রে নিয়ে আসতেহ’ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকত না—এর মানে আমাদেরচা-বাগানের শৌখিন জিনিসপত্র, দেরাজ, বাক্স—এইসববেচে চলছিল—সব সময়ে তার খন্দের জুটতো না। মাবৌমানুষ, বিশেষত এটা অপরিচিত স্থান, নিজের শ্বশুরবাড়িহলেও এর সঙ্গে

এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তুমা ও সব মানতেন না, লজ্জা ক’রে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যেদিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিস বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ার মেয়েদের কাছে। প্রায়ই শৌখীন জিনিস, হয়ত একটাভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেলনা, চন্দনকাঠেরহাতপাখা এইসব—সেলাইয়ের কলটা ছোট কাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারী পুরু পশমী ওভারকোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায়। মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা সেটা তৈরিকরিয়েছিলেন।

চাল না হয় একরকম ক’রে জুটলো, কিন্তু আমাদেরপরনের কাপড়ের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদেরসবারই একখানা ক’রে কাপড়ে এসে ঠেকেছে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বলত, তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস দাদা ! কিন্তু আমার দোষ কি ? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করলেই ছিঁড়েযেত, মা অমনি সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমনি কথাবার্তা বলেন না—বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াইযায় না যে কাপড়ের কথা বলি। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকেচেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাওএ পর্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস-দুই একটা গোলদারি দোকানেখাতাপত্র লেখবার চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকরি নেই—সেজ জ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বলছিল, নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা একদিনও মদ খেয়েছেন ব’লে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেইউৎপাত করেন আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসেপর্যন্ত দেখিচি বাবার মত শান্ত মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই। এত শান্ত, এত ভাল মানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কিহয়েই যেতেন ! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্তি মনেহলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার স্কুল নেই, আমি সারাদিন বসে বসেম্যাজেন্টা গুলে রঙ তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙেছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকেঅনেকখানি ম্যাজেন্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েচি, কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল—একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরেরদোর জ্যাঠাইমা, আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনের দল, ছোট কাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদছেন—সীতাবিছানায় সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ মুছছে। আমারজ্যাঠতুতো ভাই হেসে বললেন—ঐ দ্যাখ্ তোর বাবা কি করচে ! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটেবালিশের তুলো ছিঁড়ে পুঁটুলি বাঁধছেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছেদেখতে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েছেবাবা ?

বাবা বললেন—চা বাগানে আবার চাকরি পেয়েছি—ছোট সাহেব তার করেচে; সকালের গাড়িতে যাব কিনাতাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছেঁদে এখন না রাখলে—কটা বাজলরে থোকা ?

আমার বয়স কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ’ল না যে এবার বাবা মাতাল হননি। এ অন্য জিনিস। তার চেয়েওগুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের মতোএকটা ছাপ দিয়ে দিয়েছিল—জীবনে কখনও ভুলিনি—চোখবুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে-রাত্রির দৃশ্যটা মনেএসেছে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জ্বলচে ঘরে—তারই রাঙা ক্ষীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবারতুলো-মাখা চেহারা—মাথায় মুখে কানে পিঠে সর্বাপে ছেঁড়াবালিশের লালচে পুরানো বিচিওয়াল তুলো, মেঝেতে বসেমা কাঁদছেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যাঠাইমা জড়ো হয়েছেন—খুড়তুতো ভাই-বোনেরা হাসচে।...দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।

পরদিন সকালে আমাদের ঘরের সামনে উঠানে দলে দলে লোক জড়ো হ’তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথমবুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। সংসারের কষ্ট, মেয়েরবিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই

সব দিনরাত ভেবে ভেবে বাবার মাথা গিয়েছে বিগড়ে। অবিশ্যি এ-সবকারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে, অনেক পরে।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তেলাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিকভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতেলাগল দলে দলে।

বাবার মূর্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়েচোখ বসে গিয়েছে—চোখের কোলে কালি মেড়ে দিয়েছে। যেন। সর্বাঙ্গে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানারওপরেই বসে আপনমনে কি বকছেন। ছেলেপিলের দলএপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরে ভিড়ক'রে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখচে—হাসাহাসিকরচে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁড়ুয়োরছেলে শাণ্টু—সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকেকি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন। সে ভান-করা ভয়ের সুরেব'লে উঠল—ও বাবা ! মারবে নাকি ?বলেই পিছিয়ে এল।ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

একজন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বলছেদ্যাখ—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি।আমরা কেউ কোন কথা বলচি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শকরলেন সব লোকজনের সঙ্গে—আমার মাকে উদ্দেশ্য ক'রেবললেন—বৌমা, সবই তো দেখতে পাচ্চ—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতেহবে—সেই মতই সবাই করেচেন। ছেলেপিলেরবাড়ি—পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি ক'রে বসে, তা বলা যায় না..তা তোমায় একবার বলাটা দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন ?বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতেযাচ্ছেন না—কেন তবে—

আমার মনের ভাষা বাক্য খুঁজে পেলো না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে ! আহা, কিকষে কষেই বাঁধলে। অন্য দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না—জ্যাঠামশায়দের খিড়কি-পুকুর ধারেরগোয়াল-বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে এল—তাইদিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা জোর করে বাবাকে বাঁধবারদরকার কি ! বাবার হাতের শির দড়ির মতো ফুলে উঠেছেযে। সেজ কাকাকে চুপিচুপি বললুম—কাকাবাবু, বাবার হাতেলাগছে, অত ক'রে বেঁধেচে কেন ?বলুন না ওদের ?

কাকা সে-কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বলতে তাঁরা বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ ?হাত আলগা থাকবে পাগলের ?...তা হলে পা খুলতে কতক্ষণ—তারপরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায়বললেন—যাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতরেযাও—নয়তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েছে বাবার হাতে। সেই রকমতুলোমাথা অদ্ভুত মূর্তি !...

বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেছনের মাঠের দিকে চলে গেলুম—একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় সারা দুপুরও বিকেল চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দিন কতক এই ভাবে কাটল। তারপর পাড়ারদু-পাঁচজন লোকে এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল, সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম, বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে।শীগিরিই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হলুম।

দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ওসীতা পথে খেলা করচি, এমন সময় সীতা বললে—ঐ যেবাবা !...দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটেআমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে

বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধুলো, রুম্ব চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কিদরকার ?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন, ভাত আছে ? কালওই দিকের একটা গাঁয়ে দুপুরে দুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাই নি সারাদিন, খিদে পেয়েছে। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে আসছি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাকতে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদের রাগ হ'ল—মায়ের কথা বলতে পারিনে কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখি নি—কিন্তু আমি সীতাদাদা তিন ভাইবোনে খুব চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। বাবাআবার পুরোমাত্রায় পাগল হয়ে উঠলেন—তিনি দিনরাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজিচাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানোকষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল যোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে—কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্ঠবার জো নেই। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের ওপর বিরূপ—দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখনাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোন কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল, ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়াচাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাদের। ছ-বছর বয়স পর্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থার জন্য বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না ? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা ওরকম পাগলামি করেন ? ওতে লজ্জায় যে ঘরেবাইরে আমাদের মুখ দেখাবার জো নেই।

সেদিন সকালে সেজ খুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুবঝগড়া বাধালেন। মেজ খুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবী নেবু গাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েছে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন—এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই নেবু চুরি ক'রে ঘরে রেখেছি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন। মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যে সেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেছে...এসে দেখুন—

শেষ পর্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরে নিলে যে নেবু আমাদের ঘরে আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেড়িয়ে পড়ত। খুব ঝগড়াবাটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল একতরফা, কারণ এ-পক্ষ থেকে তারজবাব কেউ দিল না।

জ্যাঠাইমা এ বাড়ির কত্রী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও, নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাকে বলল—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন-দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকরির যোগাড় করতে কলকাতা যাবে, ঘরে আমরা আপাতত কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ও পাড়ার সবাই বললে পাগলাটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলেজঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার উপর আমাদের কারুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জটা পাকিয়ে গিয়েছে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই

নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না... গায়ের গন্ধে ঘরেথাকা অসম্ভব ! মা একদিনও রাত্রে ঘুমুতে পারেন না—বাবাকেবলই ফাই-ফরমাশ করেন—জল দাও পান দাও আরকেবলই বলেন খিদে পেয়েছে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও না পেলেই তিনি আরও ক্ষেপে ওঠেন—এক মা ছাড়া তখনআর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘরছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত ক'রে চুপকরিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িকচুপ করে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্যন্ত বোধহয় একদিনও বাবার ঘুম হয় নি। নিজেও ঘুমবেন না; কাউকেঘুমুতেও দেবেন না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরেজি বক্তৃতা, গান—এই সব করবেন। সবাই বলে, ঘুমুলে নাকি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়তবলেছিলেন—তোমরা যা ভাল বোঝ করো বাপু। মোটেরওপর একদিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু—আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ে জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই, আমি, নিতাই, সিধু আরমেজকাকা যাব।

একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরলাম। গিয়ে দেখি মাদালানে বসে কাঁদছেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকছেন। নিতাই আমাকে বাবারসামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেইরইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'লবিকেলের পড়ন্ত রোদে যেমে আমরাসবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌঁছলাম। নিতাই বললে—এই তো আড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়েযাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রান্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেলশুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতেদিয়ে এসেছি—বসে বসে টানচে। চল ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটেতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলাআর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহররাত হয়ে গেল বাড়িতে পৌঁছুতে। কিন্তু তিন দিনের দিনবাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে আরতাকানো যায় না—কাদামাখা ধুলোমাখা অতি বিকটচেহারা। বেল না কি ভেঙে খেয়েছেন—সারা মুখে গালেবেলের আঠা ও শাঁস মাখানো। মা নাইয়ে ধুইয়ে ভাতখেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে বিছানানিলেন, দু'দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেনবিছানা ছেড়ে ওঠে না—তার কি হয়েছে—এ কথা কেউকোনোদিন জিজ্ঞেসও করলে না। মা যেদিন যা জোটেখেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোন লোকেউঁকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আরআমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরে ওঠাআমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পাটিপেটিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত—পাছেওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়েদিতে আসেন।

একদিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছি—অন্য দুদিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্যে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার যোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি যোগাড় করতেন, কি ক'রে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমিকখনও তা নিয়ে ভাবি নি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলাএকটা পর্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথেরদিকে চাইতাম এবং রোজই একটার টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা, ভাত হয়েছে খাবে এসো।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানলা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়েদেখছি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা

আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে আসতেদেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল নিজেরা সব খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আসছেন।

মাস্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখি—আমার বুঝি আর খিদে-তেষ্ঠা পায় না? কটা বেজেছে জানিস?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়া, তোমার বইপত্র নিয়ে ছুটি ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে—

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েছে। স্কুল থেকেবেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েছেছোড়া।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকেচেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলছে এমন মনে হল না। বললাম—কখন?

সীতা বললে—বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়োগিয়েচে তো?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয়। কিন্তু সীতাবললে—না, নিয়ে এখনও কেউ যায় নি। মা একা কি করবে?... জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই—ছোট কাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন—আর আসেন নি। মেজকাকা পাড়ায়লোক ডাকতে গেছেন।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস্ এখনে।

কেউই কাঁদছে না। আমারও কান্না পেল না—বরংএকটা ভয় এল—একা মড়ার কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণবসে থাকব না জানি!

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউমৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেছেনকেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয় নি মৃত্যুর পূর্বে—এ অবস্থায় কেউ সৎকার করতে রাজী নয়। প্রায়শ্চিত্তএখন না করালে কেউ ও মড়া ছোঁবে না।

প্রায়শ্চিত্ত করতে পাঁচ-ছ টাকা নাকি খরচ। আমাদেরহাতে অত তেনেই—মা বললেন। কে যেন বললে—তা এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিনতেআনতে হয়, কি আর করবে?

দাদাকে মা ও-পাড়ার কার কাছে পাঠালেন টাকারজন্যে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক ষণ্ডামতলোক এল—শুনলাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকছে—এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনো দেখি নি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিতির করাবে? প্রাচিতির নাহ'লে মড়া কি সারা দিনরাত ঘরেই পড়ে থাকবে? যতছোটলোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কিনা।

আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথাভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এদের মধ্যে আমি একজনকে কেবল চিনি। মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল—পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার করে নিয়ে গেল—দাদা গেল সঙ্গে শাশানে। একটু পরে সন্ধ্যাহ'ল। সেজ খুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু? আমিও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তিন বছর আগেকার কথা এসব। তার পর থেকে এবাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজী হন নি, দাদাষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদিখানার দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সেরআটা, পাঁচ পোয়া ঝাল-মশলা—এই নিয়ে দোকান কতদিনচলে? দাদা ছেলেমানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেঁচ

কিছু বোঝে না, একদিক থেকে সব ধারে বিক্রী করেছে, যে ধারে নিয়েচে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠেযাওয়ার পরে দাদা চাকরির চেষ্টায় বেরুলো, সে তার ছোটমাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়েবাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খাওয়া-পরানোর দৃষ্টিস্তায়রাতে ঘুমুতো না, সারাদিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নসিয়ারকারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাকরিও পেল—কিন্তুবেশী দিন রইল না, মাস-দুই পরে তারা বললে—ব্যবসারঅবস্থা খারাপ, এখন লোক দরকার নেই।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় বা কি ?নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না—এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলাদেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নিচু, আঁটসাঁট, ছোট ব'লে মনে হয়—যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে না-হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উঁচুনীচু নেই, একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়ের যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ একধরনের ছোট ছোট গাছ, এর নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রঙ দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদেরদিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চারবছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরাআমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিস্টান, আচার জানিনে, হিঁদুয়ানী জানিনে—জংলী জানোয়ারের সামিল, গারোপাহাড়ী অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধেওঁরা যে খুব বেশী জানেন তা নয়—এবং জানেন না বলেই তাদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগুবী ধরনের।

এদেশে শীতকাল নেই—মাস দুই-তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধ'রে গরম লেগেই আছে—আর কি সাংঘাতিক গরম ! সে গরমের ধারণা ছিল না কোনকালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেওঘামে বিছানা ভিজে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথারমধ্যে কেমন করে, রাতে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসেএক-একদিন। তার ওপরে মশা। কি সুখেই লোকে এসব দেশে বাস করে।

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তিছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরেরঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। আগেই বলেছিআমার মনে হ'ত, ওঁদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্য ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সেউদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানানো। তাঁকে প্রসন্নরাখলেই এঁদের আয় বাড়বে, দেশে খাতির বাড়বে—আমারজ্যাঠাইমাকে সবাই বলবে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী—তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন যুগিয়ে চলবে। পাশাপাশি অমনি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম?মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মূর্তিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলেমেয়েদের পুঁতির মালাকিনে দেওয়া, আদর-যত্ন করা, আমাদের একটু অসুখে রাত জেগে বিছানায় বসে থাকা। কাছাকাছি কোন চা-বাগানেরবাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত আমাদেরবাসায় না খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সে-ই মাএখানে এঁদের সংসারের দাসী, পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ করতে পারলে সুখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকুমান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকেঘুষ দিতে পারেন না ব'লে?আমার মনে হ'ত জ্যাঠাইমাদেরশালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনিষোড়শোপচারে পূজো পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রেদিয়েছেন, অন্য সকলের উপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে আরতি শুরু হয়েছে; নরু, সীতা, সেজ কাকার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি। পুরুতঠাকুর ওদের সবারই হাতে একটা ক'রে রূপোবাঁধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামরদুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতাচাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপধূনোর ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেনী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুতঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিট্চে, পুরুতঠাকুর তন্ময় হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলেআরতি করছে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়াঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমারমনে হ'ল এ দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আরকানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেনকতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়েগেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহুপরিচিতলক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানেএ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটাঅস্বস্তি হয়—সে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না, জ্বরআসবার আগে যেমন লোক বুঝতে পারে এইবার জ্বরআসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বলতে গেলাম, পিছু হটে গিয়ে দালানের থামে ঠেস দিয়েদাঁড়িলাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে যেমন ক'রে সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা ক'রে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিকঅবস্থায় থাকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানেরতিনধারের দেওয়াল আমার সামনে থেকে অনেক দূরে...অনেক দূরে সরে যেতে লাগল... কাঁসর ঘড়ির আওয়াজক্ষীণ হয়ে এল... কতকগুলো বেগুনি ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়াকরছে...সারি সারি বেগুনি ও রাঙা আলোর চাকার খুব লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে খেলে যাচ্ছে—তার পর আমার বাঁয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বড়নদী, ওপারেও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ—এপারেওঅনেক ঝোপ বন—কিন্তু যেন মনে হ'ল সব জিনিসটা আমিঝাড়লুঠনের তেকোণা কাচ দিয়ে দেখছি—নানা রঙের গাছপালা ও নদীর জলের চেউয়ের নানা রঙ ওপারটায় লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে—গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়া ঠেলেআকাশে উঠেছে...আর ফুল যে কত রঙের আর কতচমৎকার তা মুখে বলতে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ'রেযেন রঙিন ও উজ্জ্বল থোকা থোকা ফুল...হঠাৎ সেই নদীরএকপাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশায়েরঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল, তার চারিদিকে নদী, কড়িকাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকাথোকা ফুলসুন্দ হাওয়ায় দুলছে...ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের

ঠাকুরঘরের চারিপাশ ঘিরে... মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল.. কান্নাআসতে চাইল... কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে—আমার ঘোর কাটল একটা টেঁচামেচির শব্দে। আমায় সবাই মিলে ঠেলচে। সীতা আমার ডান হাত জোর করে ধরেদাঁড়িয়ে আছে—পুরুতঠাকুর ও পুলিন রেগে আমায় কিবলচে—চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির থালার অত্যন্তকাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—আমার কোঁচা লুটুচ্ছে উঁচুক'রে সাজানো ফুলকো লুচির ওপরে। তারপর যা ঘটল। পুরুত ঠাকুর গালে চার-পাঁচটা চড় কষিয়ে দিলেন—মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আশুন হয়ে বলতেলাগলেন, সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগআছে, আমায় তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়—

মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাতে জ্যাঠামশায়দের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়লাম। সীতা গোলমালে টের পায় নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার গা কাঁপছিল ভয়ে—এ আমার কি হ'ল ?আমার এমন হয় কেন ?এ কি শক্ত ব্যারাম ?ঠাকুরের ভোগআমি তো ইচ্ছে ক'রে ছুঁই নি ?তবে ওরা বুঝলে না কেন ?এখন আমি কি করি ?

আমি হিন্দু দেবদেবী জানতাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয় নি। কিন্তু মিশনারী মেমদের কাছে জ্ঞানহওয়া পর্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় ক'রে মনে মনে বললাম—হে প্রভু যীশু, হেসদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দোষ—আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমাররাজত্ব আসুক, আমেন্।

সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে কি পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিস সীতা ?সীতাএমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেইবললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে দ্যাখো কেমন চমৎকারবই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বই পড়তেপারিস !

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, প'ড়ে দেখোএখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টাচার্যি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয়বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণত ভাইয়েরা বোনদের চেয়ে দেখতে ভাল হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়েসুন্দর—যেমন রঙ, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথাশক্রতেও স্বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভালমুখ, ভাল রঙ দখল ক'রে বসেছে—আমার ও সীতারজন্যে বিশেষ কিছু রাখে নি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া আবার শৌখীন—সর্বদা ঘ'ষে মেজে, খোঁপাটিবেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ানো তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশবার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখছে খোঁপা ঠিক আছে কি-না, এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে মাখে না, কারুর কথাগ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একগুঁয়ে স্বভাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এইসব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে—কি দুর্দশাটাই যে ওর হবে ! ওর এত বই পড়ার বোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌ-ঝিদের বাক্সে যত বই আছে চেয়ে-চিনতে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েচে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, “ও-সব অলক্ষণে কাণ্ড বাপু—মেয়ে-মানুষের আবার অত বই পড়ার শখ, অতসাজগোজের ঘট্টা কেন ?পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, বাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।”

সীতার বুদ্ধি খুব। ‘শতগল্প’ ব’লে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে ‘সোনামুখী ও ছাইমুখী’ বলে একটা গল্প আছে, সৎমার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মানুষ হ’ত—তারপর কোন্দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানেরদয়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেছে। কিন্তুসীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোন দিন। ভারিচাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়েবললে—ঐ হীরুঠাকুর আসচে দাদা, আমি পালাই—

আমি বললাম—বোস্, হীরুঠাকুর কিছু বলবে না। ওঠিক আজ এখানে খাবার কথা বলবে দ্যাখ।

হীরুঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোরনেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কতদিন হীরুঠাকুরএসে আমাকে বলেছে, “তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো।” মাকে বলতেই তখুনি তিনি রাজী হতেন—মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসেন।

আমার কথাই ঠিক হ’ল। হীরুঠাকুর এসে বললে—“শোন খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজদুপুরে চাট্টি ভাত খাবো।” সীতা বই মুখে দিয়ে খিল্ খিল্ক’রে হেসেই খুন। আমি বললাম, “হীরু-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে। জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই, বাবা মারা গিয়ে পর্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।”

সেজকাকা লোক ভাল। হীরুঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল। সীতা উঠে একটা কম্বলপেতে দিলে। হীরুঠাকুর বললে, “তোমার দাদা কোথায় ?” দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরুঠাকুরের গল্প দাদা শুনতেভালবাসে, হীরুঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরুঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি ক’রেদিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত তখুনি প্রথম দাদারসঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরুঠাকুরেরকেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে নাকি আজ অনেকদিননিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরুঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলেএকদিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আনবে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরুর ওই-সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয়হীরুঠাকুর আর কখনও পায় নি।

খেতে বসে হীরুঠাকুর এক মহাগোলমাল বাধিয়েবসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরু কারুর নাম মনে রাখতে পারে না) “খুকী শোন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞেস কর তো ডালের বাটিতে তাঁরা কিকিছু মিশিয়ে দিয়েছেন ?আমার গা যেন ঘুরচে।” সবাইজানে হীরুঠাকুরের মাথা খারাপ, সে ওরকম একবারআমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িসুদ্ধ মেয়েরা বেজায় চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমাবললেন—“সেজঠাকুরপোর খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজনেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশদিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মিশিয়ে দিইআমরা। আ মরণ মড়ুইপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়েমেরে কি তোর লাকো টাকার তালুক হাত করব ?আজথেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়েগেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরেতাড়াবো।”

হীরু তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমারগালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু ক’রে উঠে গেল। দাদাএ-সময় বাড়ি ছিল না। আমাদের মুখে এর পর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে ?ছিঃ খাবার সময়জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয় নি। আহা !

সীতা বললে—গালাগাল দেওয়া ভাল হয় নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে ? লোকে কি মনে করবে ?

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিজ্ঞেস করলে—হীরুজ্যোষ্ঠা কোন্ দিকেগেল রে জিতু ?আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই-তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেলবেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠিদিয়ে স্কুলের অঙ্ক কষচি—এমন সময় দেখি হীরুঠাকুরকেসন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা।

হীরুঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উস্কোখুসকো, মুখ প্যাঙাস্—জ্বরে যেমনি কাঁপছে, তেমনি কাশচে। শুনলাম আজ না-কি চার পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ায় ভট্টাচার্যীদের পুজোর দালানে শুয়ে ছিল। অসুখে কাশ-থুথু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এইঅবস্থায় বলেছে সেখানে জায়গা হবে না। হীরুঠাকুর চলতেপারে না, যেমন দুর্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানককাশি ! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদারকি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান ! এটা কি নিজেদের বাড়িয়ে এখানে যা খুশি করা চলবে ?কোন্ ভরসায় দাদা ওকেএখানে নিয়ে এল দ্যাখো তো ?

যা ভয় করেছি, তাই হ'ল। হীরুকে অসুখ গায়ে হাতধ'রেবাড়িতে এনেছে দাদা, এ কথা বিদ্যুদবেগে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জাঠতুতোভাইবোনরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠোনে ছুটে এল, সেজকাকা এসে বললেন—“না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে ?এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে ?” কিন্তুততক্ষণে জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীরু ধুকছে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনোসপটা তাকে পেতে দিয়েছে।তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায় ?বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্যে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ'ল দাদাকে। এইজন্যেই বলচি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দুজনেই।আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনওআমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছুবোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল ক'রে বেরিয়ে আমরাচলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমেসেজকাকা আথালিপাতালি চড়চাপড় মারলেন। বললেন, বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপকাশের রুগী বাড়ি নিয়েএলে তুমি কার হুকুমে ?তোমার বাবার বাড়ি এটা ?এতটুকুজ্ঞান হয় নি তোমার ?সাহসও তো বলিহারি, জিজ্ঞেস না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললেকোন্ সাহসে ?নবাব হয়েছ না খিঙ্গী হয়েছ ?না তোমারচা-বাগান পেয়েছ ?

এর চেয়ে বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালিগালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, “যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরের দোরে উঠতে পারে না, পুকুর থেকেগায়ের ও-কোটসুদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।”

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কনকনে ঠাণ্ডাপুকুরের জল—তার ওপর চা-বাগানের আমলের ওই ছেঁড়াগরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদাগায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে ?সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড়নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখনউঠে এল তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়েরকোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে মা সাবু ক'রে দিলেন আমাদের ঘরের উনুনে—দাদা গিয়ে হীরুঠাকুরকে খাইয়েএল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদেরকাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়েছেজুরপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধালেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি ক'রে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপিচুপিএকবাটি সাবু মা'র কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল।দিন-দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুজ্জ-বাড়ির বড়মেয়েনলিনীদি রাত্রে একবাটি বার্শি দিয়ে আসতো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

একদিন রাতে দাদা বললে—“চল্ জিতু, আজহীরুজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি ?রামগতি-কাকা দেখেবলেছে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জ্বালাবো এখন, বড্ডশীত নইলে।”

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দুজনে গেলাম। আমরাযাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, “কি রকম আছে রে হীরুজ্যাঠা ?” তারপর সে চলে গেল। নারকোলেরমালা দু’তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশ খুথুফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কনকনে ঠাণ্ডা ! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায় ?দত্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুকনো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাললে। একটু পরেদুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাতে জানি না, আমার মনেহ’ল হীরুজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীরুজ্যাঠাআর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েছে। আমারদিকে চেয়ে হেসে বললে, “জিতু, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নাইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমারজ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্বংশ হবে নির্বংশ হবে।তোমরা বাড়ি গিয়ে শোও গে যাও।”

আমার গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলোকানে গেল, এত স্পষ্ট হীরুজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝেউঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তুভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁকড়ি হয়ে শীতেঘুমুচ্ছে, কাঁটালপাতার আগুন নিভে জল হয়ে গিয়েছে, হীরুজ্যাঠাও ঘুমুচ্ছে মনে হ’ল। বাইরে দেখি ভোর হয়েগিয়েছে।

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতিমুখুজ্জেকেডাকিয়ে আনলাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, “ও তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ হ’ল ?তোরা কি রাতে ছিলিনাকি এখানে ?”

হীরুজ্যাঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়াবোধ হয় আর কেউ ফেলে নি।

অনেকদিন পরে শুনেছিলাম, হীরুজ্যাঠাকুর পৈতৃক কিজমিজমা ও দুখানা আম-কাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্যন্ত হীরুজ্যাঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুন জ্যাঠামশায় নালিশক’রে নিলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এরপর হীরুজ্যাঠাকুর আপসে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হন নি। কেবলবলেছিলেন ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায়ফিরিয়ে দিলাম। হীরু তা নেয় নি, বলেছিল, সব যে পথেগিয়েছে, ও ভিটেও সে পথে যাক। এর কিছুকাল পরেইতার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের দান-ধ্যানধর্মানুষ্ঠান বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরেসত্যনারায়ণের পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিবছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেনবারজন্যে, শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকা আসে নানাজিনিসপত্র বোঝাই হয়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেকজিনিস। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌঁচেছে এবং তারজিনিসপত্র নির্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তাঁরাপ্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁটা বলি দিয়ে মনসাপূজা করতেন ওগ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহদেবতা গোপীনাথ জীউর পুজোর পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায়গরদের জোড় প’রে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়েকাঁসরঘণ্টা, ঢাকটোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ারজ্জাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির দোরেদাঁড়িয়ে ছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানোশালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—তিনি বাড়িটুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুরঅভার্চনা ক’রে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা শাঁক বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম—অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছেযেতে সাহস হ’ল না।মাকে মেমে পড়াতে সে-কথা ওঁদেরকানে যাওয়া থেকে মানুষের ধারা থেকে আমরা নেমেগিয়েছি ওঁদের চোখে—আমরা খুঁস্টান, আমরা নাস্তিক,পাহাড়ী জানোয়ার ঘরদোরে টুকবার যোগ্য নই। বৈশাখমাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ’তে লাগল ঠাকুরেরভোগের জন্যে—ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক’রেপ্রায়ই খাওয়াতেন, রাতে শীতলের লুচি ও

ফল-মিষ্টান্নপাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে দিতে দেখেছি তবুও সীতারহাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোন দিন দেননি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্রী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশি। ফর্সা মোটাসোটা এক-গা গহনা, অলঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর উপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা ছকুমেকোন কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাও গে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিয়ে হয়েছে, যদিও তাদের বয়েস খুব বেশী নয় এবং তাদের বৌয়েদের বয়েস আরও কম—দুই ছেলের এই দুই বৌ, ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে একভাগ্নেবৌ তার ছেলেমেয়েনিয়ে, আর আমার মা আমাদেরনিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন—এর মধ্যে এক ছোট কাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমারসেবাদাসী। ছোট কাকীমা বাদে এইজন্যে যে তিনিবড়মানুষের মেয়ে—তাঁর উপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশিখাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্লজ্জ কাণ্ডটাই হয় !রোজ রোজ দেখে সয়ে গিয়েছে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভাগ্নে, জামাই, ছেলেরা খেতে বসে। ছেলেদের পাতে, জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্নেদের পাতে হাতা ক'রে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা, ভাগ্নেবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজেদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্যে বাটিতে বাটিতেদুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আম দুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসরআবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে, মা আমায় একটু মধুদিতে বল না সদুর মাকে। কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়াহ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কিএক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয়তো ওরা এই কলায়ের ডাল মেখে খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয়যে মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তোছেলেমানুষ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয় ?আমি এই কথাবলি, যদি খাবার জিনিসের বেলায় কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সব চেয়েভাল ?

একদিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি ?মা তাল তাল বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে, রাজ্যের বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ডাবের ছড়াছড়ি এ বাড়িতে, গাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটাডাব নিয়ে খাও।

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি।আপন মনে কখনও বাড়ির কর্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, একদিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। একদিন ও-পাড়ার মুখুজেবাড়িতেবীরুর মা, কাকীমা, দিদি এরা সব ধ'রে পড়ল আমাকেবানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে হবে।

ওদের রান্নাবাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বলব ? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়েঠেসানো ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধিএসে গেল। এই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরি করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিসপত্র। ঘরে যেন সবে ঢুকেছি, এমন ভাব ক'রে বললাম—“ওগোকই, কোথায় গেলে, ফুলকপি গুলো নামিয়ে নাও না ?ছেলেটার জ্বর আজ কেমন আছে ?” মেয়েরা সব হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তিরসুরে বললাম, “আঃ, ঐ তো তোমার দোষ ! কুইনিন দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই ওর অসুখ যাচ্ছে না। খেতে দিয়েছ কি ?”

আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম সুরে কি একটাজবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—
“ওইপুটলিটা খোলো, তোমার একজোড়া কাপড় আছে আরএকটা তরল আলতা—”মেয়েরা আবার খিল খিল করেহেসে উঠল।

বীরুর ছোট বৌদিদি মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে লাগলো। আমি বললাম—“ইয়ে করো, আগে হাত-পাধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি ?সেইকখন ট্রেনে উঠেচি—ঝাঁকুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েছে—আর সেই সঙ্গে একটুহালুয়া—কাগজের ঠোঙা খুলে দেখ কিশমিশ এনেচি কিনে,বেশ ভাল কাবুলী—”

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুরমা বললেন—“ছোঁড়া পাগল ! কেমন সব বলচে দেখ, মাগো মা, উঃ—আর হেসে পারিনে !”

বীরুর ছোট বৌদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয়হাসতে হাসতে। বললে—“ওঃ মা, আমি যাব কোথায় ! ওর মনে মনে ওই সব শখ আছে, ওর ইচ্ছে ওর বিয়ে হয়,বৌ নিয়ে অমনি সংসার করে—উঃ মা রে !”

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে স্ত্রীরসঙ্গে গল্প করছি। রান্না এখনও শেষ হয়নি। আমি বললাম—“চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো ?কালিয়াটায় ঝাল একটু বেশি করে দিও।”

বীরুর কাকীমা বললেন, “হাঁ রে তুই কি কেবলখাওয়া-দাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে ?” কিন্তু আর কিধরনের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম খানিকক্ষণ, আরকি কথা বলা উচিত ?আমি এই ধরনের কথা সকলকে বলতে শুনেছি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম—“খুকীর জন্যে জামাটা আনবো, কাল ওর গায়ের মাপ দিও তো। আর জিজ্ঞেস করো কি রঙ ওর পছন্দ—না, না—এখন আরঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক। কাল সকালেই—” খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশিহয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরি নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরেবললাম—“আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে থাকতে আমি দেখে দেখে শিখেছি।”

মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, “তাও জানিস নাকি ?বা রে ! তা তো তুই বলিস নি কোনোদিন ?দেখি—
দেখি—”

“কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে ?আমার সঙ্গে আর কে আসবে ?সীতা থাকলে ভাল হত। সেও জানে।আপনাদের বীণা কোথায় গেল ?সে হলেও হয়।”

এ কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তাআমি বুঝতে পারলাম না। বীণা বীরুর মেজ বোন, আমারচেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল নাতখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরিটা আমার আর নেওয়া হয় নি সে-দিন।

সীতার বই পড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময়সীতাকে মুখনাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাটথাকতে ভালবাসে এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতেপারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেছেচা-বাগানে। একটিমাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময়সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবারগড়ে উঠেছিল মিস্ নটনের দরুন। মিস্ নটন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লালফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেশি তিনখানা কাপড়জোটেনি কোন সময়—জামা তো নেই-ই। (জ্যাঠাইমাবলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের ?) কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড়খানি প’রে থাকে, চুলটি টানটান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালেটিপ প’রে—এ গাঁয়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কারছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এঅঞ্চলের না— ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দুটো জিনিস সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকেসাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্যন্ত ঠিক ওই দুটোজিনিসই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাক্সে সাবান হয়ত আছে কিন্তু

সে বাক্স-সাজানো হিসাবে আছে, যেমন তাঁদের বাক্সে কাঁচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে—তেমনি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে—কেউব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই খুঁজলেও মেলে না—দুখানা বই ছাড়া—নতুন পাঁজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়—তবুও আমাদের বাক্সে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, সুবর্ণবর্ণিক পুত্রের কাহিনী আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনারি মেমেরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাওকলকাতা থেকে ডাকে আনাতেন—সীতার জন্যে এনেদিয়েছিলেন কঙ্কবতী, হাতেম তাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্যে একখানা ‘ভূগোল-পরিচয়’ ব’লে বই আর একখানা ‘ঠাকুরদার বুলি’। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, দু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভাল লাগে যীশুখৃস্টের কথা পড়তে। পর্বতেযীশুর উপদেশ, যীশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্তন। এ সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও সব বইপাওয়া যায় না ব’লে পড়িনে। যীশুর কথা এখানে কেউবলেও না। একখানা খৃস্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নটন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক’রে দেখি।

হিন্দু দেবতার কোন মূর্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যা পূজো করেন, তা গোলমত পাথরের নুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে মধ্যে। চৌধুরীপাড়ায় বড় পুকুরের ধারের পাকুড়গাছের তলায়কালো পাথরের একটা দেবমূর্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো আছে—আমি একদিন দুপুরে পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্ছি, বাবা তখন বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর খুব অসুখ—ওই সময় মূর্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ, মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা—একটা হাত ভাঙা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্তিটার, কি অপরূপ গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ’ল ওই পাথরের মূর্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃস্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখিনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়ের পাথরের নুড়ি পূজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্তির দেবতা কেন নিয়ে গিয়ে পূজো করে না? তার পরে শুনেছি ঐ দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্তিটা হাতভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়। সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার সীতাজবা, আকন্দ, কুমকো ফুলের একছড়া মালা গাঁথে মূর্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। অমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশবছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন করে কেনযে ফেলে দিয়েছে এরা।

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্যচরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা প’ড়ে আমার ভারি আনন্দ হ’ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আঁস্তাকুড়ে এঁটো হাঁড়িকুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব’লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা পৃথিবীর সর্বত্রই ঈশ্বর আছেন, এই আঁস্তাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক’রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইমার বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?

চৈতন্যদেবের সে কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভ’রে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনি নি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব’লে এত সুন্দর কথা যে ওঁদের ধর্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুলবুঝে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমায় শাস্তর শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনিএসেচেন আজ আমায় শাস্তর শেখাতে ! হিন্দুরআচার-ব্যবহার তোরা জানবি কোথেকে রে ডেঁপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড়জানতো—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথাগুলো চটলেন কেন ? তা ছাড়া আমি নিজে কিছু বলেছি কি ?

আগ্রহের সুরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচীদেবীকে— চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে—দেখাবো বইখানা ?

—খুব তক্কোবাজ হয়েচ ? থাক, আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরুমস্তুর নিতে যাচ্ছিনে— এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—তোমার তক্কো শুনবার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'লএতে ? মনে কষ্ট হ'লআমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোন কথা বলিনি।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বসল। জ্যাঠামশাইদেরবাড়ির পাশে যদু অধিকারীর বাড়ি। তারা বারেন্দ্র শ্রেণীরব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যদু অধিকারীর বড় মেয়েকে বিয়েরজন্য দেখতে এল চার-পাঁচজন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

যদু অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিজ্ঞেসকরেছে—শোন সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয়ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দিই, তোর পছন্দ হয় কাকেবল্ তো ?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাটা করচে—বলেচে নাকি চোখে-চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে কথা নিয়ে হাসাহাসি করচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলেসীতাকে বেহায়া, বোকা, বদমাইশ জ্যাঠা মেয়ে, যা তাব'লে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা গুঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি ক'রে আমি বুঝতেপারিনি। আমি সীতাকে বকলাম, মাও বকলেন—তুই যাক্লেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা তা বলিসই বাকেন ? এ-সব জায়গার ধরন তুই কি বুঝিস ?

সীতার চোখ ছল্ছল্ করে উঠল। সে অতশতবোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে ! সেমনে যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এতকথা উঠবে তা বুঝতেই পারেনি।

পৌষ মাসের শেষে আমাদের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল—শুনলাম ওঁদের গুরুদেব আসবেন ব'লে চিঠি লিখেচেন।

এই গুরুদেবের কথা আমি এঁদের বাড়িতে এর আগেঅনেক শুনেছি—জ্যাঠামশায়ের ঘরে তাঁর একটা বড় বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম—গুরুদেব চেয়ারে বসেআছেন, জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমা দুজন দু-দিকে মাটিতেব'সে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। অনেক দিন থেকে ছবিখানা দেখে গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে একটা কৌতূহলহয়েছিল—কিরকম লোক একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হ'ত।

স্টেশনে তাঁকে আনতে লোক গিয়েছিল—একটু বেলা হ'লে দেখি দাদা এক ভারী মোট বয়ে আগে আগে আসচে—পেছনে ব্যাগ-হাতে জ্যাঠামশায়দের কৃষাণ নিমুগোয়ালা। গুরুদেব হেঁটে আসছেন, রং কালো, মাথারসামনের দিকে টাক—গায়ে চাদর, পায়ে চটি। আমারজাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনোরা দরজার কাছে ভিড় করেদাঁড়িয়ে ছিল—পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্যে তাদের মধ্যেকাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি এগিয়েও গেলাম না, পায়েরধুলোও নিলাম না। জ্যাঠাইমা গুরুদেবের পা নিজের হাতেধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, খুড়ীমারা বাতাস করতেলাগলেন—ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তিনিসেজ-খুড়ীমাকে জিজ্ঞেস করলেন—বৌমা, ছেলের তোতলামিটা সেরেছে ?মেজখুড়ীমাকে বললেন—গোষ্ঠ (মেজকাকার নাম) আজকাল কি বাদার কাছারী থেকে গরমের সময় একদম আসে না ?...কতদিন আগে এসেছিলবললে ?

বাড়ির ছেলেমেয়েদের একে ওকে ডেকে মাথায় হাতবুলিয়ে আদর করলেন, দু-একটা কথা জিজ্ঞেসও করলেন—কিন্তু দাদা যে অত বড় ভারী মোট বয়ে আনলে স্টেশনথেকে, সে-ও সেইখানে দাঁড়িয়ে—তাকে একটা মিষ্টি কথাও বললেন না। আমার রাগ হ'লতিনি কি ভেবেচেন দাদা বাড়ির চাকর ?তাও ভাবা অসম্ভব এইজন্যে যে, ওখানে যতগুলো ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে—আছে, তাদের মধ্যে দাদার রূপ সকলের আগে চোখকে আকৃষ্ট করে—এগায়ে দাদার মত রূপবান বালক নেই, শুধু এ বাড়ি তোদূরের কথা। আশা করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাল কথাওতো বলতে হয় তার সঙ্গে ?

গুরুদেবের জন্যে বিকেলে বাড়িতে কত কি খাবারতৈরি হ'ল—মেজখুড়ীমা, সদুর-মা, জ্যাঠাইমা—সবাইমিলে ক্ষীরের, নারিকেলের, ছানার কি সব গড়লেন। মাকেএ-সব কাজে ডাক পড়ে না, কিন্তু দেখে একটু অবাক হলামসদুর মাকে ওঁরা এতে ডেকেচেন। মা আর সদুর মা'র ওপরযত উষ্ণ কাজের ভার এ বাড়ির। সদুর মা'র অদৃষ্ট ভালহয়েচে দেখছি।

গুরুদেব সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে বাইরে এলে তাঁকেযখন খাবার দেওয়া হ'লতখন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়েসবাই ছিল—আমরাও ছিলাম। কিন্তু হিরণদিদি ও সেজকাকীমা সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।গুরুদেব বললেন—কেন ওদের যেতে বলচ বৌমা, থাক না, ছেলেপিলেরা গোলমাল করেই থাকে—

গুরুদেব তিন-চারদিন রইলেন। তাঁর জন্যে সকালেবিকালে নিত্যনূতন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই যে হ'ল ! পিঠে, পায়েস, সন্দেশ, ছানার পায়েস, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, লুচি—তিনি তো খেতে পারতেন না—আমরাবাদে বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা তাঁর পাতের প্রসাদ পেত।তিনি জলখাবার খেয়ে উঠলে তাঁর রেকাবিতে বা থালায়যা পড়ে থাকত, কাকীমারা ডেকে ছেলেমেয়েদের দিতেন—আমরা সেখানে থাকতাম না—কারণ প্রথম দিকে ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকলে কাকীমা বকতেন—তার পরগুরুদেবের খাওয়া হয়ে গেলে যখন তাদের ডাক পড়ত, তখন বাড়ির ছেলেরা কাছেকাছেই থাকতো ব'লে তারাইযেত—আমি কারুর পাতের জিনিস খেতে পারিনে, এইজন্যে আমি যেতাম না। ওঁরা ডেকেও কোনো খাবার জিনিস আমাদের কোনো দিন দিলেন না—কিন্তু মনে মনে আমিহতাশ হলাম—আমি একেবারে যে আশা করিনি তা নয়, ভেবেছিলাম গুরুদেব এলে আমরা সবাই ভাল খাওয়ারভাগ পাব কিছু কিছু।

সন্ধ্যাবেলা। বেশ শীত পড়েছে। গুরুদেব আমলকীতলায় কাঠের জলটৌকিতে কম্বল পেতে বসে আছেন। গায়ে সবুজ পাড়-বসানো বাল্যপোশ—ছেলেমেয়েরা সব ঘিরে আছে, যেমন সর্বদাই থাকে; একটু পরে জ্যাঠাইমা, মেজকাকীমা, সদুর মা, হিরণদিদি এলেন।

গুরুদেবের খুব কাছে আমি কোনো দিন যাইনি—আমি গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেমেয়েরা গল্পশুনচে গুরুদেবের কাছে, আমার কিন্তু গল্পের দিকে মন নেই, আমার জানবার জন্যে ভয়ানক কৌতূহল যে গুরুদেব কিধরনের লোক, তাঁর অত খাতির, যত্ন, আদর এরা কেনকরে, তাঁর পায়ে জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায় পুষ্পাঞ্জলি দেনইবা কেন, তাঁর ফটো বাঁধিয়েই বা ঘরে রাখা আছে কেন? এসবের দরুন গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে গিয়েছে যে, তিনি যেখানেই থাকুন, আমি কাছে কাছে আছি সর্বদাই—অথচ খুব নিকটে যাইনে!

গুরুদেব মুখে মুখে ধর্মের কথা বলতে লাগলেন। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম ভাল করে শোনবার জন্য। এ-সব কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

একবার কি একটা যোগ উপস্থিত—গঙ্গাস্নানমহাপুণ্য, সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, স্নান করলেই মুক্তি। পার্বতী শিবকে বললেন—আচ্ছা প্রভু, আজ এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কাশীতে স্নান করবে, সকলেই মুক্তি পাবে? শিব বললেন, তা নয় পার্বতী। চলো তোমায় দেখাব।

দুজনে কাশীতে এলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। শিব বৃদ্ধব্রাহ্মণের শব সেজে ঘাটের ধারে পড়ে রইলেন। পার্বতী তার স্ত্রী সেজে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। যারা এল, তাদের বললেন আমার বৃদ্ধ স্বামী মারা গিয়েছেন, এরসৎকার করার ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু একটা মুশকিল আছে, শব যিনি স্পর্শ করবেন, তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়াচাই, নইলে শব-স্পর্শেই মৃত্যু ঘটবে।

এ-কথা শুনে সাহস ক'রে কেউ এগোয় না। সবাইভাবে পাপ তো কতই করেচি। প্রাণ দিতে যাবে কে? সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যা নামে-নামে। একজন চণ্ডাল ঘাটেরধারে অশ্রুমুখী ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে। পার্বতী সকলকে যা বলে এসেছেন তাকেও তাই বললেন। চণ্ডাল শুনে ভেবে বললে—তার জন্য ভাবনা কিমা? আজ গঙ্গাস্নান করলে তো নিষ্পাপ হবোই, এত বড়যোগ যখন, এ জন্ম তো দূরের কথা শত জন্মের পাপ ক্ষয়হয়ে যাবে পাঁজিতে লিখেছে। তা দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়েআসি এবং একটু পরেই ডুব দিয়ে উঠে এসে বললে—মাধরুন ওদিক, আমি পায়ের দিকটা ধরচি—চলুন নিয়ে যাই।

শিব নিজমূর্তি ধারণ ক'রে চণ্ডালকে বর দিলেন। পার্বতীকে বললেন—পার্বতী দেখলে? এই লক্ষ লক্ষলোকের মধ্যে এই লোকটি মাত্র আজকার যোগের ফল লাভ করবে। মুক্তি যদি কেউ পায় এই চণ্ডালই পাবে।

গল্পটা আমার ভারি ভাল লাগল। সে-দিনকার চৈতন্যচরিতামৃতে পড়া সেই কথাটা মনে পড়ল—জ্যাঠাইমাকে বলেছিলাম, জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন নি। ওঁদের শাস্ত্রের কথাতেই ওঁর বিশ্বাস নেই। অথচ মুখেহিঁদুয়ানি তো খুব দেখান! আর আমাকে, মাকে, সীতাকে, দাদাকে বলেন খিরিস্টান।

আজকার গুরুদেবের এই গল্পটা কি জ্যাঠাইমা কাকীমারা বুঝতে পারলেন? চণ্ডালের ওপর আমার ভক্তিহ'ল। আমি যেন মনে মনে কাশী চলে গিয়েচি, আমি যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব ও ব্রহ্মন্দনরতা পার্বতীকে প্রত্যক্ষ করেচি।

ও-বছর বড়দিনের সময় মিশনারী মেয়েরা আমাদের রঙীন কার্ড দিয়েছিল, ছোট একখানা ছবিওয়ালা বইদিয়েছিল। তাতে একটি কথা সোনার জলে বড় বড় ক'রলেখা আছে মনে পড়ল—তাহারা ধন্য যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারণ তাহারা জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেব আমলকীতলায়আসন পেতে বসে গল্প বলছিলেন ছেলেমেয়েদের। একবার উঠে আফ্রিক করতে গেলেন, আবার এসে বসলেন। মেয়েরাও এলেন।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দিয়েবললেন—ও ছেলেটি কে ?রোজ দেখি দাঁড়িয়ে থাকে। এসএস বাবা, এদিকে এস।

প্রথমটা আমার বড় লজ্জা হ'ল কিন্তু কেমন একটাআনন্দও হ'ল। একটু এগিয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা বললে—ও আমার এক খুড়তুতো দেওরের ছেলে। ওরা এখানেথাকতো না, চা-বাগানে ওর বাবা কাজ করতো। এখানেএসে অসুখ হয়ে মারা গেল; আর তো কেউ নেই, ওরা এবাড়িতে থাকে।

গুরুদেব বললেন—এস দেখি বাবা, হাতটা দেখি,সরে এস।

তারপর জ্যাঠাইমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খুবলক্ষণযুক্ত ছেলে। এর বয়স কত ?

আমায় লক্ষণযুক্ত বলাতে—বিশেষত অত ছেলেরমাঝ থেকে—জ্যাঠাইমা কাকীমারা নিশ্চয়ই খুব খুশি হননি।জ্যাঠাইমা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন আমার বয়স নাকিপনেরোবছর—আমি ওঁর ছেলে হাবুর চেয়েও দেড় বছরেরবড়। আসলে আমার বয়স তেরো—জ্যাঠাইমার বড় ছেলে হাবুকে আমরা হাবুদা বলে ডাকি, সে আমাদের সবার চেয়ে দু-বছরের বড়। স্কুলে তার যা বয়েস লেখানো আছে, তাইধরে বলচি।

তারপর গুরুদেব আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কি পড় বাবা ?

আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি বললাম।

ধাতুরূপ কতদূর পড়েচ ?লুঙ লিট বোঝ ?এই শোনোএকটি শ্লোক—

সোম্বৈষ্ণব বেদাংস্রিদশানযষ্ট।

পিতৃনতান্সীং সমমংস্তে বন্ধুন্

ব্যজৈষ্ঠ ষড়বর্গমরংস্ত নীতৌ।

সমূলঘাতংন্যবধীদরীংশ্চ।

হেসে বললেন—কত রকম ধাতুর ব্যবহার দেখেচ ?এহ'ল ভট্টিকাব্যের শ্লোক।

আমার বেশ ভালো লাগলো, গুরুদেবকেও এবং তাঁরশ্লোককেও। আমি এর আগে সংস্কৃত শ্লোক বেশি শুনিনি।চা-বাগানে কেউ বলতো না। শ্লোকটা আমি মুখস্থ ক'রেনিলাম।

একদিন তিনি বাড়ির পাশের মাঠে শুকনো পাতা দিয়েআগুন জ্বেলেচেন। আমায় দেখে বললেন—এসো জিতু—

আমি বললাম—কি করবেন আগুন জ্বেলে ?...

—তামাক পোড়াবো !—

আমি বললাম, আমি পুড়িয়ে দিচ্ছি।

গুরুদেব অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমাকে শোনালেন।কুবেরের শাপে এক যক্ষ গৃহ থেকে বহুদূরে কোন্ পর্বতে নির্বাসিত হয়েছিল, বাড়ির জন্যে ভেবে ভেবে তার হাতেরসোনার বালা ঢল হয়ে গিয়েছিল, তারপর আষাঢ় মাসেরপ্রথম দিনে সেই পাহাড়ের মাথায় বর্ষার নতুন কালো মেঘ নামল—এই রকম একটা, শ্লোকের মানে। আমি তো সংস্কৃতপড়ি মোটে ঋজুপাঠ, কিন্তু আমাকেই তিনি আগ্রহের সঙ্গেএমনি ভাল ভাল অনেক শ্লোক শোনাতে লাগলেন—যেনআমি কত বুঝি !

এবার মনে হ'ল আমার নিজের কথা যা কাউকে কখনও বলিনি এ পর্যন্ত—তাঁর কাছে খুলে বলি, আমারমনের সন্দেহ, আমার ঐসব অদ্ভুত জিনিস দেখার ব্যাপার, জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার নিয়ে

আমার মত না মেলা,—সকলের ওপর ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস—এসব খুলে ব'লে তিনি কি বলেন শুনি। তাঁর ওপর এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হয়ে গেল আমার ! যেনমনে হ'ল এঁর কাছে বললে ইনি সব বুঝিয়ে দিতে পারবেন আমাকে। এত বড় লোক ইনি, এত পণ্ডিত, কত কথাজানেন !

কিন্তু সুবিধে হ'ল না। বলি-বলি করেও বলতে আমার কেমন লজ্জা হ'ল। তিন দিন এমনি কেটে গেল, তারপরতিনি চলে গেলেন।

আমার কিন্তু বলতে পারলেই ভাল হ'ত। একজন ভাললোককে আমার সব কথা বলা দরকার। অথচ এখানে তেমনকোন লোককে আমি বিশ্বাস করিনে—কারুর ওপর আমারভক্তি হয় না।

আমি আজকাল নির্জনে বসলেই অদ্ভুত জিনিস সবদেখি। যখন তখন, তার সময় নেই অসময় নেই, রাত নেইদিন নেই। এই তো সেদিন বসে আছি জ্যাঠাইমাদেরপুকুরধারের বাগানে একলাটি—হঠাৎ দেখি পুকুরপাড়েরআমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরেরচুড়ো—প্রকাণ্ড মন্দির, রোদ লেগে বাকমন্ধরচে—সোনানা কি দিয়ে বাঁধানো যেন। মন্দিরের চারিপাশে বাগান, চমৎকার গাছপালা, ফুল ফুটে আছে, অপূর্ব দেখতে—ঠিকযেন আমাদের সোনাদা চা-বাগানের ধারে বনের গাছের ডালে ডালে ফোটা নীল অর্কিডের ফুল ! আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটি সুন্দরী মেয়ে, পরনে যেন শ্বেতচমরীর লোমে বোনা সাদা চকচকে লুটিয়ে-পড়া কাপড়—তারা উড়ে যাচ্ছে এক সারিতে, বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদেরদেখেচি। তারপর রোদ চক্চক্ করতে লাগল, আর তাদেরস্পষ্ট দেখা গেল না—ওপরের দিকে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। এরকম নতুন নয়, কতবার দেখেছি, প্রায়ই দেখি, দু-পাঁচদিন অন্তর দেখি, দেখে দেখে আমার সঙ্গে গিয়েচে, আগের মত ভয় হয় না। কিন্তু এক-একবার ভাবি, এ আমারএক রকম রোগ—না, চোখ খারাপ হয়ে গিয়েচে, নাকি ?

আমার কারুর সঙ্গে মিশতে সাহস হয় না এইজন্যে, হয়ত কোন্ সময় আবার অন্য ভাব এসে যাবে, আর কে সঙ্গে থাকবে সে আমায় ভাববে পাগল। হয়ত হাসবে, হয়ত লোককে ব'লে দেবে। এমনিও এ-বাড়িতে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, কাকা, এঁরা আমায় পাগলই ভাবেন। কি করবো। আমি যা দেখি, ওঁরা তা দেখতে পান না, এই আমারঅপরাধ। একটা উদাহরণ দিই—

ফাল্গুন মাসে ছোটকাকার মেয়ে পানী অসুখে পড়ল।একদিন দু'দিন গেল, অসুখ আর সারে না। জ্বর লেগেইআছে। সাতদিন কেটে গেল—জ্বর একই ভাব। দশ দিনেরদিন অসুখ এমনি বাড়ল, নৈহাটি থেকে বড় ডাক্তার আনবারকথা হ'ল।

পানীকে আমার এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল লাগে। তার বয়স বছর সাত-আট, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, চোখকটা, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত। এ-বাড়িরছেলেমেয়েদের মুখে যেমন খারাপ কথা আর গালাগালিলেগেই আছে—পানীর কিন্তু তা নয়। তার একটা কারণ, সে এতদিন মামার বাড়িতে তার দিদিমার কাছে ছিল, গঙ্গারওপারে ভদ্রেপুরে। সে বেশ মেয়ে, বেশ গান করতে পারে, প্রাণে তার দয়ামায়া আছে। পানীর অসুখ হয়ে পর্যন্ত আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওরকাছে গিয়ে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিই—কিন্তু কাকীমাতো আমায় বিছানা ছুঁতে দেবে না, সেই ভয়ে পারতাম না।

পানীর তখন সতেরো দিন জ্বর চলচে—বুড়োগোবিন্দ ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ি ক'রে স্টেশন থেকে এল—দালানে বসে মশলার কৌটো বার ক'রে মশলা খেলে, ভাজা মশলার গন্ধে দালান ভুর ভুর করতে লাগল—চা ক'রে দেওয়া হ'ল, চা খেলে, তার পর ওষুধ লিখে দিয়েভিজিটের টাকা মেজকাকার হাত থেকে নিয়ে না-দেখেইপকেটে পুরলে—তার পর রোগীকে বার বার গরম জল খাওয়ানোর কথা ব'লে গাড়ি ক'রে চলে গেল।

একটু একটু অন্ধকার হয়েচে কিন্তু এখনও বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি, কি আলো জ্বালা হয়নি—হয়তডাক্তার আসবার জন্যে সকলে ব্যস্ত ছিল বলেই। আমিযোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়লাম, কিন্তু পানীর বিছানায়—পানীর শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতেপারলাম না। লালপাড় শাড়ী পরনে আধঘোমটা দেওয়া কেএকজন, জ্যাঠাইমার মত দেখতে বটে কিন্তু জ্যাঠাইমা তোনয় ! ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই—

এইমাত্র কাকীমা বাইরেগেছেন ডাঙারে কি ব'লে গেল তাই জানতে ছোটকাকারকাছে। আমি ভাবচি লোকটা কে, এমন সময় তিনি মুখ তুলেআমার দিকে চেয়ে বললেন জিতু,—নির্মলাকে বোলোপানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবোনা—ও আমার কাছে ভাল থাকবে, নির্মলা যেন দুঃখ নাকরে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম—কে নির্মলা আমি চিনি, যিনি বলচেন তিনিই বা কে, কোথা থেকে এসেচেন, কই এ বাড়িতে তো কোনদিন দেখিনি তাঁকে, পানীকে তিনিএই অসুস্থ শরীরে কোথায় নিয়ে যাবেন, এসব কথা ভাববারআগেই ছোট কাকীমা ঘরে ঢুকলেন—কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিছানার পাশে যিনি বসে আছেন, ছোট কাকীমা যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন, এমন কোনো ভাবদেখলুম না।

বিছানায় যিনি বসে ছিলেন তিনি আমায় বললেন—জিতু, নির্মলাকে বল এইবার—আমি চলে যাচ্ছি।

আমি কিছু না ভেবে কলের পুতুলের মত চেয়েবললাম—নির্মলা কে ?

ছোট কাকীমা আমারদিকে কটমট করে চেয়ে বললে, —কেন, সে খোঁজে কি দরকার ?তিনি ভাবলেন আমি বুঝিতাঁকেই জিজ্ঞেস করচি। অন্য মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে ওদিকের দরজা দিয়ে বার হয়ে চ'লে গেলেন, যাবার সময়আমাকে বললেন—এই তো নির্মলা ঘরে এসেচে।

আমি বললাম—আপনি কেন বলুন না নিজে ?

ততক্ষণ তিনি বার হয়ে চলে গিয়েছেন।

ছোটকাকীমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন।বললেন—কি বকচিস পাগলের মত ?ওদিকে চেয়ে কারসঙ্গে কথা বলচিস ?নির্মলা কে সে খোঁজে তোমার কিদরকার শুনি ?

জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন সেই সময়ই। তিনি বললেন—কি হয়েছে ?কি বলছে ও ?

ছোটকাকীমা বললেন—আপন মনে কি বকচে দ্যাখোনা দিদি—ও এ ঘর থেকে চলে যাক। আমার ভয় করে, ও ছেলের মাথার ঠিক নেই—আমার নাম ক'রে কি বলচে।

জ্যাঠাইমা বললেন কি—বলছিলি কাকীমার নাম করে ?

আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি—আমি তখন কেমনহয়ে গিয়েচি। ছোটকাকীমার নাম যে নির্মলা আমি তাকখনও শুনিনি—ঐ মেয়েটি যে চলে গেল, আমার সঙ্গেকথা বলে গেল—ছোটকাকীমা তাঁকে দেখতে পেলেন না, তাঁর কথাও শুনতে পেলেন না এই বা কেমন ! জ্যাঠাইমারকথার কোনো জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরলো না, আমারমাথা ঘুরে উঠল। তারপর কি যে ঘটল আমি তা জানি না।

জ্ঞান হলে দেখি মা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদছেন। আমি দালানেই শুয়ে আছি। চারিপাশে বাড়ির অনেক মেয়ে জড় হয়েছে, সবাই বললে আমার মৃগীরোগ আছে। ভাবলাম হয়ত হবে, একেই বোধ হয় মৃগীরোগবলে। আমার বড় ভয় হ'ল, বাবা মারা গিয়েচেন পাগলহয়ে, এ-বাড়ির অনেকের মুখে শুনেচি আমরাও পাগলহ'তে পারি। তার মধ্যে আমার নাকি পাগলের লক্ষণ আছেঅনেক।

সে-সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। জীবনে এত ভয় আমার কোনদিন হয়নি—এই ভেবে ভয় হ'ল যে আমারসত্যিই কোনো কঠিন রোগ হয়েছে। কিন্তু কাউকে বলবার উপায় নেই রোগটা কি। মৃগীরোগই হয়ত হয়েছে, নয়তোবাবার মত পাগলই হয়ে যাব হয়ত—না, কি হবে !

যে রাতে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে বালিশের তুলো ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন, কেরোসিনের টেমির মিটমিটে অস্পষ্ট আলোয় রাতদুপুরে তার সেই অদ্ভুত সারা গায়ে, মুখে, মাথায় তুলোমাথা মূর্তি বার বার মনে আসতেলাগল—আমার মনে সে-রাত্রি, সে-মূর্তি চিরদিনের জন্যআঁকা হয়ে আছে। ঐ রকম কি আমারও হবে !

মাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলাম সারারাত। মনে মনেকতবার আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করলাম—প্রভু যীশু, তুমিদেবতা, তুমি আমার এ রোগ সারিয়ে দাও, আমায় পাগলহ'তে দিও না। আমায় বাঁচাও।

সকালে একটু বেলায় রোদ উঠলে পানী মারা গেল।

জ্যাঠাইমা সকালে উঠে বৌদের কুটনো কুটবার উপদেশ দেবেন, কি কি রান্না হবে তা ঠিক ক'রে দেবেন—এ বাড়িতে ভাগ্নে-বৌ ছাড়া কেউ গাই দুইতে পারে না—এদিকের কাজ সেরে জ্যাঠাইমা তাকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালেনিজের চোখের সামনে দুধ দোয়াবেন—সীতা বলে, পাছেভাগ্নে-বৌ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু সরিয়ে রাখিবোধ হয় এই ভয়ে। তারপর তিনি স্নান ক'রে গরদের কাপড় প'রে ঠাকুরঘরে ঢুকবেন—সেখানে আঙ্গিক চলবে বেলা এগারোটা পর্যন্ত, সে-সময়ে ঠাকুরঘরের দোরে কারুর গিয়ে উঁকি দেবার পর্যন্ত হুকুম নেই।

সবাই বলে জ্যাঠাইমা বড়পুণ্যবতী। পুণ্যবতীই তো ! একদিন যে-ছবি দেখেছিলাম, ভুলিনি কোনদিন। জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে এসেবারান্দায় দাঁড়িয়েছেন, পরনে গরদের শাড়ী, কপালে সিঁদুর, চন্দনের টিপ, টকটকে চেহারা—এমন সময় আমার মা একরাশ বাসি কাপড় নিয়ে গোবরছড়ার বালতি হাতে পুকুরের ঘাটে যাচ্ছেন, পরনের ময়লা কাপড়ের জায়গায় কাদা গোবরের ছাপ, রুম্ম চুল; বেলা বারোটোর কম নয়; সকাল থেকে মা'র মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি—

জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন—বৌ, রান্নাঘরের ছোটজালার জল কি কাল তুমি তুলেছিলে ? আমি না কতবারতোমায় বারণ করেছি ছোট জলায় তুমি জল ঢালবে না ? বড় জলায় বেশী না পার তো তিন কলসী ক'রে ঢেলেওতো বেগার শোধ দিলে পার ?

ছোট জালার জল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা বা কাকারান্না। জ্যাঠাইমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মা গুরুমন্ত্র নেননি, মায়ের হাতের জল অতএব শুদ্ধ নয়, সে জল গুঁরাখাবেন কি ক'রে ?

সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুরঘরে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ-আঙ্গিককরছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটা পর্যন্তগোয়াল-আঁস্তাকুড় ঘেঁটে—মা নাস্তিক মাতাল কেরানীর স্ত্রী, তার ওপর আবার মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাতখুইয়েছেন, কেন গুঁরা জল খেতে যাবেন মা'র হাতের ?

আমার মনে হ'ল ঠাকুরও শুধু বড়মানুষদের, পুণ্যবতীমানুষের জন্যে—নইলে মায়ের, ভাগ্নেবৌয়ের, ভুবনেরমায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিত মনে, শুচি হয়ে, গরদপ'রে তার পায়ে ফুলতুলসী দেবে ?

বোধ হয় এই সব নানা কারণে জ্যাঠাইমাদের বাড়িরগৃহদেবতার প্রতি আমি অনেকটা চেষ্টা করেও কোনো ভক্তি আনতে পারতাম না। এক-একবার ভেবেছি হয়ত সেটাআমারই দোষ, আমার শিক্ষা হয়েছে অন্যভাবে, অন্যধর্মাবলম্বী লোকেদের মধ্যে, তাদের কাছে যে দয়া-মমতাপেয়েছি, আর কোথাও তা পাইনি বলেই। ছেলেবেলা থেকে যীশুখৃস্টের কথা পড়ে আসছি, তাঁর করুণার কথা শুনেছি, তাঁর কত ছবি দেখেছি। আমার কাছে একখানা ছবি আছে খৃস্টের, মেমেরা বড়দিনের সময় আমায় দিয়েছিল—বকেরপালকের মত ধপধপে সাদা দীর্ঘ টিলে আলখাল্লা-পরা যীশুহাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে—চারিধারে তাঁর ছোট ছোটছেলেমেয়েরা ভিড় করেছে, একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁর পা ধরেউঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, আর তিনি তাকে ধরে তুলতেযাচ্ছেন নিচু হয়ে—মুখে কি অপূর্ব জ্যোতি, কি সুন্দরচাউনি—আমি এ ছবিখানা বইয়ের ভেতরে রেখে দিই, রোজ একবার দেখি—এত ভালো লাগে !

কিন্তু যীশুখৃস্টের সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পাইনে—আমার আরও জানবার ইচ্ছে হয় তাঁর কথা—মাকে যেমেমেরা পড়াত চা-বাগানে, তারা একখানা মথি-লিখিত সুসমাচার ও খানকতক ছাপানো কাগজ বিলি করেছিল, সেইগুলো কতবার পড়া হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া আর কোনোবই নেই। এখানে এসে পর্যন্ত আর কোনো নতুন বই আমারচোখে পড়েনি।

আমাদের স্কুলে একটা ছেলে নতুন এসে ভর্তি হয়েছেআমাদেরই ক্লাসে। তার নাম বনমালী, জাতে সদগোপ, রঙ খুব কালো, কিন্তু মুখের চেহারা বেশ, বয়সে আমার চেয়েকিছু বড়। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, বামুনে রাঁধে। অনেক দূরের পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি, সেখানে লেখাপড়া শেখার কোনো সুবিধে নেই, তাই ওকে ওর বাপ-মা এই গাঁয়ে পাঠিয়েচে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে বনমালীর মন নেই, সে বাসার উঠোনেএক তুলসীচারা পুঁতে বাঁধিয়েচে, দিনরাত জপ করে, একবেলা খায়, মাছমাংস ছোঁয় না, শ্রীকৃষ্ণ নাম তার সামনে উচ্চারণ করবার জো নেই, তা হ'লেই তার চোখ দিয়ে জলপড়বে। রাত্রে জপের ব্যাঘাত হয় ব'লে বিকেলবেলা স্কুলথেকে গিয়ে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বামুন ঠাকুরকে ছুটিদেয়—তার পর ব'সে ব'সে অনেক রাত পর্যন্ত জপ করে, হরিনাম করে। সে সময় কেউ কাছে গেলে সে ভারি চটে। অদ্ভুত ধরনের ছেলে ব'লে তাকে সকলে ভারি খেপায়—স্কুলের ছেলেরা তার সামনে 'কিষ্ট' 'কিষ্ট' ব'লে চোঁচায় তারচোখে জল বেরোয় কি না দেখবার জন্যে, ওই নিয়েমাস্টারের পর্যন্ত খিঁচুনি দিতে বাকী রাখে না। সেদিন তোএ্যাঙ্কজেরার আঁক না পারার দরুন আমাদের সামনে সেকেন্ডমাস্টার ওকে বললে—তুমি তো শুনিচি কেষ্ট নাম শুনলেকেঁদে ফেল—তা যাও, পয়সা আছে বাপের, মঠ বানাও, মছব দেও, লেখাপড়া করবার শখ কেন ?এ-সব তোমারহবে না বাপু।

আমি একদিন বনমালীর কাছে সন্ধ্যার সময় গিয়েছি।ও তখন একটা টুলের ওপর ব'সে একমনে দেওয়ালের দিকেচেয়ে বোধ হয় জপ করচে—আমায় দেখে উঠে দোর খুলেদিল, হেসে বসতে বললে। ওকে অদ্ভুত মনে হয়, সেজন্যেইদেখা করতে গিয়েছিলাম যে তা নয়—আমার মনে হয়েছিলও যে-রকম ছেলে, ও বোধ হয় আমার নিজের ব্যাপারগুলোর একটা মীমাংসা ক'রে দিতে পারবে। তা ছাড়াওকে আমার ভাল লাগে খুব, ওকে ভাল মানুষ পেয়ে সবাই খেপায়, অথচ ও প্রতিবাদ করে না, অনেক সময় বোঝে না যে তারা খেপাচ্ছে, এতে আমার বড় মায়্যা হয় ওর ওপর।

বনমালীকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু দেখে কিনা। সেআমার কথা বুঝতে পারলে না, বললে—কি দেখবো ?

তাকে বুঝিয়ে বললাম। না, সে কিছু দেখে না।

তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘরে একখানা ছবি ছিল, আমি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওখানাকি তোমার ঠাকুরের ছবি ?

বনমালীর গলার সুর বদলে গেল, চোখের চাউনি অন্যরকম হয়ে গেল। সে বললে—ঠিক বলেচ ভাই, আমার ঠাকুরের ছবি, চমৎকার কথা বলেচ ভাই—ওই তো আমার সব, আমার ঠাকুর শুধু কেন, তোমার ঠাকুর সবারই ঠাকুর—

বলতে বলতে দর দর করে তার চোখে জল পড়তেলাগল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরে বনমালীরকান্নার বেগ থামলে গর্বের সুরে বললাম—খুব গোপনীয় কথা বললাম ওকে—কারও কাছে এ পর্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা বলিনি। বললাম—আমার ঠাকুর অন্য কেউ নয়, আমারঠাকুর যীশুখ্রীস্ট—আমার কাছেও ছবি আছে—

বনমালী হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল—তারপরঅপ্রতিভভাবে বললে—ও, তোমরা খৃস্টান ?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

বনমালী ভেবে বললে—তাঁর কাছে সব সমান—

আমি বললাম—কার কাছে ?

—শ্রীহরির কাছে ভাই, আবার কার কাছে ?তাঁর কাছেকি আর হিন্দু, মোছলমান, খৃস্টান আছে ?তিনি যেপতিতপাবন—অধমের ঠাকুর—

আমার মনে ব্যথা লাগল এই ভেবে, বনমালী আমাকে অধম মনে করচে। যীশুখৃস্টকে ও ছোট করতে চায়। আমি বললাম—যীশুর কাছেও সব সমান। পাপীদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন—জান ? মথিলিখিত সুসমাচারে লিখেচে, যে তাহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন—

মথি-লিখিত সুসমাচারের বাইরে আমার আর কিছুজানা নেই। বনমালী কিন্তু সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আবৃত্তিকরে আমায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বুঝিয়ে দিলে—আরও অনেককথা বললে। আমি দু-তিন দিন তার কাছে গেলাম, তারঠাকুর সম্বন্ধে শুনবার জন্যে। জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সকলেরচেয়ে ও বেশী জানে ওদের ধর্ম সম্বন্ধে—এ আমার মনেহ'ল। কিন্তু বনমালী আমার খ্রীস্টভক্তি ভাল চোখে দেখলে না, বললে—হিন্দু হয়ে ভাই এ তোমার ভারি অদ্ভুত কাণ্ডে তুমি অপরের দেবতাকে ভক্তি করো। গীতায় বলেচে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ—অর্থাৎ নিজেরধর্মে—

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, হিন্দু আমি কখনই না। আমরা যেখানে যে-অবস্থায় মানুষ হয়েছি সেখানে হিন্দুধর্মের কথা কিছু শুনিনি কোনো দিন; কেউ বলত না। যা বলত, তাই শুনেছি, তাই বিশ্বাস করেছি—তা মনেলেগেচে। এতে আমার কি কোনো দোষ হয়েছে ভাই ?

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দালানে আমি ব'সেপড়ছি, এমন সময় কার পায়ে শব্দ শুনে চেয়ে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ছোটকাকীমা দাঁড়িয়ে ! ছোটকাকীমা বড়মানুষের মেয়ে, তিনি তো কস্মিন্কালে আমাদের ভাঙাদালানে পা দেননি—বিশেষ ক'রে আমাদের দু-চোখে তিনি দেখতে পারেন না কোনো কালে—বরং মেজকাকীমা সময়েঅসময়ে নরম হন, ছোট কাকীমার মুখে মিষ্টি কথা কোনো দিন শুনিনি। আমাদের ঘরে আর কেউ নেই—দাদাএখনও ফেরেনি—সীতা ও মা জ্যাঠাইমাদের অন্দরে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে খতমত খেয়ে বললাম—কি কাকীমা ?

ছোটকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু সুরে বললেন—তোমার সঙ্গে কথা আছে জিতু।

আমি বললাম—কি বলুন ?

কাকীমা বললেন—পানী যে-রাতে মারা যায়, সেদিনতুই আমার কি বলেছিলি মনে আছে ?

আমায় ভয় হ'ল, বললাম—না কাকীমা।

ছোটকাকীমা হঠাৎ আমার হাত দুটো তাঁর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—বল বাবা জিতু, সেদিন তোমার কথাসবাই উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিন্তু তারপর সব বুঝেছিলাম, কাউকে বলিনি। পানী ছেড়ে গিয়ে আমায় পাগল ক'রে রেখে গিয়েচে—তুই বল জিতু। আমার মাকে তুই দেখেছিলি সে-রাত্রে, তিনি পানীকে ভালবাসতেন, তাইনিতো এসেছিলেন—মরে গিয়েও তাঁর পানীর কথা—

আমি জানতাম না যে পানীর দিদিমা মারা গিয়েচেন। আমি বিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মা বেঁচে নেই ?

—না, পানী তাঁর কাছ থেকে ফাল্গুন মাসে এল, তিনি আষাঢ় মাসে তো মারা গেলেন। তুই পানীকে দেখতে পাসজিতু ? তোকে সেদিন সবাই পাগল বললে, কিন্তু আমি তারপর ভেবে দেখলাম তোমার কথার একটুও পাগলামি নয়—সব সত্যি। তুই আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলি—সত্যি বল না জিতু বাবা পানীকে দেখিস ?

আমার চোখেও জল এল। ছোট কাকীমাকে এত কাতর দেখিনি কখনও—তাছাড়া পানীকে আমিও বড়ভালবাসতাম এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বললাম না কাকীমা, পানীকে আমি কোনো দিন দেখিনি—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি—

ছোটকাকীমা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মেজকাকারগলার স্বর শুনে তিনি পালিয়ে গেলেন। ছোটকাকীমার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম। আমি সেদিন সত্যিসত্যি কাউকে দেখেছিলাম ? তবে ? সে

যেইহোক, পানীর দিদিমাই হোক, মরাই হোক বা জীবন্তই হোক !এটা তা হলে আমার রোগ নয় ?আর কেউ তবে দেখে নাকেন ?

কিংবা হয়ত ছোটকাকীমা মেয়ের শোকে বুদ্ধিহারিয়েছেন, কি বলচেন না-বলচেন, উনিই জানেন না। গুঁর কথার উপর বিশ্বাস কি ?

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এইভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে তত বেশি কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়সবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিস আমি বুঝতে পারিআজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল এইজন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম ও আচারের সঙ্গেনিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এঁরা খুব ঘটা করে যেটা ধর্ম বলে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা তো আদৌ মেলে না—আমি মনেযা বলি, বাইরে তা করি—কিন্তু ওঁরা তাতে চটেন। ওঁদেরধর্মের যেটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে ওঁরা ধর্ম বলেননা।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে এই, আগে ভাবতাম শুধুজ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বারসঙ্গে বুঝতে পেরেছি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাইমায়েরা একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধ হয় আমার মধ্যেই কোনো দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতেপারিচি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারি না বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকারদরুন ওদের ধর্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাইনি, যেআবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েচি, সেটাইএখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—যার বড় ছেলে ননীভাল ফুটবল খেলতে পারে এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধাবিঘ্ন না মেনে বাবার সৎকারের সময়েদলবল জুটিয়ে এনেছিল—তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎনবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে। ননীর যোগাড়যন্ত্রে তাদের শ্বশুরবাড়িতেআমার থাকবার ব্যবস্থা হল।

এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ'ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়েহয়েচে, আর একটি আমার বয়েসী, ফাস্ট ইয়ারেই ভর্তিহ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদিদিবাড়ির বড়বৌ; আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরযত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচেগড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলাদেশ সম্বন্ধে যেএকটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চারমাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এ বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীননয়। কোনো একজনকে সকলের ভয় ক'রে চলতে হয় না বাকোনো একজনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমিবাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এতবড় সংসারের কাজকর্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাকীমার চেয়ে কিছু ছোটহবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরায় থাকতে খুববেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়িবেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল, তারপরননী কথাটা পাড়তেই তখনি রাজী হয়ে যায় আমায় এখানেরাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোনো কথা ফেলতেপারে না।

বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়িরমধ্যে সর্বত্র যাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়োনা, ওটা ছুঁয়ো না—কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সববিছানাতেই বসি—সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়স হয়েছে বুঝতে পেরেচি, আটঘরায় যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্যে, সীতার জন্যে—তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনেরবাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদারজন্যেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরি করবে সংসারের দুঃখ ঘুচাবে

বলে—কিন্তু চাকুরি পায় না, ঘুরেঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরি করে, কালজবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকামাইনের চাকুরি জেটায়। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেয়ে পরে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকারবেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? অথচনা শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চিরওপর বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে ভয়ানকইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোডেনড্রন ফুল দেখিনি, পাইন-বন দেখিনি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিনি—সে রকম শীতআর পাইনি কোনোদিন,—এদের সবাইকে দেখতে ইচ্ছেহয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ’ত—কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইন বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা, মেঘ আমার কাছে পুরনোহবে না কোনো দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুন ভাবও ভাষা কোথা থেকে এসে জেটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয়নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমারমন তৃপ্ত হ’ত না, মনে হ’ত যা দেখেছি তার অতি ক্ষুদ্রভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বললে কিহবে, তারা তোআর দেখেনি?

ওপারে ব্যারাকপুরের সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজেরসমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই তো রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, লুলু আলো দিয়ে যা। এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারশিপিয়ে পাস করেছে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপহয়।

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ—রোজ এসে আমার কাছেখৃস্টান ধর্মের নিন্দা করা। আমাকে ও খৃস্টান ধর্মের কবলথেকে উদ্ধার ক’রে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভকরলে বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুর্বি গল্প। খৃস্টানইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভাসিয়ে দিলেগ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ? রোজ যাও পিকারিংসাহেবের কাছে ধর্মের উপদেশ নিতে। ওরা তো তোমাকেখৃস্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদেরবলবৃদ্ধি করা আমাদের সবার কর্তব্য—এটা কি তোমারমনে হয় না ?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝেচ ভবেশ, তোমাকেএক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃস্টান নই; খৃস্টান ধর্ম কি জিনিস আমি জানিনে—জানবার কৌতূহলহয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে চাই। আমি যীশুখৃস্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলে মনে করি। তাঁর কথা আমার শুনতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকেমুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি তো বুঝি নে।

—ও বটে ! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, এঁরা সব ভেসে গেলেন—যীশুখৃস্ট হ’ল তোমার দেবতা ! এঁরাকিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিজ্ঞেস করি ?

—কে বলেছে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা তোউঠচে না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও তো হয়, কেউ একজনকে বেশি ভালবাসে আর একজনকে কমভালবাসে ?

—তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগেনা। দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মতচমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে ভেবে ঠিক করতেপারিনে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃস্টের বিষয়শুনতে? একশোবার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ

গস্পেল পড়তে যাওঁপিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলেতুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি বলতে যাব কেন ?

ভবেশ চলে গেলে অনেক রাত পর্যন্ত কথাটাভাবলাম। খুঁস্টকে আমি ভক্তি করি, খুঁস্টের কথা বলতেভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু ? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে ?

রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলেরখাওয়া হয়ে গিয়েচে। ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট জাকে আমি কি জানিকেন পছন্দ করিনে। মেজবউ, সেজবউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এ পর্যন্ত কোন কিছুব'লে ডাকিনি। অথচ তিনি আমার সামনে বেরোন বাআমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বয়স আমার সমানহবে, এই সতেরো আঠারো—আমি যদিও 'আপনি' বলেকথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বৌয়েরা জানে যেছোটবউয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কেন আমি তাঁকে ছোটদিদি বলে ডাকিনে, শৈলদি আমায় এ নিয়েকতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমিকখনও করিনে।

সেদিন এক ব্যাপার হয়েছে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েচি—কাউকে বিশেষ ক'রে সম্বোধন ক'রে নয়, যেন দেওয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটাদিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমারকেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'ল কেন জানিনে, অন্য কারুরবেলা আমার তো এমনি অস্বস্তি বোধ হয় না ?পান দেবারসময় তাঁর আঙুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমনশিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্বস্তিতে মনে হ'ল, পান আরকখনও এমনভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেইদিন থেকে ছোটবউকে আমি এড়িয়ে চলি। মাস কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক কষচি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন—জিতুএস, তোমায় ওরা ডাকছে।

আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি ?

সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে।উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়েহাসাহাসি করছে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে।

তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোল তো দেখি কেমন বাহাদুরি।

বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে একজনশুয়ে আছে লেপমুড়ি দিয়ে। সবাই বললে—তোল তোলেপটা !

আমি হাসিমুখে বললাম—কি বলুন না সেজদি, কিহয়েচে কি ?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজয়কে এরাএকটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায়ছোটবৌঠাকরুন, মুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে।

সবাই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল। আমি লজ্জায়লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বারে, এ কিকাণ্ড ওদের ?কেন আমায় নিয়ে এ রকম করা ?তা ছাড়া—ছিঃ—না, ওকি কাণ্ড ! ছোটবৌঠাকরুন স্বেচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রেরমধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন-দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোট-বৌঠাকরুনকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—তিনি আমার ঘরে কখনও আসেননি এ পর্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটু দাঁড়ালেন না, যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজ করা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি ! ছোট চিঠি, দু-কথায়—

“সেদিন যা ক’রে ফেলেছি, সেজন্য আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করিনি। দলে পড়করেছি, কদিন ধ’রে ভাবছি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারিনি ! আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।”

পত্রে কোন নাম নেই। আমি সেখানা বার বার পড়লাম—তারপর টুকরো টুকরো ক’রে ছিঁড়ে ফেললাম—কিন্তু টুকরোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মানিব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ’ল, আমি একা থাকলেই ছোটবৌঠাকরুনের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমিতার চিন্তা ছাড়তে পারিনি। দু-পাঁচদিন করে হপ্তখানেককেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাইনে—অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোটবৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেকলোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুনতে পেলে বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বললেন—জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি ? বিকেলে তো বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না, কোথাও থেকে খেয়ে আস বুঝি ?

আমি জানি বিকেলের চা-খাবার প্রায়ই ছোটবৌ তৈরি করেন—আর সে সময় বড় একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা করেই বিকেলে চা খেতে যাই নে। পয়সা যেদিন থাকে, স্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানলার ধারে বসে পড়ছি, হঠাৎ জানলার পাশের দরজা দিয়ে ছোটবৌঠাকরুন কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি ঢুকচেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নতুনরূপে দেখলাম—আরো কতবার দেখেছি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ’ল এ-চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে অমন সুশ্রী দেখায়, ভুরুর ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ-সব আগে তো লক্ষ্য করিনি ? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরনের ভাব হয় ! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন বসল না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ’তে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ’ল চুপক’রে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে।

সেই রাতে আমি তাঁকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। আবার লিখে আবার ছিঁড়লাম। সেদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য ক’রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি।

দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম—গ্রীষ্মের দুপুর, সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশে দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি সাহস ক’রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে এলাম—পত্র দেওয়া হ’ল না, সাহসই হ’ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথেপথে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়লাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাতে বাড়ি যখন ফিরি, রাত তখন বারোটা। বাড়িতে আবার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার ঢাকা আছে, শৈলদি

তুলচেন রান্নাঘরেরটোকাঠে বসে। মনে মনে অনুতাপ হ'ল, সারা বিকেলখাটুনির পরে শৈলদি বেচারী কোথায় একটু ঘুমুবে, আরআমি কি-না এভাবে বসিয়ে রেখেছি !

আমাকে দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলিএতক্ষণ ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুশকিল, চুপচাপ খেতেবসলাম—শৈলদি বললে—না খেয়ে ঢন্ ঢন্ করে বেড়িয়েবেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস্ নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবারপাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না—থাকিস্ কোথায় ?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বললে—ও কি, ভাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ভাই ?তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়স। লুচি আছে ভোগের, দেবো ?পায়েস তুই ভালবাসিস, এক বাটি পায়েস আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেললি কেন, চুষে চুষে খা।আহা, কি ছিরি হচ্ছে চেহারার !

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েছি তার প্রাইভেট টিউটর নীচে পড়াতে এসেচেব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ওপরে উঠেই আমি একেবারে ছোটবৌঠাকরুনের সামনে পড়ে গেলাম। তাঁরকোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিন্টু—সে খুব ফুটফুটে ফর্সা ব'লে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবারজন্যে ব্যগ্র। ছোটবৌঠাকরুন হঠাৎ আমার সামনে এসেদাঁড়ালেন—খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমারকোলে ঝাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবৌঠাকরুন আমারআরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খুকীকে আমারকোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলেঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেছি, শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবৌঠাকরুন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুর নিচুক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল ?আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি ?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন ?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথাবললেন না তো ! চলে গেলেন কেন ?

মরীয়া হয়ে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দেবোব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্যে দেওয়া হয়নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যেআসিনে।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর মৃদুস্বরেবললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকমকরেন ?আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন ? ওতে আমারমনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন তেমনি আসবেনবলুন ?আমায় ভাবনার মধ্যে ফেলবেন না ওরকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরনের অনুভূতির বিদ্যুৎখেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যাএল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত আরঘুমুতে পারিনে। আমার জন্যে একজন ভাবে এ চিন্তারবাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন। নতুন নেশার মতএ অনুভূতি আমার সারা দেহমন অভিভূত ক'রে তুললে।

কি অপূর্ব ধরনের আনন্দ-বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ! দিনরাতে সব সময়ই আমার ওই একচিন্তা। নির্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ যাঁর চিন্তাশয়নে-স্বপনে সর্বদাই করি, পাছে তাঁর সামনে পড়ি এইভাবে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুমসব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোটবৌঠাকরুনের হ'ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরনের হ'ল। ছাত্ররা থেকে যদু ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজনএসে পড়ল—বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা এ-সব করি বাড়ির ছেলেদেরসঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়েদাঁড়িয়েছিলাম—কিন্তু টোকাঠের ওপারে যাইনি।

ক্রমে তিনি সেরে উঠলেন। একদিন আমার ‘চয়নিকা’-খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন-দুই পরেকালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে ‘চয়নিকা’-খানা কি জন্যে খুলতে গিয়েছি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবৌঠাকরনের হাতে লেখা।

নাম নেই কারুর। লেখা আছে...

“আমার অসুখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন নাকেন ? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি আসবেন, জানেন তো ? আমার মরে যাওয়াই ভাল। কেন যে আবার সেরে উঠলাম ! অসুখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেছি, আপনি ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন যীশুখৃস্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন—কিন্তু আপনি যাকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারিনে। আমার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন। আর-একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আসবেন না ?”

যীশুখৃস্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানাবুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনেটাঙিয়েছিলাম, রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকৃতিওদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েছে। কিন্তু আমি কি পারব ? অনুকম্পায় মমতায় আমার মন তখনভরে উঠেছে। যে প্রার্থনা ওদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারিনে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশিদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখনথেকে।

টেস্ট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরায় পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন। মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্য। গেলেই মায়েরদুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরিপেয়েছে, মাসে কিছু টাকা অতিকষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল—তারই বা কি করা যায় ? দাদা একাই বা কি করবে !

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললেন—তুমি এ-সব পড় নাকি ? বাইবেল কি তোমারসকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না ?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে কি দোষ আছে সাহেব ? তা ছাড়া আমি তো খৃস্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—দু-নৌকাতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হও—নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন ?

সাহেব, যদি বলি ইংরেজী ভাষা ভাল ক’রেশেখবার জন্যে ?

পিকারিং সাহেব হো হো ক’রে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিভ্রাণ তার চেয়েও বেশি দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ভ্রাণ নেই। তিনি আমাদেরসকলের পাপের ভার নিজে নিয়ে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁররক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তার পর সাহেব নিজেই গান ধরল—

Nothing but the Blood of Jesus

Oh, precious is the flow.

That can make me white as snow,

No other fount I know

Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুবসরল, ধর্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারোবছর, আর বিয়ে করেননি,—টেবিলের ওপর নিকেলেরফ্রেমে বাধানো স্ত্রীর ফটো সর্বদা থাকে। মাঝে মাঝে

আমায়জিজ্ঞেস করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না ?ফটো দেখে মিসেস পিকারিংকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার,তবু বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্মমত আমার কাছে কিন্তু অনুদারঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয়জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু—খৃস্টানদের মধ্যেও তেমন গোঁড়া খৃস্টান আছে। এরা নিজের ধর্মটি ছাড়া আর কারুরধর্ম ভাল দেখে না। এদের সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষত একটা নির্দিষ্ট ধরনেরঈশ্বরের উপাসনানা করলে উপাসনা ব্যর্থ হ'ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম।শেষবিচারের দিন পর্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলবে পুড়বে, খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথম যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ'ল, কেন যীশুকি এতই নিষ্ঠুর ?তিনি পরিত্রাণের দেবতা, তিনি সকলপাপীকেই কেন পরিত্রাণ করবেন না?যে তাঁকে জানে, যেতাকে না-জানে—সবাইকে সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন ?তাঁর কাছে খৃস্টান ও অখৃস্টানে প্রভেদ থাকবে কেন ?বরং যে অজ্ঞানান্ন তার প্রতি তার অনুকম্পা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই খৃস্টের ছবি খাপ খায়।তিনি প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্মের দলাদলিথাকে কখনো ?যে দেশের, যে ধর্মের, যে জাতিরই হোকতিনি সবাই—যে তাঁকে জানে, তিনি তার, যে না জানে, তিনি তারও।

একদিন গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপরে বসে জনকতকলোক গল্প করচে—শুনলাম বরানগরে কুঠির ঘাটের কাছে একটা বাগান-বাড়িতে একজন বড় সাধু এসেচেন, সবাইদেখতে যাচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড়ে নেমে গঙ্গা পার হয়ে কুঠিরঘাটের বাগান-বাড়িখোঁজ করে বার করলাম। বাগান-বাড়িতে লোকলোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে।ফটকের কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়েছিল, আমিফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেইলোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্যেই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি !

আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়েধরে—আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটাআমায় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল ওআগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকেররোয়াকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারি কুটছে—একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাখা হচ্ছে,—যেদিকে চাই, খাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন ?

—তিনি এখন ধ্যান করচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায় নিয়েযাই।

কথা বলচি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গেএকটি মহিলা—ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন।একজন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিজ্ঞেস করলেন—সে তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল আমার সঙ্গে দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন স্বামীজিরসঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায় ?

—কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?

—ভবানীপুর, এলগিন রোড থেকে। আমার নামবিনয়ভূষণ মল্লিক।

দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইস্ক্রুপ কজা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলেবললে—আঙুল আসুন, আসুন, বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে আসুন—আসুন মা-লক্ষ্মী।

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানেবসেচেন—তবে গুঁরা গেলেন যে ! লোকটি গুঁদের ওপরেদিয়ে আবার নেমে এল। আমায় একটা হলঘরে নিয়ে গেল।সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েদিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, রংফর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার

করলেন। তিনিআপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী বলেচেন তিনিতিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেইবেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র জপ ক’রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েচেন নিজে—এই সব গল্প সমবেত দর্শকের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গেজিজ্ঞেস করলাম—কি ফল পেয়েচেন মন্ত্রের ?তিনিবললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায়পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামীজি বলেন—এ একটাউচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম—আরকিছু দেখেন ?তিনি বললেন, জ্যোতিঃদর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম ?

—দুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মতদীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতাশ হ’লাম। আমি নিজে তো কত কি দেখি ! এরা তো সে-সব কিছু দেখে বলে মনে হয় না। এরা আরকতটুকু দেখে তা হলে ?পাহাড়ের ওপর বসে আছি এইদেখলেই বা কি হ’ল ?ভুরুর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেইবা কি ?

শুনলাম বেলা ছ’টার পরে স্বামীজীর দেখা পাওয়াযাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও একজন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ তো বাবা—এই তোমরাও তো ছেলে। আর আমার হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসিরদলে যোগ দিয়েছে। এখানে তো এই খাওয়া এই থাকা যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটারহাড়ির হাল হয়েছে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতেএসেছিলাম—তা যায়নি। এবার আমি আসচি শুনে কোথায়পালিয়েছে হতভাগা। আহা কোথায় খাচ্ছে কি হচ্ছে—এদিকে বাড়িতে ওর মা অল্পজল ছেড়েছে। এই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেছে কোথায়। আজ তিন দিনএখানে বসে আছি, তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায়তাকে খবর দিচ্ছে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি ?বলচে ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েচে, বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যেটোকাবে ?শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সার চাকরহাতছাড়া হয়ে যায় তা হ’লে যে ! আমায় এই মারে তো এইমারে। দু-বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল ?

—এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের মাদারিপুরে। খুব কীর্তন ক’রে ভিক্ষে ক’রে শিষ্য-সেবক তৈরি ক’রে বেড়ালক’দিন। সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুস্লে নিয়ে এসেচে।পয়সা হাতে থাকত আমার তো ব্যাটারা খাতির করত।এখানে খেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়েআসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি, তাওদু-বেলা বলচে—বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরেআসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ’ল না। দেখার ইচ্ছেও আরছিল না।

সন্ধ্যার পরে স্টীমারে পার হয়ে বেণুড়ে এলাম; মনেকত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদেরবাড়ির গোপীনাথ জিউ-এর পুজোর সময় যা দেখেছি, হীরুঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেছি—সেই সবএকই যেন।

দিন দুই পরে ছোটবৌঠাকুরনের বাপের বাড়ি থেকেবড় ভাই তাকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনেরো দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই।দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়িতে জিনিসপত্র ওঠানো হচ্ছে, আমি নিজের ঘরের জানলা দিয়ে দেখছি আর ভাবছি ওঠবার সময় গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়েদেখা ক’রে আসব ?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাকুরনদোরের কাছে দাঁড়িয়ে রোগশীর্ণ মুখে, হাতায় লাল পাড়বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরনে লালপাড় শাড়ী। আমি থতমতখেয়ে বললাম—আপনি ! আসুন, এই টুলটাতে—

তিনি মৃদু, সহজ সুরে বললেন—খুব তো এলেন দেখাকরতে !

—আমি এখুনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন, তাইনইলে—

ছোটবৌঠাকরুন ম্লান হেসে বললেন—না, নিজেইএলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে ?আপনি তো পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি.এ. পড়বেন না ?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—ঠিক নেই, এখানেহয়ত আর আসব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না ?

আমি কোন কথা বললাম না। দুজনেই খানিকক্ষণচুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদুঅনুযোগের সুরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনওদেখেচি ! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়েযে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে যাই ?এখনসে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বাঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের সুরে বললেন—না, ও-সব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলেবুঝাবো আমায় খুব ঘেমা করেন, তাই এলেন না।

দাদা কালীগঞ্জে একটা বাতাসার কারখানায় কাজ করে। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কিছু টাকার দরকারও ছিল, কারণ কলেজের কিছু বাকী মাইনে ও পরীক্ষার ফি-এর টাকার অভাব হওয়াতে শৈলদি লুকিয়ে ষোলটা টাকাদিয়েছিল। যাওয়ার আগে সে-টাকা তাকে দিয়ে যাওয়া দরকার, যদিও সে চায়নি। বাঁশবেড়ের ঘাটে গঙ্গা পার হয়েওপারে যাব, খেয়ার নৌকো আসতে দেরি হচ্ছে, আমিপ্রকাণ্ড একটা পুরোনো বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষাকরছি। ঘাটের ওপরে একটা জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির, তারফাটলে—ফাটলে বট-অশ্বথের গাছ, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটাপশ্চিমে হেলে-পড়া সন্ধ্যার সূর্যের আলোয় মনে হচ্ছে যেনসোনার। ভারি ভালো লাগছিল মন্দিরটা, আর এই জনবিরলবাঁধাঘাট। ওই মন্দিরে যদি আরতি হ'ত এই সন্ধ্যায়, বন্দনারত নরনারীর দল ওই ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে রইততবে আমার আরও ভালো লাগত। কথাটা ভাবছি, এমন সময় আমার শরীরটা যেন কেমন ক'রে উঠল, কানের পাশটাশির্শির করতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হল এই ঘাটের এই মন্দিরে খুব বড় একজন সাধুপুরুষ আছেন, তাঁরদীর্ঘ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, প্রসন্ন হাসিমাখানো মুখ। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভবকরলাম। তিনি এখানে অনেকদিন আছেন, ভাঙা ঘাটের রানায় ব'সে ওপারের উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় তিনি উপাসনা করেন—এবং তিনি কারও ওপর রাগেন না। কত লোক না বুঝে ঘাটের নির্জনতা ভঙ্গ করে, তিনি সদাই প্রসন্ন, সকলের ওপরে সদাই স্নেহশীল।

এ-রকম যখন হয়, তখন আমার শরীর যেন আমারনিজের থাকে না—নয়ত আমার সাধারণ অবস্থা থাকলেজিঞ্জেস করতুম অনেক কথাই তাঁকে। একটু পরে খেয়ানৌকা এল, অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাট ছেড়ে নৌকোতে উঠলাম। জায়গাটা পবিত্র প্রভাবে ভরা—এমন একটা প্রভাব, যাসে-দিন বরানগরের বাগান-বাড়ির সেই সাধুর কাছে গিয়েঅনুভব করিনি।

দাদা আমায় দেখে খুব খুশি হ'ল। ওর চেহারা বড়খারাপ হয়ে গিয়েছে, ছেলেবেলাকার দুখে-আলতা রঙেরসেই সুশ্রী বালককে দাদার মধ্যে আর চিনে নেওয়া যায় না। একে লেখাপড়া শিখলে না, তার ওপরে এই সব পাড়াগাঁয়েচাকরি ক'রে বেড়ায়—চেহারায়, বেশভূষায়, কথাবার্তায়দাদা হয়ে গিয়েচে যেন কেমন। তেমনি ধরনের লোকেরসমাজে সর্বদা চলে ফেরে।

রাত তখন প্রায় ৯টা, দাদা ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিশ্রী জায়গাতেই থাকে। বাতাসার কারখানাটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘর, ছ-সাতটা বড় বড় উনুনে দিনরাতগনগনে আঙুন, বড় বড় কড়ায় গুড়ের রস আর চিনির রসতৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় অত আঙুনের তাতে থাকা কি দাদার অভ্যেস আছে কোনকালে !

দাদা নিজেই রান্না চড়ালে। আমায় বললে—খিচুড়িখাবি জিতু ? বেশ ভাল মুগের ডাল আছে—ভাঁড়ে দেখি ঘি আছে বোধ হয় একটু—

দাদার বাসা ছোট একখানা চালাঘর। মেঝের ওপরশোয়, বিছানা পাতাই থাকে, কোনকালে তোলা হয় না, তবে খুব ময়লা নয়—আমরা ক'ভাইবোন ময়লা জিনিসপত্রমোটাই ব্যবহার করতে পারিনে, ছেলেবেলা থেকেইঅভ্যেস। বিছানার ওপরকার কুলুঙ্গিতে খবরের কাগজপাতা, একখানা ভাঙা পারা বার-হওয়া আর্শি, আর একখানা শিঙের চিরুনি।

দাদা ছিল আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছেলেমানুষ, সবচেয়ে আনাড়ি, তাকে এখন নিজে রান্না ক'রে খেতে হচ্ছে। অথচ কি-ই বা জানে ও সংসারের, কি কাজই বা পারে ?

রান্না চড়িয়ে দাদা বললে—ভালো কথা, দাঁড়া জিতু, তোর জন্যে একখানা ইংরিজি বই রেখে দিইচি—বের করেদিই—

টিনের ছোটো তোরঙ্গ খুলে একখানা মোটা ইংরিজি বই আমার হাতে দিয়ে বললে—এখানে সাতুবাবু কনট্রাক্টরআসে বাতাসা নিতে, সে ফেলে গিয়েছিল আর ফিরেআসেনি। আমি তুলে রেখে দিইচি, ভাবলাম জিতুপড়বে—

পাতা উল্টে দেখি একটা বিলিতি সিটল কোম্পানিরমূল্যতালিকা—খুব চমৎকার পাতা, চমৎকার ছাপা, বাড়িঘর, রেলের পুল, কড়িবরগার ছবিতে ভর্তি। দাদার ওপরে দুঃখহ'ল, বেচারি এ সব পড়তে পারে না, বুঝতেও পারে না, ভেবেচে কি অপূর্ব বই-ই না জানি।

আমি কিছু না বলে বইখানা আমারপুঁটুলিতে বেঁধেনিলাম। দাদা ততক্ষণে তোরঙ্গ হাতড়ে আর একখানা ছোটোছেলেদের গল্পের বই বার করে বললে—আর এই দ্যাখএকখানা বই, ভারি মজার—মজার গল্প, আমি খেয়েদেয়েরোজ একটুখানি করে পড়ি'খোঁড়া শিকারী'র গল্পটাপড়ছিলাম, পড় দেখি শুনি ?

এসব গল্প ইংরিজিতে কতবার পড়েচি, আমার কাছেএর নতুনত্ব নেই কোথাও। তবুও দাদাকে পড়ে পড়েশোনাতে লাগলাম, দাদা মাঝে মাঝে খিচুড়িতে কাঠি দিয়েদেখে, আর হাঁটু দুটো দুহাতে জড়িয়ে একটুখানি পেছনেহেলান দিয়ে বসে আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে শোনে। আমার এমন কষ্ট হল ! এসব গল্প যে ইংরিজি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও জানে। আহা, দাদা বড়অভাগা, অল্প বয়সে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ে সারাজীবনটা ওর নষ্ট হয়ে গেল।

টাকার কথাটা দাদাকে বলতে মন চাইল না। ওর কতকষ্টে রোজগার করা পয়সা; একটা আধটা নয়, ষোলটা টাকা—এগারো টাকা মাসে মাইনে পায়, ওর দেড় মাসেররোজগার কোথা থেকে দেবে ও ?শৈলদির টাকা আমি এরপরে যে ক'রে হয় শোধ করে দেবো।

দাদা নিজেই বললে—বাড়ি যাবি তো জিতু, গোটা দশেক টাকা নিয়ে যা। আমার বড্ড ইচ্ছে সীতাকে একছড়াহার গড়িয়ে দিই—কিন্তু টাকাই জমে না হাতে। তোর টাকারযদি দরকার থাকে, তবে আলাদা-করা হারের জন্যে কুড়িটাটাকা তোলা আছে, তাই থেকে নিয়ে যা, দেবো এখন হার এর পর দেখব। সাত-পাঁচ ভেবে টাকা নেওয়াই ঠিককরলাম। শৈলদির ওপর বড় জুলুম করা হয়, নইলেশৈলদিকে মনে হয় না যে সে পর। এত আপনার মতো ক'জনআপনার লোকই বা দেখে ?মায়ের পরেই শৈলদিকে ভজিকরি। সে লুকিয়ে টাকা দিয়েচে—তাকে আর বিপন্ন ক'রবো না।

যে দাদা সকাল আটটার কমে বিছানা থেকে উঠত না, তাকে ভোর পাঁচটার সময় উঠে কারখানায় গিয়ে কাজেলাগতে হয়। আমিও দাদার সঙ্গে গেলাম। কারখানার মালিকের নাম মতিলাল দাস, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী আছে সংসারে, আর দ্বিতীয় পক্ষেরছেলেমেয়ে। দাদা মতিলালের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীকে মাসীমাব'লে ডাকে। মতিলাল আমায় দেখে বললে—তুমি নিতাইঠাকুরের ভাই ?বেশ, বেশ। আজকাল কি বই পড়ায়তোমাদের ?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। আমি জবাব দেবার আগেই মতিলাল বললে—আমাদের সময়ে যেসব বইপড়ানো হ'ত, আজকাল কি আর সেসব বই আছে ?এইধর পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ, যদুবাবুর। আহা !

কুজ্যপৃষ্ঠ ন্যুজদেহ উষ্ট্র সারি সারি

কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি

কি সব শব্দ লাগিয়েচে দেখেচ একবার ?ভাষার জ্ঞানহত কত পড়লে ! বলো দিকি ন্যুজদেহ মানে কি ?আমাদের হরিশপণ্ডিতপড়াত কালনার স্কুলে, আমি তখন ছাত্রবৃত্তিপড়ি। তখন ছাত্রবৃত্তি পড়লে মোজার হ'ত, দারোগা হত।এখন হয়েছে তো সব ছেলেখেলা।

আমি এসেছি শুনে মতিলালের স্ত্রী দুপুরে খেতে বললে। আমায় দেখে বললে—এস বাবা, তুমি নিতাইয়ের ভাই ? তুমিও মাসীমা ব'লে ডেকো। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মাসীমা দাদাকে রান্না দেখিয়ে দিতে লাগল, কারণ আমরা খেতে চাইলেও ওরা রুঁধে আমাদের খেতে দেবে কেন ?

মাসীমা সংসারে নিতান্ত একা। মতিলালের ওপক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপের তৃতীয় পক্ষের পরিবারকে দু-চোখপেড়ে দেখতে পারে না, বা এখানে থাকেও না কেউ। অথচ মাসীমার ইচ্ছে তাদের নিয়ে মিলেমিশে সংসার করা। আমরা খেতে বসলে কত দুঃখ করতে লাগল।

—এই দ্যাখো বাবা, কেটকে বলি বৌমাকে নিয়ে এখানে এস, এসে দিব্যি থাকো। বৌমাটি বড় চমৎকার হয়েছে। তা যদি আসে ! সেই নিয়ে রেখেচে শ্বশুরবাড়ি, কালনার কাছে দাঁইহাট—সেখানেই থাকে। আমার নিজের পেটে তো হ'ল না কিছু, ওরাই আমার সব, তা এমুখো হয় না কেউ। বড় মেয়ে দুটি শ্বশুরবাড়ি আছে, আনতে পাঠালেবলে, সৎমায়ের আর অত আতিসূয়ো দেখাতে হবে না। শোন কথা আমায় মা বলে কেউ ডাকেও না। ডাকলে তাদের মান যাবে।

মাসীমাকে খুশি করবার জন্যে আমি কারণে-অকারণে খুব 'মাসীমা'—'মাসীমা বলে ডাকতে লাগলাম। আমাদের পাতে আবার মাসীমা খেতে বসলেন, বললেন ব্রাহ্মণের পেরসাদ পাবো, ওতে কি আর ছোটো বড় আছে বাবা ?

আমার মনে অস্বস্তি হ'ল; আমি তো এঁদের এসবমানিনে, ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করিনে, সে কথা তো ইনিজানেন না। অথচ খুলে বললে মাসীমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে হয়ত।

দাদার কাছ থেকে আটঘরায় এলাম। আসবার সময়সীতার জন্যে ভালো সাবান কিনে নিয়ে এলাম, বই পড়তে ভালোবাসে বলে দু-তিনখানা বাংলা বইও আনলাম। সীতাবড় হয়ে উঠেচে—মাথায় খুব লম্বা হয়েছে, দেখতে সুন্দর হয়েছে আরও।

আমার হাত থেকে সাবান নিয়ে হেসে বললে—দেখিদাদা কেমন সাবান...আমার একখানাও আস্ত সাবান ছিলনা। একখানা সানলাইট সাবান আনিয়েছিলুম বাজার থেকে—সে আধখানা হয়ে গিয়েচে।

সীতার সে পুরোনো অভ্যাস এখনও আছে, কথাবলতে বলতে হঠাৎ খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছেকি-না। লম্বা ঢেঙা, চওড়া নক্সা-পাড় কাপড় পরনে, খোঁপারধরনও আজকাল শহরে দেখে এসেচি ওরকম খোঁপা উঠেগিয়েচে। ওধরনের কাপড় পরলে সেখানে লোকে হাসবে, বেচারী সীতা ! লেখাপড়া শেখবার, বই পড়বার ওর কতআগ্রহ ! অথচ এই পাড়াগাঁয়ে পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি ক'রেইওর জীবন কাটল। না হ'ল লেখাপড়া শেখা, না মিটলকোনো সাধ। অথচ ওর বুদ্ধি ছিল এত চমৎকার, মিশনারীমেমেরা কত প্রশংসা করত, ওকে কি ভালই বাসত মিস্টার্ন। কিন্তু কি হ'ল ওর ? এখনও সেই কতকাল আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়চে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।

সীতা বললে—দাদা পাস করেচ ?

—পাসের খবর এখনও বেরোয়নি। পাস করবোঠিকই।

—পাস হ'লে আমায় জানিও দাদা। আমি তোমাকে একটা জিনিস প্রাইজ দেবো !

—কি জিনিস রে ?

—একটা মনিব্যাগ বুনচি লাল উলের। তোমার জন্যে একটা, বড়দার জন্যে একটা। তোমাদের নাম লিখে দেবো মিস্ নটন আমাদের দিত কত কি প্রাইজ—না ?

—মিস্ নটনকে তোর মনে আছে সীতা ? তুই তোতখন খুব ছোটো।

—খুব মনে আছে, তার দেওয়া জিনিস আমার বাক্সে এখনও রয়েছে। দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে।

জ্যাঠামশায় আমাকে ডেকে বললেন জিতু শোনো। এখন তুমি বড় হয়েচ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করাই ভালো। সীতার বিয়ে না দিলে নয়। ওর পনের-ষোল বছর হ'ল, আর ঘরে রাখা যায় না। কিন্তু এদিকে টাকাকড়ি খরচ করবে কে? হাজার টাকার কমে আজকাল ভদ্রলোকের ঘরের বিয়ের কথাই তোলা যায় না। দেখে এসেচ তো শহর-বাজারে? তা আমি এক জায়গায় ঠিক করেচি; পাত্রটির বাপ আমার এখানে এসেছিল। জমিজমা আছে, চাষা গেরস্ত, খেতে পরতে কষ্ট পাবে না। আখের চাষই আছে অমন বিশ-বাইশ বিঘে। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রংএকটু কালো—তা হোক, পুরুষ মানুষের রঙে কি আসেযায়, তবে বংশ ভালো, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, সবে তিনপুরুষে ভঙ্গ, আমাদেরই স্বঘর।

আমি বললাম—লেখাপড়া কতদূর করেছে?

—লেখাপড়া কি আর এম-এ, বি-এ পাস করেছে? তবে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েচে, দিব্যি হাতের লেখা। হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি, অল্পদিন হ'ল পাত্রটির প্রথমপক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েচে, তবে সে কিছু নয়, বয়েস কমই। একটি বুঝি ছেলে আছে ওপক্ষের।

ছাত্রবৃত্তির কথায় আমার মতিলালের উটের কবিতাটিমনে পড়ল। আমি বললাম—আচ্ছা আমি ভেবে বলবজ্যাঠামশাই। লেখাপড়া জানে না আর তাতে দোজবরে, এতে বিয়ে দেওয়া আমার মন সরে না। সীতার মতো মেয়ে, আপনি বলুন না জ্যাঠামশাই?

জ্যাঠামশাই নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না—তিনি এ অঞ্চলের মনী ব্যক্তি, আগের চেয়ে বিষয়-আশয় টাকাকড়ি এখন তাঁর আরও বেশি, এদিকের সব লোক তাঁকে খাতির করে চলে, কেনই বা তিনি প্রতিবাদ সহ্য করবেন? সে জানি এ গাঁয়ের রাম বাঁড়ুয়ে্যের ব্যাপারে। রাম বাঁড়ুয়ে কি জন্যে রাতে আফিম খেয়ে শুয়েছিল, সকালে উঠে খবর পেয়ে জ্যাঠামশায় গেলেন। রাম বাঁড়ুয়েছিল জ্যাঠামশায়ের খাতক। জ্যাঠামশায় গিয়ে কড়া সুরেবললেন—কি হয়েছে রাম? রাম বাঁড়ুয়ে তখন কথা বলতেপারছে না, জ্যাঠামশায়ের কথার উত্তর সে দিতে পারলনা। জ্যাঠামশায় ভাবলেন, বাঁড়ুয়ে তাঁর প্রতি অসম্মানদেখিয়ে ইচ্ছে করেই কথার উত্তর দিচ্ছে না। বললেন—ভালো ক'রে কথার উত্তর দাও, কার সামনে কথা বলচ জাননা? সপ্তের সব লোক বললে—হ্যাঁ, কর্তা যা বলচেন, জবাবদাও ওঁর কথার। কিন্তু রাম বাঁড়ুয়ে জ্যাঠামশায়েরচোখরাঙানির চোহদ্দি পার হয়ে চলে গেল ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই, কি জন্যে সে আফিম খেয়েছিল কেউ জানে না, তার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় তার ভিটেমাটি বিক্রি ক'রেনিয়ে নিলেন, তার বিধবা স্ত্রী নাবালক একটি মাত্রমেয়েরহাত ধরে ভাইদের দোরে গিয়ে পড়লো। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিই, সে বছরের কথা।

আমার কথার উত্তরে জ্যাঠামশায় আমায় অনেকগুলোকথা শুনিতে দিলেন। আমাদের এদিক নেই, ওদিক আছে। রাজমহারাজাদের ঘরে বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছেথাকলেই তো হয় না, পয়সা চাই। পনের-ষোল বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে আর ঘরেরাখা চলে না। তা ছাড়া তিনি কথা দিয়ে ফেলেচেন—তাঁরকথার মূল্য আছে ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায়দের বাড়ির জীবনযাত্রার ধারা সেইপুরোনো দিনের মতোই চলেচে। এখানে এলেই বুঝি এদের মন নানা দিক থেকে কত ভাবে শৃঙ্খলিত। বাড়িতে এতটাজমি রয়েছে, ঠাকুরপূজার উপযোগী ছোট্ট একখানা গাঁদা ওকরবী ফুলের বাগান ছাড়া আর কোথাও একটা ফুলের গাছনেই। উঠানের কোনো জায়গায় এরা কোথাও একটু সবুজ ঘাসরাখবে না, মেজকাকার কাজ হচ্ছে এতটুকু কোথাও ঘাসগজালে তখন নিজের হাতে নিড়েন ধরে উঠিয়ে ফেলা। প্রকাণ্ড উঠোন চাঁচাছোলা, সাদা মাটি বার করা, সবুজেরলেশ নেই। ব'লে দেখেচি এরা তা বোঝে না। সামনের উঠোনটালাউ-মাচা, পুঁই-মাচায় ভরা প্রত্যেক জায়গাটুকুতেই তরকারি লাগিয়েচে, নয়ত মান-কচুর ঝাড়।

একদিন জ্যাঠামশায়ের ছেলে হরুদাকে বললাম—আমি শ্রীরামপুর থেকে ভালো মরশুমী বীজ এনে দেবো আর এক রকম লতা আছে আমাদের কলেজে, চমৎকার নীলফুল ফোটে। বাড়ির সামনেটা বাগান করো আর চণ্ডীমণ্ডপেরচালে সেই লতা উঠিয়ে দাও—

হারুদা বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি, ফুলগাছে কি দুধদেবে শূনি ?মিছিমিছি জায়গা জোড়া—চণ্ডীমণ্ডপের চালেফি বছর ত্রিশ-চল্লিশখানা চালকুমড়া হয় জানিস্তা ?

অর্থাৎ আহারের আয়োজন হ'লেই হ'ল, আর কিছুদরকার নেই এদের।

মেজকাকার ঘরে একদিন শুয়েছিলাম, কাকীমা এখানেই, মেজকাকার আবার একলা ভয় করে, তাই আমাকে শুতে বলেছিলেন। সারাদিন গরমের পরে অনেক রাত্রে একপশলা বৃষ্টি হল, কি সুন্দর ভিজেমাটির গন্ধ আসতেলাগল—মেজকাকা দেখি উঠে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধকরচেন।

আমি বললাম—বন্ধ করচেন কেন মেজকাকা, বেশভিজে হাওয়া আসচে—

মেজকাকা বললে—উঁহু—উঁহু—ঠান্ডা লাগবে—শেষরাতের বিষ্টির হাওয়া বড় খারাপ, কাল সর্দি ধরবে, আমার ধাতই একে সর্দির !

দুপুরে সীতার সম্বন্ধে মাকে বললাম। মায়ের ইচ্ছে নয়ওখানে সীতার বিয়ে দেওয়া, তবে মা নিরুপায়, এ বাড়িতেতঁার কোনো কথা খাটে না। আমি বললাম—আমি কোথাওচাকরি খুঁজে নিই মা। সীতার বিয়ে নিজে থেকে দেব।

মা বললেন—শোনো কথা ছেলের। তুই লেখা-পড়াছেড়ে এখন করবি কি ?তোদের মুখের দিকে চেয়ে এখানেকষ্ট করে পড়ে থাকি। নিতুর তো কিছু হ'ল না, তুই বিএ'টাপাস কর। সীতার কপালে যা থাকে হবে। তুই এখনচাকরিতে কত টাকা পাবি যে সীতার বিয়ে দিবি নিজে ?মাঝে পড়ে তোর পড়াটা হবে না। আর শোন, এ নিয়ে কোনো কথা যেন বলিস নে কারুর সঙ্গে। তোর জ্যাঠাইমা শুনতেপেলে রক্ষে রাখবে না।

মা এত ভয় করেও চলেন ওদের ! প্রথম জীবনে কোনোকষ্ট পাননি, তারপর চা-বাগান থেকে এসে দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়ে এমন ভিত্তি হয়ে উঠেচেন। সদাই ওঁর ভয় থাকে জ্যাঠাইমা ওঁদের দুজনকে এ বাড়িতে জায়গা দিতে নাচাইলে, আমার লেখাপড়া নাহয়, সীতার বিয়ে নিয়ে দাদাজড়িয়ে পড়ে—এই সব।

সীতাকে জলে ফেলে দিতে পারব না, মা যাই বলুন।

জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকলে আমার হাঁপ লাগে। গাঁয়ের বাইরে নির্জন মাঠে গিয়ে বসে ভাবিসীতার সম্বন্ধে কি করা যায়। কিন্তু হঠাৎ কেমন ক'রে অন্য চিন্তা এসে পড়ে। এই রৌদ্রালোকিত দুপুরে একা বসলেইতঁার কথা আমার মনে পড়ে। মন থেকে দূর করতে পারিনে। প্যালেস্টাইনের উষর, পর্বতময় মরুদেশেররৌদ্র, সারা গায়ে ঘাম ঝরচে তঁার, রোদে মুখ রাঙা, নিজের ভারী দ্রুশটা নিজেই বয়ে চলেছেন বধ্যভূমিতে।পিছনের অন্ধ জনতা জানে না যে ঝড়ে গ্যালিলির সমুদ্রেরনোনা জলে দুকূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে যে তরঙ্গ ওঠায়, তাও তুচ্ছ হয়ে যাবে সে বৃহত্তর তুফানের কাছে, আজকারদিনটি জগতে যে তুফান তুলবে। তারা জানে না যে মানুষের মনে ব্যথা না দেওয়ার চেয়ে বড় আচার নেই, প্রেমের চেয়েবড় ধর্ম নেই। তঁার আবির্ভাব কে ব্যর্থ করবে ?—ঐ বজ্র-বিদ্যুতের মতো শক্তিময় তঁার বাণী। বিষ্ণুর সুদর্শন যেশক্তির প্রতীক। নিত্যকালের দেবতা তঁারা, দেশের অতীত, কালের অতীত, সকল দেশের, সকল অবতারের স্বগোত্র।

তারপর আমি যেন কোথায় চলে গিয়েছি। সেখানে নদী, মাঠ, বন সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ঝড়লঠনেরকাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে দেখছি। রাত কি দিন বুঝতেপারলাম না, মাথার ওপরকার আকাশে তারা নেই। অথচসূর্যও দেখলাম না আকাশে। আমি যেন সেখানে বেশ সহজঅবস্থাতেই আছি। একটু পরেই মনে হ'ল সে জায়গাটাতেআমি অনেক বার গিয়েছি, নতুন নয়, ছেলেবেলা থেকেকতবার গিয়েছি। একটা বাড়ি আছে সেখানে, বাড়িতে যারা আছে তারা আমার সঙ্গে গল্প করে, কত কথা বলে, স্বপ্নেরমধ্যে দিয়ে যেন মনে হয় তারা আমার খুব পরিচিত।কতবার তাদের দেখেছি। সেখানে গেলেই আমার মনে পড়েযায় সেখানকার পথ-ঘাট, ওইখানে মাঠের মধ্যে একটাপরোনো বাড়ি আছে, ওর ওপাশে সেই বনটা। সেখানেযেমনি যাই, মজা এই যে অমনি মনে হয় এ তো নতুন নয়, সেই যে একবার ছেলেবেলায় চা-বাগানে থাকতে এসেছিলাম ! কিন্তু সে দেশটা যেন অন্য রকম, যখন সেখানেথাকি তখন স্বাভাবিক মনে হ'লেও, পরে মনে হয় সেটা এইপৃথিবীর মতো নয়।

সেখানে আমি কতক্ষণ ছিলাম জানি না, উঠে দেখিগাছে ঠেস দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুমঘুমিয়েচি, উঠে চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রায় সন্ধ্যায় এসেচে। কেবল এইটুকু আমার মনে ছিল স্বপ্নের দেশেকাকে যেন জিজ্ঞেস করেছিলুমবটগাছের নিচে একটাসুন্দর ঠাকুর আছেন, শুনেচি বিষ্ণুমূর্তি, আমার বড় ভালোলাগে—জ্যাঠাইমারা পূজো করে না কেন ?ঘুম কি সত্যি,কিছুই বুঝতে পারলুম না। মনের সে আনন্দটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

জ্যাঠামশাইরা কি একটা মোকদ্দমার সাক্ষীসাবুদ দু-তিন দিন ধরে চণ্ডীমণ্ডপে তালিম দিয়ে শেখালেন। যেকেউ শুনলে বুঝতে পারতো যে এরা সেসব জায়গায়যায়নি, কস্মিনকালেওসেসব ঘটনা দেখেওনিএঁদেরখামার-সংক্রান্ত কি একটা দখলের মামলা।

একদিন শুনলাম মামলায় এঁরা জিতেচেন—আবারসেই ব্যাপার দেখলুম বাড়িতে। গৃহদেবতার প্রতি ভক্তিতেআপ্লুত হয়ে উঠলেন সবাই, মহাসমারোহে পূজা হ'লস্বপ্নের যারা সাক্ষী ছিল, তাদের পরম যত্নে তোয়াজ ক'রেখাওয়ালেন। খাওয়ান তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু দেবতাকেএর মধ্যে জড়ান কেন ?

এঁরা ভাবেন কি যে দেবতা তাঁদেরই বাঁধা, হাতধরা—ওঁদের মিথ্যাকে অবিচারকেও সমর্থন করবেন তিনি ভোগ নৈবিদ্যের লোভে ?

জ্যাঠাইমা যখন ব্যস্ত হয়ে গরদের শাড়ি প'রে পূজারআয়োজনে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন আমার ভারি রাগ হ'ল—আজকাল এসব মূঢ়তা আমার আদৌ সহ্য হয় না, ছেলেবেলার মতো ভয়ও করি না আর জ্যাঠাইমাকে—ভাবলুম এ নিয়ে খুব তর্ক করি, দু-কথা শুনিযে দেবো, তাতেওঁদের উপকারই হবে—দেবতাকে নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধহবে, কিন্তু সীতা ও মায়ের কথা ভেবে চুপ করে রইলুম।

মাস দুই হ'ল চাকুরি পেয়েছি কলকাতায়। এ চাকুরি পাওয়ারজন্যেও আমি শৈলদির কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলদির স্বামীর এক বন্ধুর যোগাযোগে এটা ঘটেছে। যাদের বাড়ি চাকুরি করি, এরা বেশ বড় লোক।

বাড়ির কর্তা নীলাম্বর রায় হাওড়া জেলার কি একটাগ্রামের জমিদার এবং সেখানকার তাঁদেরই পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক মঠের বর্তমান মালিক—এঁদের মঠের অধীনেএকটা ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে গত ষাট-সত্তর বছরে এবং এঁরাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিন জেলাতে এই সম্প্রদায়ের লোক যত বেশি, অন্যজেলাতে তত নয়। ওঁদের কাগজপত্র ও দেশের নায়েবেরসঙ্গে ওঁদের যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে, তা থেকেই আমি এসব সংবাদ জানতে পারলাম অল্পদিনের মধ্যেই। এঁদের প্রধান আয় বৈশাখ মাসে মঠবাড়ির মহোৎসবথেকে, নানা অঞ্চল থেকে শিষ্যসেবকের দল জড়ো হয়েছেই সময় বার্ষিক প্রণামী, পূজা, মানত শোধ দেয়, তা ছাড়াবিবাহ ও অন্নপ্রাশনের সময়ও মঠের গদিতে প্রত্যেক শিষ্যেরকিছু প্রণামী পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম।

নীলাম্বরবাবুর তিন ছেলেই ঘোর শৌখিন ও উগ্র ধরনের শহুরে বাবু। বড় ছেলে অজয়বাবু এঞ্জিনিয়ারিংপড়েছিলেন কিন্তু পাস করেননি, মেজ ছেলে নবীনবাবুএমএ পাস, ছোটো ছেলে অমরনাথ এখনও ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ে। অজয়বাবুর বয়স পঞ্চাশের কমনয়, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে কুড়ি বছরের ছোকরাও হারমানে তাঁর শৌখিনতার কাছে, নবীনবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ—পেছনের ঘাড় একদম ক্ষুর দিয়ে সাদাবার-করা, চোখে চশমা—প্রায়ই পরনে সাহেবী পোশাক থাকে। বাঙালি পোষাক পরলে পরেন হাত-গিলেকরা মিহি আঙ্গুরি পাঞ্জাবি ও কোঁচানোকাঁচি ধুতি, পায়ে কালো এ্যালবার্ট জুতো।

কর্তা নীলাম্বর রায়কে আমি বেশি দিন দেখিনি। তিনিতাঁর তাকিয়া বালিশ, গড়গড়া, পিকদানী নিয়ে দোতলাতেথাকেন। কালেভদ্রে তাঁর কাছে আমার যাওয়া দরকার হয়। বড় ছেলে অজয়বাবুই কাজকর্ম দেখাশুনো করেন, তাঁরসঙ্গেই আমার পরিচয় বেশি। অজয়বাবু লোক মন্দ নয়, কিন্তু নবীনবাবু ও অমরনাথের মুখে প্রথম দিনেই একটা উগ্রদাস্তিকতার ছাপ লক্ষ্য করলুম। আমি এ ধরনের লোকের সংস্পর্শে জীবনে এ পর্যন্ত আসিনি, কি জানি আমার কোষ্যবহারে এরা কি দোষ ধ'রে ফেলেসেই চিন্তা আমায়সর্বদা সন্ত্রস্ত করে তুললে।

ওদের বাড়ি হরি ঘোষের স্ট্রিটে; বাড়িটার পূর্ব দিকে একটা ছোটো গলি, কিন্তু সেই দিকেই বাড়ির সদর। হরি ঘোষের স্ট্রিটের দিকটা রেলিং-বসানো লম্বা বারান্দাবারান্দায় উঠবার সিঁড়ি নেই সেদিকে। রাস্তার ওপরের ছোটো ঘরটাতে আমার থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট হ'ল। এই ঘরেআমি যে একলা থাকি তা নয়, পাশাপাশি নিচু চার-পাঁচটাতক্তপোশের ওপর ঢালা ফরাস পাতা, তার ওপর রাত্রে যেকত লোক শোয় তার হিসেব রাখা শক্ত; এদের এদেশেরকাছরীর নায়েব কুঞ্জ বসু প্রায়ই আসে কলকাতায়, সে আমার পাশেই বিছানা পাতে, তার সঙ্গে একজন মছরী আসে, সে নায়েবের পাশে শোয়। বাড়ির দুজন চাকর শোয়ওদিকটাতে। ওস্তাদজী বলে একজন গানের মাস্টার বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান ও হারমোনিয়াম বাজাতে শেখায়—সে আর তার একজন ভাইপো শোয় চাকরদের ও আমাদেরমধ্যে। এতগুলো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে শোয়া কখনো অভ্যেস নেই—প্রথম দিনেই এদের গল্পগুজব, হাসি-কাশি, তামাকের ধোঁয়া আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। সীতার মুখমনে ক'রে সব অসুবিধাকে সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হই।

একদিন আমি সেরেস্তা-ঘরে বসে কাজ করছি—হঠাৎ দেখি মেজবাবু ঘরে ঢুকেচেন। আমি মেজবাবুকে দেখেতাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মেজবাবু চারদিকের দেওয়ালেরদিকে চোখ তুলে বললেন—এ ঘরের এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তুমি নজর রাখো না ?

মেজবাবুর সামনাসামনি হওয়া এই আমার প্রথম। আমাকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করতে আমি মনে আঘাত পেলাম এবং আমার ভয়ও হ’ল। তা ছাড়া ছবি নষ্ট হওয়ার কৈফিয়ত আমি কি দেবো বুঝতে না পেরে চুপ করে আছি, এমন সময় মেজবাবু বাজখাঁই আওয়াজে ডাকলেন—দৈতরী—

দৈতরী সেরেস্তার কালির বোতল গুনে গুনে আলমারিতে তুলছিল পাশের ঘরে, সে ঘরের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—হুজুর—

—এই উল্লুক, তুমি দেখতে পাও না ঘরের ছবিগুলোনষ্ট হয়ে যাচ্ছে ?

দৈতরী ঘরের দেওয়ালের দিকে বিপন্ন মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেজবাবু হঠাৎ আমার ডেস্ক থেকে রুলটা তুলে নিয়েতাকে হাতে পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বললেন—স্টুপিডপাজি, বসে বসে শুধু মাইনে খাবে ? এক ডজন চাকরবাড়িতে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে শুধু ফাঁকি দেবার জন্য ? পাড়ো ছবিগুলো এক-একখানা ক’রে—পাড়ো আমার সামনে—

দৈতরীর সে রুলের ঘা যেন আমার পিঠেই পড়ল। আমি ভয়ে ভয়ে দৈতরীকে ছবি পাড়তে সাহায্য করতে লাগলুম। আমি সামান্য মাইনের চাকুরি করি, মেজবাবু আমাকেও ঠেস দিয়ে কথাটা বললেন। তারপর আধঘণ্টা তিনি ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি ও দৈতরী তার সামনে সমস্ত ছবিগুলো একে একে পেড়ে পরিষ্কার করলাম। সাহস করে যেন মাথা তুলে চাইতে পারলাম না, যেন আমি নিজেই ছবির তদারক না করে প্রকাণ্ড অপরাধ ক’রে ফেলেছি।

সেইদিন প্রথম বুঝলাম আমার মতো সামান্য মাইনের লোকের কি খাতির—আর কি মান এদের কাছে। সীতার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে পারি তবে আবার পড়বো। ছোটোবৌঠাকরনের কথা এই সময় মনে হ’ল—শৈলদির কথাও মনে পড়ল। কত ধরনের মানুষই আছে সংসারে ! অমরনাথবাবুর বৈঠকখানা আমাদের ঘরের সামনে। খুব শৌখিন জিনিসপত্র সাজানো এবং প্রত্যেক দিনই কোনো-না কোনো শৌখিন জিনিস কেনা লেগেই আছে। সে ঘরে রোজ সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবেরা এসে গানের আড্ডা বসায়, কেউ ডুগি-তবলা, কেউ হারমোনিয়াম বাজায়, গান-বাজনায় অমরবাবুর খুব ঝোঁক। সেদিন আড়াইশো টাকার একটা গানের যন্ত্র রাখবার কাঁচের আলমারি কেনা হ’ল। তিনি কলেজের ছাত্র বটে, কিন্তু আমি পড়াশুনা করতে একদিনও দেখিনি তাঁকে। একদিন বেলা দশটার সময় অমরনাথবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ওহে, পাঁচটা টাকা দাও তো, আছে তোমার কাছে ?

আমি প্রথমটা অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে টাকাচাইতে এসেচেন ছোটবাবু ! ব্যস্তভাবে আমার বাক্সটা খুলেটাকা বার ক’রে সসম্বন্ধে তাঁর হাতে দিলাম। দিনকতক কেটে গেল, আর একদিন তিনটে টাকা চাইলেন। মাইনের টাকাসব এখনও পাইনি, দশটা টাকা মোটে পেয়েছিলাম তা থেকে দিয়ে দিলুম আট টাকা। দু-তিন মাসে ছোটবাবু আমার কাছে পঁচিশ টাকা নিলেন, বাড়ির ও আমার হাতখরচ বাদে যাকিছু বাড়তি ছিল, সবই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

একদিন দাদা চিঠি লিখলে—তার বিশেষ দরকার। পনেরটা টাকা যেন আমি পাঠিয়ে দিই। আমার হাতে তখন মোটেই টাকা নেই। ভাবলুম, ছোটবাবুর টাকাটা তো দেওয়ার কথা এতদিনে, দিচ্ছেন না কেন ! বড়মানুষের ছেলে, সামান্য টাকা খুচরো কিছু কিছু ক’রে নেওয়া, সে ওঁর মনেই নেই বোধ হয়। লজ্জায় চাইতেও পারলাম না। অগত্যা বারোটা টাকা আগাম পাওয়ার জন্যে একটা দরখাস্ত করলুম। সে-দিন আপিসে আবার বসেচেন মেজবাবু। দরখাস্ত পেড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হবে তোমার আগাম টাকা ?

মেজবাবুকে আমার বড় ভয় হয়। বললুম—দাদা চেয়ে পাঠিয়েচেন, হাতে আমার কিছু নেই তাই।

মেজবাবু বললেন—তুমি কতদিন সেরেস্তায় কাজ করচ ? চার মাস মোটে ? না, এত কমদিনের লোককে এ্যাডভান্স দেওয়া স্টেটের নিয়ম নেই—তা ছাড়া তুমি তো এখনও পাকা বহাল হওনি—এখনও প্রবেশনে আছ।

কই, চাকুরিতে ঢোকবার সময় সে-কথা তো কেউবলেনি যে আমি প্রবেশনে বহাল হচ্ছি বা কিছু। যাই হোক, দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে এলাম; দাদাকে টাকা পাঠানোহ'লই না, এদিকে ছোটবাবুও টাকা দিলেন না, ভুলেইগিয়েচেন দেখছি সে-কথা। প্রথমে আসবার সময় ভেবেছিলাম এঁরা কোন দেবস্থানের সেবায়ত, সাধু-মোহান্ত মানুষ হবেন—ধর্মের একটা দিক এঁদের কাছেজানা যাবে—কিন্তু এঁরা ঘোর বিলাসী ও বিষয়ী, এখনতা বুঝি। মেজবাবু এই চার মাসের মধ্যে এটর্নির বাড়িপাঠিয়েচেন আমায় যে কতদিন, কোথায় জমি নিয়েইম্ফ্রভমেন্ট ট্রাস্টের সঙ্গে প্রকাণ্ড মোকদ্দমা চলচে—এ বাদে কুঞ্জ নায়েব তো প্রায়ই দেশ থেকে আপীলের কেস আনচেন। মেজবাবু মামলা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভালবোবোন, কুঞ্জ নায়েব সেদিন বলছিল।

অপরে কি করে ধর্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কিবিশ্বাস করে, এসব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

একদিন হাওড়া পুলের ওপারে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতেগেলুম। এক জায়গায় একটা ছোট মন্দির, জায়গাটা পাড়াগাঁ-মত, অনেক মেয়েরা জড়োহয়েচে, কি পূজো হচ্ছে। আমি মন্দির দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম—দেবতারস্থানে পূজা-অর্চনা হতে দেখলে আমার বড় কৌতূহল হয়দেখবার ও জানবার জন্যে। একটা বড় বটগাছের তলায়ছোট্ট মন্দিরটা, বটের ঝুরি ও শেকড়ের দৃঢ় বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠেবাঁধা—মন্দিরের মধ্যে সিঁদুর-মাখানো গোল গোল পাথর, ছোট একটা পেতলের মূর্তিও আছে। শুনলাম ষষ্ঠীদেবীরমূর্তি। বাড়ি থেকে মেয়েরা নৈবিদ্য সাজিয়ে এনেচে, পুরুতঠাকুর পূজো ক'রে সকলকে ফুলবেলপাতা নির্মাল্যাদিলেন—ছেলেমেয়েদের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। সবাই সাধ্যানুসারে কিছু কিছু দক্ষিণা দিলে পুরুত ঠাকুরকে, তারপর নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নৈবিদ্যরখালি থালা হাতে সবাই বাড়ি চলে গেল। কাছেই একটা পুকুর, পুরুত ঠাকুর আমার হাতেও দুখানা বাতাসা ওফুলবেলপাতা দিয়েছিলেন—বাতাসা দুখানা খেয়ে পুকুরেজল খেলাম—ফুলবেলপাতা পকেটে রেখে দিলাম। ছোট্টগ্রামখানা—দূরে রেলের লাইন, ভাঙা পুকুরের ঘাটটা নির্জন, চারিধারেই বড় বড় গাছে ঘেরা শান্ত, স্তব্ধ অপরাহ্ন—অনেকদিন পরে এই পূজোর ব্যাপারটা, বিশেষ ক'রে মেয়েদেরমুখে একটা ভক্তির ভাব, পূজোর মধ্যে একটা অনাড়ম্বরসারল্য আমার ভাল লাগল।

হাওড়া-পুল পার হয়েছি, এক জায়গায় একজনভিখারিণী আধ-অন্ধকারের মধ্যে চেষ্টা করে কার সঙ্গে ঝগড়া করচে আর কাঁদচে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভিখারিণী অন্ধ, বেশ ফর্সা রং, হিন্দুস্থানী-বৃদ্ধা না হ'লেও প্রৌঢ়া বটে। তার সামনে একখানাময়লা ন্যাকড়া পাতা—সেটাতে একটাপয়সাও নেই—গোটা-দুই টিনের কালো তোবড়া মগ, একটাময়লা পুঁটুলি, একটা ভাঁড়—এই নিয়ে তার কারবার। সেএকটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করচে—হিন্দীতে বলচে—তুই অমন ক'রে মারবি কেন ?তোকে আমি ভিক্ষে ক'রে খাইয়ে এত বড়টা করলাম আরতুই আমাকেই মার দিতে শুরু করলি—আমার কপালপোড়া, নইলে নিজের পেটের সন্তান এমন বদ হবে কেন ?দ্যাখ দেখি কি দিয়ে মারলি, কপালটা কেটে গেছে—

মেয়েটা হি-হি ক'রে হাসচে এবং কৌতূকের সঙ্গে রাস্তাথেকে ধুলোবালি খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়মাকে মারছে।

আমি মেয়েটাকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললাম—ফের মাকে যদি অমন করবি, তবে পুলিশে ধরিয়ে দেবো। পকেটেহাত দিয়ে দেখি, আনা সাতেক পয়সা আছে—সেগুলো সব তার ময়লা নেকড়াখানায় রেখে দিয়ে বললুম—তুমি কেঁদো নাবাছা—আমি কাল এসে তোমায় আরও পয়সা দেবো। তোমার মেয়ে আর মারবে না। যদি মারে তো বলে দিও, কাল আমি দেখে নেবো—

এমন ছন্নছাড়া করুণ দুরবস্থার রূপ জীবনে কোনদিনদেখিনি। পরদিন হাওড়া-পুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন বা আর কোনদিন সেই অন্ধ ভিখারিণীর দেখা পাইনি। তাকে কত খুঁজেছি, ভগবান জানেন। প্রতিদিন শোবার আগে তারকথা আমার মনে হয়।

মনে মনে বলি, আটঘরার বটতলায় তোমায় প্রথমদেখেছিলুম ঠাকুর, তোমার মুখে অত করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন ? তা হবে না, তার ভাল করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

এর মধ্যে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলুম।

সেদিন বেজায় ভিড়—কি একটা তিথি উপলক্ষে মেলাযাত্রী এসেচে। মেয়েরা পিষে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে অথচকেউ ওদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার নেই। আমারসামনেই একটা তরুণী বধু হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল—আমি একজন প্রৌঢ়া বিধবাকে বললাম—গেল, গেল, ও মেয়েটিরহাত ধরে তুলুন—। কাদামাখা কাপড়ে বধুটি দিশাহারা ভাবেউঠে দাঁড়াল, আমি তার সঙ্গের লোকদের খোঁজ নিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে অতিকষ্টে খুঁজে বার করলাম—ভিড়েরদ্বারা চালিত হয়ে তারা অনেকদূর গিয়ে পড়েছিল। এতকরেও অনেকেরই দেবদর্শন ঘটল না, পাণ্ডারা সকলকেমন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছে না শুনলুম, কেন তা জানিনে। মেয়েদের দুঃখ দেখে আমার নিজের ঠাকুর দেখার ইচ্ছেআর রইলনা।

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। বৈকালের দিকটা মেজবাবুমোটরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বেলা পাঁচটার সময় ফিরেএসে আমায় হিসেবের খাতা দেখাতে ডেকে পাঠালেন।রোজ তিনিদুপুরের পরে আপিসে বসে খাতা সই করেন, আজ তিনি ছিলেন না। মেজবাবুকে খাতা দেখানো বড়মুশকিলের ব্যাপার, আবার মেজবাবুকে আমার একটু ভয় হয়, তার ওপরে তিনি প্রত্যেক খরচের খুঁটিনাটি কৈফিয়ৎচাইবেন। খাতা দেখতে দেখতে মুখ না তুলেইবললেন—তামাকওয়ালার ভাউচার কোথায় ?

আমি বললাম—তামাকওয়ালার ভাউচার দেয়নি। খুচরাদোকান—ওরা ভাউচার রাখে না—

মেজবাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন—কেন, নবীন মুছরী তোভাউচার আনতো ?

তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল তিনি আমায় অবিশ্বাসকরচেন। আমি জানি নবীন মুছরী যেখানে ভাউচার মেলে না—মনিবকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সেখানে ভাউচার নিজেইবানাতো। আমি সে মিথ্যার আশ্রয় নিই না।বললাম—আপনি জেনে দেখবেন ওরা ভাউচার কখনো দেয়না।আমি এসে পর্যন্ত তোদেখচি—

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, তার সামনেই বড়জানালা—তার ঠিক ওপরে—মেজবাবুর অফিসেরসামনাসামনি একটা শানবাঁধানো চাতাল। অন্দরমহলেরএকটা দোর দিয়ে চাতালটায় আসা যায় বলে জানালায়প্রায়ই পরদা টাঙানো থাকে। আজ সেটা গোটানো ছিল।

আমি একবার মুখ তুলতেই জানালা দিয়ে নজর পড়ল অন্দরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের ছোট্ট একটা খোকা, নিতান্ত ছোট, বছর দুই বয়স হবে। বোধ হ'ল যেন দরজাখোলা না পেয়ে চুপ ক'রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।আমি ভাবচি, বেশ খোকাটি তো, কাদের খোকা ?এ বাড়িতে যতদূর জানি অত ছোট ছেলে কারুর তো নেই ?এ ওখানেএল কার সঙ্গে ?

মেজবাবু বললেন—এদিকে মন দাও, ওদিকে কি দেখচ ?

আমি বললাম—কাদের খোকা দাঁড়িয়ে রয়েছেওখানে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওই যে দাঁড়িয়েরয়েচে চাতালের দরজায়, বাড়িতে ঢুকতে পাচ্ছে না বোধহয়।

মেজবাবু সেদিকে চেয়ে বললেন—কই ?কোথায় কে ?

ঠিক সেই সময় অন্দরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী (তাঁকে অনেকবার মোটরে উঠতে-নামতে দেখেছি) বারহয়ে এলেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। আমিচোখ নামিয়ে নিলাম। মেজবাবু বললেন—কোথায় তোমারখোকা না কি ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—বা রে, ওই তো উনি খোকাকে কোলে নিলেন।

চোখ তুলে চাতালের দিকে চেয়ে মেজবাবুর স্ত্রীকে আরদেখতে পেলাম না, অন্দরের দরজাও বন্ধ, নিয়ে বোধ হয়বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছেন। মেজবাবু বললেন—কে নিয়েগেলেন ?উনি মানে কি ?কি বক্চ পাগলের মত !...

মেজবাবু আমার দিকে কেমন এক ধরনের চেয়েরয়েচেন দেখলাম। আমি তাঁর সে দৃষ্টির সামনে খতমতখেয়ে গেলাম—আমার মনে হ'ল মেজবাবু সন্দেহ করচেন আমার মাথা খারাপ আছে নাকি ?সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলাম একথা ভেবে যে এই ওঁর স্ত্রী দরজা খুলে এলেন, খোকাকেকোলে তুলে নিলেন, এই তো দিনমানে আর এই ত্রিশ হাতের মধ্যে চাতাল, এ উনি দেখতে পেলেন না কেন ?পরক্ষণেই চট ক'রে আমার সন্দেহ হ'ল আমার সেইপুরানো রোগের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে নাকি?এতসাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে যে অন্য কিছু আছে বা হতে পারে, এ এতক্ষণ আমার মনেই ওঠেনি। তা হলে কোনো কথা কি বলতাম ?এক্ষুনি চাকুরি থেকে ছাড়িয়েদিতে পারে। বলতেই পারে, এর মাথা খারাপ, একে দিয়েচলবে না।

কিন্তু আমার বড় কৌতূহল হ'ল। সন্ধ্যার সময় মোহিনী ঝি আমার বারান্দার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞেসকরলুম—শোন, আচ্ছা বাড়িতে দেড় বছর দু'বছরের খোকাকার আছে বল তো ?ঝি বললে—এত ছোট খোকা তোকারুর নেই।

সেইদিন রাত বারোটায় খুব হৈ-চৈ। মেজবাবুর স্ত্রীরঅবস্থা সঙ্কটাপন্ন, লোক ছুটলো ডাক্তার আনতে। মেজবাবুরস্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বা সন্ধ্যার পর থেকে পাস-করা ধাত্রী এসে বসে আছে, এ-সব কথা তখন আমি শুনলাম। কারণ সবাই বলাবলি করচে। শেষরাত্রে শুনলাম তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।

মনে মনে বিস্মিত হ'লেও কারও কাছে এ নিয়ে আরকোন কথা বললাম না। নিজেই দেখি, অথচ নিজেই বুঝিনেএ-সবের মানে কি। চুপচাপ থাকাই আমার পক্ষে ভাল।

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগআবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরিঅনেক বার হয়—তারপর দিনকতকের জন্যে আবারএকেবারেই বন্ধ থাকে। এই বার বেশি ক'রে শুরু হ'লেআমার চাকুরি ঘুচে যাবে—সীতার কোন কিনারাই করতেপারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীনমুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল—ঘুরেঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতেহয়—আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতেহয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটির কাজ। এই দোকানের হিসেবনবীন মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝগড়াট—রোজ সেআমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাতায়, আমার কথা বিশ্বাসকরে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কিদরে জিনিসটি এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ্যকরে থাকি।

কার্তিক মাসে ওদের দেশের সেই মহোৎসবহবে—আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেকআগে থেকেই শুনে আসচি—অত্যন্ত কৌতূহল ছিলদেখবো ওদের সাম্প্রদায়িক ধর্মানুষ্ঠান কি রকম।

গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই গ্রামেরজমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর কখনও দেশেআসেন না। কুঞ্জ নায়েব বাকি দশ মাস এখানকার মালিক।

একটা খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকারদোকান-পসারই বেশি। অনেকগুলো খাবারের দোকান, মাটির খেলনার দোকান, মাদুরের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাঁধানো, সেটাই নাকিপীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পূজো দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়াবাঁধা। লোকে মানত করার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধেরেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় সে খুলে দিয়ে পূজোদেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদাআলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুকে মোহন্তের গদিতে বসেন—কভানীলাস্বর রায় আসেননি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীরওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সামনেবকবকে প্রকাণ্ড রূপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে—একটাতে মোহন্তের নজর, আর একটাতে মানত ও পূজোর প্রণামী।

নবীন মুহুরী, বেচারাম ও আমার কাজ হচ্ছে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট আছে, যেমন—পাঁচ সিকার মানত থাকলে গদীর নজর একটাকা, তিন টাকার মানতে দু-টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটামুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহন্তরা টাকাকড়িরসম্বন্ধে কথা বলবেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম চরিধার। সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্মমতটা ভাল করে বুঝবার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞেসকরি, আলাপ করে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাকবার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে এখানে-ওখানে এই কার্তিক মাসের হিমে চট, শতরঞ্জি, হোগলা, মাদুর যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক'রে তারই তলায় আছে—কেউ বা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সজনে গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল—সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন্ গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসার চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতি বছর একা আসে।

আমায় বললে—বড্ড জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলারগোসাঁই। মোর মাল্‌সি গাছে ক্যাঁটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বন্মু বাবার থানেক্যাঁটাল দিয়ে আসবো, হে ঠাকুর ক্যাঁটাল যেন হয়। বললেনা পেত্যয় যাবে, ছোটয়-বড়য় এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোসাঁইয়ের কিৰ্পায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌব'সে রাঁধচে। আর তাঁর স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোলবাজিয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বসতে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত, বাড়ি খুলনা জেলায়, পুরুষটির বয়স বছরচল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সেআছে, তারই মাথায় চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড়ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললে—পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকেকাল কেনলাম একখানা। বইখানার নাম বটতলার কীর্তন। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোসাঁই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসেআস্তুনা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধিকরলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে ততদূর পর্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোসাঁই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্ব জীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশঅবতার।

কলিতে নতুন রূপ শুন মন দিয়া

বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তদল নিয়া

খেদে কহে কলিরাজ, এ বড় বিষম কাজ

মোর দশা কি হবে গোসাঁই ?

ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্লেশে

থান ত্যজি কোথাও না যাই।

শ্রীদাম সুবল সনে হেথায় আসিব

বটমূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।

নিমচাঁদ শুনতে শুনতে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বললে—আহা !আহা ! বাবার কত লীলাখেলা !

তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুনতে। মানেবুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনারআনন্দ এদের কাছে বড় নতুন, তা আবার যাঁর ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোসাঁই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায়দা-ঠাকুর ?

—কেন বল তো ?

—এই যে বলচে কলির অধিকার নেই ওর মধ্য, তা কতদূর তাই শুধুচি।

—কত দূর আর, ধর আধ ক্রেশ বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবোদা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক’রে ফেলেচি, কুড়ো-দুইজমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবারথান তো বিন্দাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগ্গো ছেড়ে বিলির মোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর ?কি বলিস্ রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তোছেলেমানুষ।

নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংযত ও মিষ্টি ক’রে, অপরিচিত পুরুষমানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মেয়েরাযেমন সুরে কথা বলে তেমনি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিকই তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছেকরে ?

নিমচাঁদ বললে—দু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বলি বিক্রী ক’রে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন ক’রে আসি আরঅমনি গঙ্গাছেনটাও সারবো। টাকা বাবা যোগাবেন, সেজন্যভাবিনে। ওরে শোন, কাল তুই তো ধন্না দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দিস—

জিজ্ঞেস ক’রে জানলাম ছেলের অসুখের জন্যে ধর্গাদেবার ইচ্ছে আছে ওদের।

নিমচাঁদের বৌ বললে—বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকারমামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট যাচ্ছে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে ?তো বলি, না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের জন্যি। মোহন্তবাবার গদিতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকেলে নিমচাঁদ ও তাঁর বৌ পুজো দিতে এলগদীতে। নবীন মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ওপুজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমচাঁদেরবৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সামনেররুপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহন্তদের দিকেচাইলে এবং এদের ঐশ্বর্যের ঘটতেই সম্ভবত অবাক হয়েগেল—বুদ্ধিহীন চোখে শব্দা ও সন্ত্রমের সঙ্গে টাকা-পয়সাতেপরিপূর্ণ বকবাকে রুপোর থালাটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকেচাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোসাঁইয়ের থানে এসেচে, সব দেখেশুনে লোকের ভিড়ে, মোহন্ত মহারাজেরআড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর ঝঝঝমানি আওয়াজেসে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়েইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক ঢুকচে, তাকে ক্রমশঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্ছে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে একজন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। ওরমুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিস্তব্ধ দৃষ্টি আমায়ও মুগ্ধ করেছে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈচৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুরচশমামণ্ডিত দাস্তিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তিআসে !—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকেধমক দিলুম।তার পর ওর চমক ভাঙতে ফিরে বাইরেবেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়স অনেক হয়েছে, বয়সে গলার সুর কেঁপে গিয়েছে, হাত কাঁপচে, সেতার আঁচল থেকে একটি আধুলি খুলে থালায় দিতে গেল। নবীন মুছরী বললে—রও গো, রাখ—আধুলি কিসের ?

বুড়ী বললে—এই-ইঠা-কু-রে-রমা-ন-তশো-ধে-র পে-র-না-মী—

নবীন মুছরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পুজোনেই—পাঁচ সিকিতে এক টাকা গদির নজর—

বুড়ী শুনতে পায় না, বললে—কত ?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চেষ্টা করে বললে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে—ই, মা-দু-র কি-নে-লা-মছ-আ-না-র, আ—র—

নবীন মুছরী আধুলি ফেরত দিয়ে বললে—নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পর সিকিতে, দু আনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামী থালায় রাখল।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরমবিশ্বাসী পল্লীবধু, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টার্জিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে, বড়বাবুকে ? এই এত লোক এখানে এসেছে, এরা সবাই চাষী গরীব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেছে জানি নে—কিন্তু অম্লানবদনে খুশীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্ছে কেন ? এই টাকায় কলকাতায় ওঁদের স্ত্রীরাগহনা পরবেন, মোটরে চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষি সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবুবন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিশে চপ-কাটলেট ওড়বেন, সেই জন্যে ?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমচাঁদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারা পথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাখা গায়ে বটতলায় ধর্গা দিতে চলেচে—আর নিমচাঁদ ছেলেকোলে নিয়ে ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।

সেই দিন রাতে শুনলাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েছে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সামনের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, অনেকেই পালিয়েছে। নিমচাঁদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমচাঁদের স্ত্রী বসে—আমায় দেখে কেঁদে উঠল। নিমচাঁদের কলেরা হয়েছে কাল রাতে—মেলার যারাতদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে চেয়েছে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমচাঁদ ছটফট করছে, খুব ঘামচে।

নিমচাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু যাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে, তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্পে নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখবে—

নিমচাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে যাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্জেকশন দিলে। মাঠের মধ্যে মাদুর দিয়ে সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্প করিয়েছে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখানে সেবাশুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নেই। ভাবলুম চাকুরি যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্তত বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখাশুনা করলুম একা। সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্প আরও চারটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মরে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্যিনিয়ম-মত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোনরকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমচাঁদও মারা গেল। সে এক অতি করুণ ব্যাপার ! ওদের দেশের লোক খুঁজে বারক'রে নিমচাঁদের সংস্কারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমচাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলায় ধর্গাদেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস ক'রে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয়নি। রুক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়—খবর পেয়ে সে ধর্গা ফেলবটতলা থেকে উঠে এসেছে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছে, যেন পাগলীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সেকাঁদে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোন দিকে চায় না।

মেজবাবুকে বলতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ারখরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম ব'লে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এদেরই তো। ওরাই রইল নির্বিকার ভাবে ব'সে। আমারকাছে কিছু ছিল, যাবার সময় নিমির্চাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলুম। চোখের জল রাখতে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-দুই পরে রাতে বসে আমি ও নবীন মুহুরী হিসেবমেলাচ্ছি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, বেশশীত আজ রাতে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারিনে—দেখতেদেখতে নবীন মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর, সব যেনমিলিয়ে গেল। আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিতহয়েছি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেছেন, খুব বেশিলোকজনের নিয়ন্ত্রণ হয়নি, বরপক্ষেও বরযাত্রী বেশি নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে ময়দা ঠাসচে।... আরও সবকি কি... ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটাদেখছি—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙলে দেখি নবীন মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্ছে। বললে—কি হয়েছে তোমার, মাঝে মাঝে ফিট্ হয় না-কি ?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগচে না। সীতারবিবাহ নিশ্চয়ই হচ্ছে, আজ এখুনি হচ্ছে। আমি ওকে বড়ভালবাসি—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেছি।

নবীন মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়ে ছিল, মায়েরজবানি জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতারবিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনিকথা দিয়েছেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচজনের কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন্ কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকালবসে থাকেন—ইত্যাদি।

বেচারী সীতা ! ওর সাবান মাখা, চুলবাঁধা, মিথ্যেশৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এত কাল কিছু গ্রাহ্য করিনি। বেশ দেখতেপেলাম ওর ঘন কালো চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়েগেল—ওর শুভ্র, নিস্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনিখেললে।

এখান থেকে কলকাতায় যাবার সময় হয়ে এল। বিকেলেআমি বটতলায় পুকুরের ঘাটে বসে মাছ-ধরা দেখছি, নবীনমুহুরী এসে বললে—তোমায় ডাকচেন মেজবাবু।

ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল গুরুতর একটা কিছুঘটেছে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েচে। নবীন মুহুরীএ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েচে এর আগেও। কারণ তার চুরির বেজায় অসুবিধে ঘটত আমি থাকারদরুন।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ নায়েবও সেখানে দাঁড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মানুষ বলেই কোনো দিন ভাবেননি।এ পর্যন্ত আমি পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেছি।লোকটার মুখের উগ্র দাস্তিকতা আমাকে ওর সামনে যেতেউৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোন এদিকে।কলকাতায় গিয়ে তুমি অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিলাম।

—কেন, কি হয়েছে ?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি নবীনও দেখেচে বলচে। হিসেব-পত্রে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকমলোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না। স্টেটের কাজ তোছেলেখেলা নয়।

নবীন এবার আমায় শুনিয়েই বললে—এই তো সেদিন আমার সামনেই হিসেব মেলাতে মেলাতে মৃগীরোগের মতহয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির।

মেজবাবুকে বিদ্বান ব'লে আমি সম্রমের চোখেও দেখতাম—বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সববোঝেন, আপনাকে বলচি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটাঅবস্থা হয় শরীরের ও মনের, সেটা বলে বোঝাতে পারিনে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিস দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আরও অনেক দেখতুম, এখনকমে গিয়েচে। তখন বুঝতাম না, মনে ভয় হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যে, আমার বুঝি কি রোগ হয়েছে। কিন্তু এখনবুঝেছি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমারকথা শুনছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ নায়েবের দিকেচেয়ে হাসলেন। নবীন মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সেঅনেক কম দরের মানুষ। স্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কতদূরপড়াশুনা করেচ তুমি ?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার মুশকিল হবে। মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিকযারা—নিউরোটিক বোঝা ?যাদের স্নায়ু দুর্বল তাদের ওইরকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথ্যে নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেকবার দেখেছি—ও-সব সত্যি হয়েছে।তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেইজন্যেই আপনাকেজিজ্ঞেস করছি। আমি সেন্ট ফ্রান্সিস্ অফ আসিসিরলাইক-এ পড়েছি, তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তুমি 'তাহলে'—তুমিসেন্ট হয়ে গিয়েচ দেখছি ?পাগল কি আর গাছে ফলে ?নবীন ও কুঞ্জ দুজনেই মেজবাবুর প্রতি সম্রম বজায় রেখেমুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানাদিক থেকে খোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম।বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মরেগিয়েচে এমন মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের দেখতে পেয়েছি।

নবীন মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অদ্ভুত ধরনেরঅবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধিরওপর তার বোধ হয় বিশেষ আস্থা না থাকতে সে মেজবাবুরমুখের দিকে চাইলে। মেজবাবুএমন ভাব দেখালেন যে, এবদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে ! তিনিকুঞ্জ নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে, একে আর এখানে কেন ?পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি ক'রে ফেলবেএক্ষুনি !

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন তাতে যে-জিনিস সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয়, আপনি আমার কথাবুঝতেও পারেননি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েছে, সে এ-সব বুঝতে পারবে না, এ-কথা এতদিনে আমি বুঝেছি।খুব বেশি লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাকলেই য়েবোঝা যায় তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি যে ঘরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক যার সামনে—ওখানে আমি একজনবড়োমানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেছি—কি করেপেরেছি, সে আমি নিজেই জানি নে—খুব তামাক খেতেন, বয়স অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারাগিয়েচেন কি বেঁচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটায় গেলেই এই ধরনের লোকের কথা আমার মনে হয়। বলুন তো ওখানে কেউ ছিলেন এ-রকম ?

কুঞ্জ নায়েবের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দৃষ্টি—বিনিময়হ'ল। মেজবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটাসিম্পল্ ভেবেছিলাম তুমি তা নও দেখছি। তোমার মধ্যেভগ্নামিও বেশ আছে—তুমি বলতে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেচ, তুমি কারও কাছে শোননি ওখানে কেথাকতো ?

—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তা শুনিনি। কে আমায়বলেচে আপনি খোঁজ নিন্ ?

—ওখানে আমাদের আগেকার নায়েব ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েছে, শোননি এ-কথা ?

—না আমি শুনিনি। আরও কথা বলি শুনুন, আপনারছেলে হওয়ার আগের দিন কলকাতায় আপিসে আপনাকেকি বলেছিলুম মনে আছে ?বলেছিলুম একটা খোকা দাঁড়িয়ে আছে—দরজা খুলে মেজবৌরাণী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ-কথা বলেছিলুম কিনা ?মনে ক'রে দেখুন।

—হ্যাঁ আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জানতে না যেআমার স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা ছিল ?যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ চাল চেলেছিলে—যে কোনো একটি সন্তান তোহ'তই—তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লাটান'রা ও-রকম বুজরুকি করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ ?

—বুজরুকি কিসের বলুন ?আমি কি তার জন্যে আপনারকাছে কিছু চেয়েছিলুম ?বা আর কোনোদিন সে-কথারকোনো উল্লেখ করেছিলুম ?আমি জানি আমার এ একটাক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জিলিঙের চা-বাগানে আমরাছিলাম, তখন থেকে আমার এ ক্ষমতা আছে। কিন্তু এদেখিয়ে আমি কখনও টাকা রোজগারের চেষ্টা তো করিনিকারোর কাছে ?বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিডলস্টিক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায়ওআমার নেই। ইট প্লেজ কুইয়ার ট্রিক্স্ উইথ আস্—যদি ধরেনিই তুমি মিথ্যাবাদী নও—ইউ মে বি এ সেল্ফ ডিলিউডেড্ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাওএখন—

আমি চলে এলাম। নবীন মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বলতে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। না ! যাহোক্, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্ছিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এনিয়ে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার হ'লনা।কেবল একটা কথা ওকে বললাম—দেখ নবীন-দা, চাকুরির ভয় আমি আর করি নে। যে-জন্যে চাকুরিকরছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েচে। এখন আমার চাকুরিকরলেও হয় না-করলেও হয়। ভেবো না, আমি নিজেইশীর্গির চলে যাবো ভাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে এতগুলো পাড়াগাঁয়ে গরীব চাষীলোক এখানে পূজো দিতে এসেছিল—এরা সকলেই মুর্থ, ভগবানকে এরা সে ভাবেজানে না, এরা চেনে বটতলার গোসাঁইকে। কে বটতলারগোসাঁই ? হয়ত একজন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বছর পঞ্চাশ আগে থাকত ওই বটতলায়। সেই থেকে লৌকিকপ্রবাদ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থগৃহুতা দুটোতে মিলে বটতলাকে করেছে পরম তীর্থস্থান। কোথায় ভগবান, কোথায় প্রতিভাশ্রী ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুলজনসঙ্ঘ তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম ? ধর্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখেচি। তার সরল ভক্তি, তাদেরতাগ। তার স্ত্রীর চোখে যে অপূর্ব ভাবদৃষ্টি, যা সকল ধর্মবিশ্বাসের উৎসমুখ—এ-সব কি মূল্যহীন, ভিত্তিহীন, জলজ শেওলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান ? এ রকমকত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জ্যাঠাইমাদের আচারেরশেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঐশ্বর্যের ঘটা দেখানো দেবার্চনারচেয়ে, এ আমার ভাল লেগেচে। ঘুসুড়ির সেই ষষ্ঠীমন্দিরেরমত।

কোন দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগঅর্ঘ্য গিয়ে পৌঁছুলো, জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরমত্যাগে সে যা নিবেদন করলে ?

আর একটা কথা বুঝেচি। কাউকে কোন কথা ব'লে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেচি নিজের জীবনে—মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিসকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখলুম, বাস্তব ব'লে জানি—ঘরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মুর্থ এখানে সমান—ধরা ছোঁয়ার গণ্ডীর সীমানা পার হয়ে কারুর মন অনন্ত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি, তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে ?

কলকাতায় ফিরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহউপলক্ষে। জামাইকে বিয়ের রাত্রে বেবি অস্টিন্ গাড়ীযৌতুক দেওয়া হ'ল—বিবাহ মণ্ডপের মেরাপ বাঁধতে ওফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যয় হ'ল আটশ টাকা। বিয়ের পরেফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে আট-দশজন লোক হিমশিম খেয়েগেল। ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধবদের একদিন পৃথক ভোজ হ'ল সেদিন শখের থিয়েটারে হাজার টাকা গেল এক রাত্রে। তবুও তো শুনলাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাঁড়াগাঁয়েরগৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মানুষি করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু-মণ দই, আধ মণ ক্ষীর, এক মণ মাছ, লরি-বোঝাই তরিতরকারি, চল্লিশখানা সাজানো থালায় নানা ধরনের তত্ত্বেরজিনিস—সব বন্দোবস্ত ক'রে তত্ত্ব বার ক'রে ঝি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রওনা করতে—সে এক রাজসূয়ব্যাপার।

ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুন নিমচাঁদের স্ত্রীতিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসেররাত্রে হয়ত যে অনাথা বিধবার খেজুরডালের ঝাঁপে শীতআটকাচ্ছে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেইধার-করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্মেরনামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্মের নামে এরা করেছে ঘোর অধর্ম ওঅবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোসাঁই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মানুষ ক'রে দিয়েছে, লক্ষ গরীব লোককেমেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহ-দেবতা যেমন তাদের বড় ক'রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদেরক্ৰীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম কোথায় আছে ? কি ভীষণ মোহ, অনাচারও মিথ্যের কুহকে টাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্য রূপসেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্মকে ভুলে অর্থহীনঅনুষ্ঠানকে ধর্মের আসনে বসিয়েছে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দাদাযেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরীব ব্রাহ্মণের একটিমাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবাই মিলে ধরে-পড়ে মেয়েটিরসঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, যে যা বলে কারও কথা ঠেলতে পারে না। কাউকে জানানো হয়নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই

জানাতে দেয়নি। এদিকেজ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়ীতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করচেনা, আমায় লিখেচে, সে বড় বিপদে পড়েচে, এখন সে কিকরবে ?চিঠির বাকি অংশটা নব-বধূর রূপগুণের উচ্ছ্বসিতসুখ্যাতিতে ভর্তি।

—জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবরদিতে পারিনি। তুই একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসবি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস্। মায়ের সম্বন্ধে কিকরি আমায় লিখবি। সেখানে তোর বউদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোয় না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্বঘরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে মেয়েটি পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তুতোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরেনিতে না চান, কি অপমান করেন, সে আমার সহ্য হবেনা...”

পত্র পড়ে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হ'ল। দাদা সংসারে বড় একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্যে খাটচে, জীবনটাই নষ্ট করলে সেজন্যে, অথচ ওর দ্বারা না হ'ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ'ল ওরনিজের। ভালই হয়েছে ওর মত স্নেহপ্রবণ, ত্যাগী ছেলে যেএকটি আশ্রয়নীড় পেয়েছে, ভালবাসার ও ভালাবাসা পাবার পাত্র পেয়েচে, এতে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। কত রাতে শুয়ে শুয়ে দাদার দুঃখের কথা ভেবেচি !

মাকে কাছে নিয়ে আসতে পত্র লিখে দিলাম দাদাকে।জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাখবার আর দরকার নেই। আমিশীগগিরই গিয়ে দেখা করবো।

মাঘ মাসের প্রথমে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়েপড়লাম। মনে কেমন একটা উদাস ভাব, কিসের একটাঅদম্য পিপাসা। আমার মনের সঙ্গে যা খাপ খায় না, তাআমার ধর্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অদৃশ্য জগতেরবার বার সম্মুখীন হয়েচি, অথচ যাকে কখনও চিনি নি, বুঝিনি—তার সঙ্গে যে ধর্ম খাপ খায় না, সেও আমার ধর্ম নয়।

অথচ চারিদিকে দেখচি সবাই তাই। তারা সৌন্দর্যকেচেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এত পঙ্গু যে, যে-খোঁটায় বন্ধ হয়ে ঘাসজল খাচ্ছে গরুর মত—তারবাইরে উর্ধ্বের নীলাকাশের দেবতার যে-সৃষ্টি বিপুল ওঅপরিমেয় এরা তাকে চেনে না।

বছরখানেক ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। কতবারভেবেচি একটা চাকরি দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়ানোছাড়া কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শুনতাম কোনো নতুনধর্মসম্প্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমায় যেতেই হবে, এমন হয়েছিল।

কালনার পথে গঙ্গার ধারে একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী-কৈবর্তের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশনিকোনো-পুছোনো, উঠোন পর্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁদুরপড়লে উঠিয়ে নেওয়া যায়। সকলের ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সামনে-পিছনে ক্ষেত-খামার। ক্ষেতেরবেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে সাদা গোলাপী ফুল ফুটে মিষ্টিসুগন্ধে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেচে।

একজন লোক গোয়াল-ঘরে গরু বাঁধছিলো। তাকেবললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে ?সে বললে—কোথেকে আসা হচ্ছে ?আপনারা ?

‘ব্রাহ্মণ’ শুনে নমস্কার ক’রে বললে—ওই দিকে একটুএগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে দিব্বি থাকার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠানের এক পাশেএকটা লেবুগাছ। বড় আটচালা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া।একটি ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ী নেই, হলুদপুকুরে কীর্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েচে—কাল আসবে।

আমি চলে যাচ্ছি এমন সময় একটি মেয়ে ঘরের ভেতরথেকে বললে—চলে কেন যাবেন ?পায়ের ধুলো দিয়েছেনযদি রাতে এখানে থাকুন না কেনে ?

কথার মধ্যে রাত দেশের টান। মেয়েটি তারপর এসেদাওয়ায় দাঁড়াল। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে, রং ফর্সা, হাতেটেমির আলোয় কপালের উল্কি দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিলে, এক ঘটিজল নিয়ে এল। আমি হাত পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে বসলে মেয়েটিবললে—রান্নার কি যোগাড় ক’রে দেবো ঠাকুর ?

আমি বললাম—আপনারা যা রাঁধবেন, তাই খাবো।

রাত্রে দাওয়ায় শুয়ে রইলাম। পরদিন দুপুরের পরেঅধিকারী মশাই এল। পেছনে জনতিনেক লোক, একজনেরপিঠে একটা খোল বাঁধা। তামাক খেতে খেতে আমারপরিচয় নিলে, খুব খুশী হ’ল আমি এসেচি বলে।

বিকলে উল্কি-পরা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তারঝগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বলচে শুনলাম—এমন যদি করবি মিলে, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোর মুখনাড়ার ধার ধারে ?একটা পেট চলে যাবে ঢের, সেজন্যে তোর তোয়াক্কা রাখি ভেবেচিস্ তুই !

আগুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাত্রে ওদের উঠোনে প্রকাণ্ড কীর্তনের আসরবসল। রাত তিনটে পর্যন্ত কীর্তন হ’ল। আসরসুন্দ সবাই হাততুলে নাচতে শুরু করলে হঠাৎ। দু-তিন ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুনই হোক বা বেশী রাত হওয়ারজন্যেই হোক, তারা কীর্তন বন্ধ করলে।

আমি যেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক’রে সেইস্ত্রীলোকটি—আমায়যেতে দেয় না। কি যত্ন সে করলে ! আর একটা দেখলাম, অধিকারীকেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন যা-তা শুনিয়ে দেয়, তার মুখের কাছেদাঁড়বার সাধ্য নেই অধিকারীর।

যাবার সময় মেয়েটি দিব্যি করিয়ে নিলে যে আমি আবার আসবো। বললে—তুমি তো ছেলেমানুষ, যখন খুশীআসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমার খাওয়ারকষ্ট হচ্ছে এখানে—মাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বোশেখমাসে এস, আম দিয়ে দুধ দিয়ে খাওয়াবো।

কী সুন্দর লাগল ওর স্নেহ।

আমার সেই দর্শনের ক্ষমতাটা ক্রমেই চলে যাচ্ছে। এইদীর্ঘ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটিবার জিনিসটা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটঘরায় ফিরেআসতে হচ্ছে। সেদিন দুপুরের পরে একটি গ্রাম্য ডাক্তারেরডিস্‌পেন্সারী-ঘরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করছি—ডাক্তারবাবুজাতিতে মাহিষ্য, সর্বদা ধর্মকথা বলতে ও শুনতে ভালবাসে ব’লে আমায় ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল গ্যান্‌ গ্যান্‌ ক’রে ওই সব কথা পেড়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ ক’রে তুলেছিল—আমি ধর্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, শুনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালেএর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তন্দ্রা-মতএল। তন্দ্রাঘোরে মনে হ’ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বেদানা ভেঙে কার হাতে দিচ্ছি, যার হাতে দিচ্ছি সেতার রোগজীর্ণ হাত অতিকষ্টে একটু ক’রে তুলে বেদানানিচ্ছে, আমি যেন ভাল দেখতে পাচ্ছি নে, ঘরটার মধ্যেধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বেদানা দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ’ল রোগীর মুখ আর আমারমায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলএবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে এসেফুলসরা ঘাটে স্টীমার ধরে পরদিন বেলা দশটায় কলকাতাপৌঁছুলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে, আটঘরাযেতেই হবে।

শেয়ালদ’ স্টেশনের কাছে একটা দোকান থেকে আঙুরকিনে নেবো ভাবলাম, পকেটেও বেশী পয়সা নেই। পয়সা গুনচি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম ঘরের সামনে দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্তির দিকে

চেয়েআমার মনে হ'ল দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিনতে চলেগেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে একটিপঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোট বৌঠাকরুন। আমি কাছে যেতেই বৌঠাকরুন চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি ! কোথেকে আসছেন?এমন চেহারা ?

আমি বললুম—আপনি একটু আগে মেয়েদেরওয়েটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন ?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম যোগবানীর গাড়ীতে—আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্ছি। ইনি মেজদা—এঁকেদেখেন নি কখনও ?

যুবকটি আমায় বললে—আপনি তাহ'লে একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে—আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি—এখানেদেরে বনচে না—

সে চলে গেল। ছোট-বৌঠাকরুন বললেন—মাগো কিকালীমূর্তি চেহারা হয়েছে। বড়দি বলছিল আপনি নাকিকোথায় চলে গিয়েছিলেন, খোঁজ নেই—সত্যি ?

—নিতান্ত মিথ্যে কি ক'রে বলি ! তবে সম্প্রতি দেশেযাচ্ছি।

ছোট-বৌঠাকরুন হাসিমুখে চুপ করে রইলেন একটু, তারপর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও দেখেথাকি !আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি চলেআসবার পরে বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে শুনেচি। তখন কি অত জানতাম?বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আশ্বিন মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন ?এত ক'রে বললাম, রাখলেন না কথা?আমার ওপর রাগএখনও যায়নি বুঝি ?

—রাগ কিসের ?আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি আপনারওপর রাগ করেছিলাম ?

ছোট-বৌঠাকরুন নতমুখ চুপ ক'রে রইলেন।

—বলুন !

ছোট-বৌঠাকরুন নতমুখেই বললেন—ও কথা যাক।আপনি এ-রকম করে বেড়াচ্ছেন কেন ?পড়াশুনো করলেন না কেন ?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব একদিন।

—আসুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে ?দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার ! সত্যি, আসুনআজ।

—না, আজ নয়, দেশে যাচ্ছি, খুব সম্ভব মায়ের বড়অসুখ—

ছোট-বৌঠাকরুন বিস্ময়ের সুরে বললেন—কই সে কথাতো এতক্ষণ বলেননি ! সম্ভব মানে কি, চিঠি পেয়েচেন তো, কি অসুখ ?

একটু হেসে বললাম—না, চিঠি পাইনি। আমার ঠিকানাকেউ জানতো না। স্বপ্নে দেখেচি—

ছোট-বৌঠাকরুন একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু শান্ত সুরেবললেন—আমি জানি। তখন জানতাম না আপনাকে, তখনতো বয়সও আমার কম ছিল। বড়দি তার পরে বলেছিল। একটা কথা রাখবেন ?চিঠি দেবেন একখানা ?অন্তত একখানা লিখে খবর জানাবেন ?...

ছোট-বৌঠাকরুন আগের চেয়ে সামান্য একটু মোটাহয়েছেন, আর চোখে সে বালিকাসুলভ তরল ও চপল দৃষ্টি নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গম্ভীর। আমি হেসেবললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই তোজানতে পারবেন খবর—

এই সময় ওঁর মেজদাদা ট্যান্ডিতে চড়ে এসে হাজির হ'লেন। আমি বিদায় নিলুম।

সন্ধ্যার সময় আটঘরা পৌঁছে দেখি সত্যিই মায়ের অসুখ। আমাদের ঘরখানায় মেঝের ওপর পাতা বিছানায় মাশুয়ে। অন্ধকারে আমায় চিনতে না পেরে ক্ষীণস্বরে বললে—কে ওখানে, হারু ?

তারপর আমায় দেখে কেঁদে উঠে বললেন—কে জিতু, আয় বাবা আয়, এতদিন পরে মাকে মনে পড়লো তোর ? আয় এই বালিশের কাছে আয়—ওমা, এ কি হয়ে গিয়েছিল রে ! রোগা কালো চেহারা—ওরা সত্যিই বলত তো !

মা একটি ঘরে শুয়ে—জনপ্রাণী কেউ কাছে নেই। সন্ধ্যা হব-হব, ঘরে একটা আলো পর্যন্ত কেউ জ্বালেনি। এমনিই বাড়ি বটে ! কেন, এত ছেলে মেয়ে বৌ বাড়িতে, একজনকাজে থাকতে নেই ? অথচ—, কিন্তু পরের দোষ দিয়ে লাভকি, আমিই বা কোথায় ছিলাম এতদিন ?

বললাম—মা, দাদা কোথায় ? সীতা আসেনি ?

মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ওরা কেউচিঠি দেয় না, ব'লে ব'লে আজ বুঝি হারু একখানা পত্র দিয়েছে সীতাকে।

—ক'দিন অসুখ হয়েছে তোমার, মা ? ওরা কেউ দেখেনা ? জ্যাঠাইমা কাকিমারা আসে না ?

—ভুবনের মা মাঝে মাঝে আসে। এই বিকেলে সাবু দিয়ে গেল—তা সাবু কি খেতে পারি, ওই রয়েছে বাটিতে। ছোটবৌ এসেছিল বিকেলবেলা। বটঠাকুর বাড়ি নেই বুঝি—আর কেউ এদিকে মাড়ায় না।

তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—হাঁরেজিতু, তুই নাকি সন্নিসী হয়ে গিয়েচিস—দিদি, হারু, মেজবৌ, ঠাকুরপোরা সবাই বলে—সত্যি ? বলে সে আর আসবে না, সে কোন্ দিকে বেরিয়ে চলে গিয়েছে, তার ঠিকানা কেউ জানে না। আমি ভাবি জিতু আমায় ভুলেযাবে এমনি হবে ? আবার ভাবি আমার কপাল খারাপ, নইলে এ-সব হবেই বা কেন—ভেবে ভেবে রাত জেগে বসে থাকি।

—কেঁদো না, কেঁদো না, ছিঃ। ওসব মিথ্যে কথা। কেবলেতে সন্নিসী হয়ে গেছি। এই দ্যাখ না সাদা কাপড় পরনে, সন্নিসী কি সাদা কাপড় পরে ?

মনে বড় অনুতাপ হ'ল—কি অন্যায় কাজ করেচি এতদিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ! আর এদেরও কি অন্যায়, সবাই মিলে মাকে এমন ক'রে ভয় দেখানোই বা কেন, মা সরলমানুষ, সকলের কথাই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার দোষ ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মা আছেন দাদার কাছে নিশ্চিন্ত ছিলাম অনেকটা সেজন্যে। জিজ্ঞেস করলাম—মা, দাদা তোমায় নিয়ে যায়নি ?

—সে অনেক কথা। নিতু নিতেও এসেছিল, বটঠাকুর বললেন—যাও, কিন্তু আমার এখানে আর আসতে পাবেনা। সীতার শ্বশুরবাড়ির লোক ভাল না এখন দেখি—তারাও বটঠাকুরের হাতের লোক; বললে, তাহলে মেয়ে-জামায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে যাবে। মেয়ে তারা আর পাঠাবে না। বৌমাকেও এখনও দেখিনি, এমনি আমার কপাল। বটঠাকুর সেই বউকে এ-বাড়ি নাকি ঢুকতে দেবেননা। তা নিতু আমায় লিখলে, মা, এই কটা মাস যাক—কোথায় নাকি ভাল চাকরি পাবে—এখানে পাড়াগাঁয়ে বাসাও পাওয়া যায় না। আমি আবার গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি উঠবো সেটা ভাল দেখাবে না। মাঘ মাসে একেবারে নিয়ে যাবে এখান থেকে। এই তো নিতু ওমাসেও এসেছিল। আহা, বাছাকে কি অপমান করলে সবাই মিলে। আমার কপালে কেবল চারিদিকে অপমান ছাড়া আর কিছু জোটে না—

কেন চাকরি ছেড়ে দিলাম ? কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই ? এখন দেখতে পাচ্ছি সীতার বিবাহ হয়ে গেলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে ভাবা উচিত ছিল না। মাকে আমি উপেক্ষা করে এসেচি এতদিন, দাদা সাধ্যমত অবিশ্যিকরেচে—কিন্তু আমি কিছুই করিনি। কেন আমার এমন ধারামতিগতি হ'ল ? কোথায় আমার কর্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি অন্ধ ছিলাম কেন ?

লজ্জিত ও অনুতপ্ত সুরে বললাম—মা আঙুর খাবে ?... আঙুর এনেছি, ভাল আঙুর শেয়ালদ' থেকে—

—ভূতাকে বললাম, একটা আলো নিয়ে আয়, তাদেরনি দেখচি—বলতে বলতে ছোট-কাকীমা ঘরের দোরের কাছে এসে আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কে বসেওখানে ?

আমি অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—আমি, কাকীমা।

এগিয়ে এসে বললেন—কে নিতু ?

—না, আমি।

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—ওমা, জিতু যে দেখচি, কোথেকে, কি ভাগ্যি তোমার মায়ের ?তারপর, কি মনেক'রে ?

আমি মাথা হেঁটে ক'রে বসে রইলাম, কি আর বলব।

কাকীমা বললেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হবে, তাভেবেই পাই নে। একেবারে একটা বছর নিরুদ্দেশ নিখোঁজ।—আর এই এ-ভাবে মাকে ফেলে রেখে ! তোমাদের একটু জ্ঞান নেই যে এটা কার বাড়ি ?এখানে কে দ্যাখে তোমার মাকে ?সবই তোজান—বয়েস হয়েছে, এখনও বুদ্ধি হ'ল না ?বটঠাকুর বাড়ি নেই, একটা ডাক্তার-বদ্যি কেদেখায় তার নেই ঠিক। হরি ডাক্তারকে একবার আনতেহয়—টাকাকড়ি কিছু আছে ?নেই বোধ হয়, সে দেখেইবুঝিচি—নেই। আচ্ছা, টাকা আমি দেব এখন, ভেব না, ডাক্তার আন।

ছোটকাকীমার পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছা হ'ল। এবাড়িতে সবাই পশু, সবাই অমানুষ—সত্যিকারের মেয়ে বটে ছোটকাকীমা।

রাত্রেই ডাক্তার এল। ওষুধপত্রও হ'ল। দাদাকে পত্রদিলাম পরদিন সকালে।

আমায় নিয়ে খুব হৈ-চৈ হ'ল। জ্যাঠাইমা আমায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খেতে দেবেন না—আমি জাতবিচার মানি নে, বাগ্দি দুলে সবার হাতে খেয়ে বেড়াই, এ-সব কথা কে এসে গাঁয়ে বলেচে। নানা রকম অলঙ্কার দিয়ে কথাটা রাস্ত্র হয়েছে গাঁয়ে।

মায়ের অবস্থা শেষরাত থেকে বড় খারাপ হ'ল। সকালেআমাকে আর চিনতে পারেন না—ভুল বকতেও লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলচে ঘরেরমেজেতে—আমি একা বসে আছি মায়ের শিয়রে, এমনসময় বাইরে উঠোনে একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়বারশব্দ হ'ল। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাটিতে আঁচললুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢুকল। আমায় দেখে বললে, ছোড়দা ?

আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সীতা একেবারে বদলে গিয়েচে, মাথায় কত বড় হয়েছে, দেখতেও কি সুন্দর হয়েছে—ওকে চেনা যায় না আর।

মাকে বললাম—মা, ওমা, সীতা এসেচে,—

মা চাইলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। বোধ হয়বুঝতে পারলেন না যে সীতা এসেচে।

সীতা খুব শক্ত মেয়ে। সে কেঁদেকেটে আকুল হয়েপড়লো না। আমায় বললে—ছোড়দা, আমার বালাজোড়াটাদিচ্ছি, তাই দিয়ে ভাল ডাক্তার নিয়ে এস। এখানকার হরিডাক্তার তো ?তার কাজ নয়।

আমি অক্ষমতার লজ্জায় কুণ্ঠিত সুরে বললাম—তার পরতোর শ্বশুরবাড়ির লোকে তোকে বকবে। সে কি ক'রেহয়—

সীতা বললে—ইস্ ! বকবে কিসের জন্যে, বালা কিওদের ?মায়ের বালা, মা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। বাবাগড়িয়ে দিয়েছিলেন মাকে। তুমি বালা নিয়ে যাও, তারপরওরা যা বলে বলবে—

এই সময় সীতার স্বামী ঘরে ঢুকল। আমি যে-রকমচেহারা কল্পনা করেছিলাম, লোকটা তার চেয়েও খারাপ। কালো তো বটেই, পেটমোটা, বোধ হয় পিলে আছে, কাঠখোঁটা গড়ন, চোয়ালের হাড় উঁচু—গায়ে একটা ছেলেমানুষের মত ছিটের জামা, এটা রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেম্বিসের জুতো। আমায় দেখে দাঁত বার করে হেসেবললে—এই যে, ছোটবাবু না ? কখন আসা হ'ল, বড়বাবু বুঝি এখনও আসবার ফুরসুত পাননি—তার পর অসুখটাকি ?... এখন কেমন আছেন ?

তারপর সে খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে—বসোতোমরা। আমি জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা করে আসি—একটু চায়ের চেষ্টাও দেখা যাক, গরুর গাড়িতে গা-হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

ওর কথার ভঙ্গিতে একটা চাষাড়ে ভাব মাখানো। এইলোকটা সীতার স্বামী ! সীতার মত মেয়ের ! সীতাকেও আমরা সবাই মিলে উপেক্ষা করছি।

এই সময় হঠাৎ শৈলদিদির কথা আমার মনে পড়ল। শেয়ালদ' স্টেশনে ছোট-বৌঠাকুরকন বলেছিল শৈলদিএখানে আছে। সীতার বালাজোড়াটা নেব না—ওকে তারজন্যে অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে সেখানে। ও যে-রকমচাপা মেয়ে, কোন অভিযোগ করবে না কখনও কারু কাছে। শৈলদিদির কাছ থেকে টাকা ধার নেবো, মায়ের অসুখেরপর যে-ক'রে হোক্‌দেনা শোধ হবেই।

একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি সীতার স্বামী ওদের রান্নাঘরে বসে হুকো হাতে তামাক খেতে খেতে খুব গল্পজমিয়েচে—আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েরদেবসকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং বৌয়েরা সকলেইওর শালাজ—তাদের সঙ্গে।

রাত দশটার সময় শৈলদিদি এসে হাজির। আমায় দেখেবললে—এই যে সন্নিসী-ঠাকুর ফিরে এসেচ দেখছি। এই যেসীতা—এস এস, সাবিত্রীসমান হও, কখন এলে ভাই ? আমি শুনলাম এই খানিকটা আগে, আমাদের ও-পাড়ায় কে খবরদেবে বল।

আমি আর সীতা শুধু ঘরে মায়ের পাশে বসে। সীতার স্বামী খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে, অবিশ্যি সে বসে থাকতেচেয়েছিল—আমি বলেছিলাম, তার দরকার নেই তুমি খেয়েএকটু বিশ্রাম কর—দরকার হলে ডাকব রাতে।

শৈলদিদি রাতে থাকতে চাইলে, বললে—আজ রাতেলোকের দরকার। তোরা দুটিতে মোটে বসে আছিস। আমিখেয়ে আসি, আমিও থাকব।

আমি বললাম—না শৈলদি, আমরা দুজন আছি, ভগ্নীপতি এসেচে—তোমার আর কষ্ট করতে হবে না।

তারপর বাইরে ডেকে টাকার কথা বললাম। শৈলদিবললে—কত টাকা ?

—গোটাকুড়ি দাও গিয়ে এখন। কাল সকালেই আমি তাহ'লে চলে যাই ডাক্তার আনতে—

—তা হ'লে কাল সকালে যাবার সময় আমার কাছ থেকেনিয়ে যাবি। ওখান দিয়েই তো পথ—কেমন তো ?

ছোটকাকীমা এই সময় এলেন। শৈলদিকে দেখে বললেন—জিতুর মাকে নিয়ে বেজায় মুশকিল হয়েচেভাই—ওরা ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে—নিতুএখনও তোএল না। হঠাৎ চার পাঁচ দিনের জ্বরে যে মানুষ এমন হয়ে পড়বে তা কি ক'রেই বা জানবো। তবুও তো জিতু কোথা থেকে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল তাই রক্ষা।

রাতে জ্যাঠাইমাও এসে খানিকটা বসে রইলেন। অনেকরাতে সবাই চলে গেল, আমি সীতাকে বললাম—তুই ঘুমিয়েনে সীতা। আমি জেগে থাকি। রাতে কোন ভয় নেই।

সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে মা'র অবস্থা খুবখারাপ হ'ল। দশটার পর দাদা এল—সঙ্গে বৌদিদি ও দাদারখোকা। বৌদিদিকে প্রথম দেখেই মনে হ'ল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু মেয়ে। তবে খুব বুদ্ধিমতী নয়, একটু

অগোছালোআনাড়ি ধরনের। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বাইরেকোথাও বেরোয়নি বিশেষ, এই বোধ হয় প্রথম, কিছু তেমনদেখেও নি। গরম জলের বোতল পায়ে সঁক করতে হবেশুনে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিপন্ন মুখে সীতার দিকে চেয়ে রইল। কাপড়-চোপড় পরবার ধরনওঅগোছালো—আজকালকার মত নয়। বৌদিদি যেনবনে-ফোঁটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধেফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিস নয়। আরএকেবারে অদ্ভুত ধরনের মেয়েলী, ওর সবটুকুই নারীত্বেরকমনীয়তা মাখানো।

সীতা আমায় আড়ালে বললে—চমৎকার বৌদি হয়েছে, ছোড়দা। আহা, মা যদি একটিবারও চোখ মেলে চেয়ে দেখতেন। আমাদের কপাল !

বেলা তিনটির সময় মা মারা গেলেন। যে মায়ের কথাতেমন ক’রে কোন দিন ভাবি নি, আমাদের কাজকর্মে, উদ্যমে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উচ্চাভিলাষে মায়ের কোন স্থানছিল না, সবাই মিলে যাকে উপেক্ষা ক’রে ক’রে এসেচি এতদিন—আজ সেই মা কতদূরে কোথায় চলে গেলেন—সেইমায়ের অভাবে হঠাৎ আমরা অনুভব করলাম অনেকখানিখালি হয়ে গিয়েচে জীবনের। ঘরের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ডঘরজোড়া খাট থাকে, আজন্ম তার ওপর শুয়েচি, বসেছি, খেলেচি, ঘুমিয়েচি, সর্বদা কে ভাবে তার অস্তিত্ব, আছেতো আছে। হঠাৎ একদিন খাটখানা ঘরে নেই—ঘরেরপরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গিয়েচে—সে ঘরই যেননয়, একদিন ঘরের সে নিবিড় সুপরিচিত নিজস্বতা কোথায়হারিয়ে গেল, তখন বোঝা যায় ঘরের কতখানি জায়গাজুড়ে কি গভীর আত্মীয়তায় ওর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল সেই চিরপরিচিত একঘেয়ে সেকেলে খাটখানা—ঘরের বিরাটফাঁকা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবার নয়।

সীতার ধৈর্যের বাঁধ এবার ভাঙলো। সে ছোট মেয়েরমত কেঁদে আবদার ক’রে যেন মাকে জড়িয়ে থাকতে চায়।মা আর সে দুজনে মিলে এই সংসারে সকালে-সন্ধ্যায় খেটে দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের অনেক কাছাকাছিএসেছিল—সে-সব দিনের দুঃখের সঙ্গিনী হিসাবে মা আমাদের চেয়েও ওর কাছে বেশী আপন, বেশীঘনিষ্ঠ—অভাগী এত দিন সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হ’ল সংসারে। ওর স্বামী যে ওর কেউ নয়, সে আমার বুঝতে দেরি হয় নিএতটুকু। কিন্তু ও হয়ত এখনও তা বোঝেনি।

দিন দুই পরে বৌদিদি দুপুরবেলায় ওদের রান্নাঘরে একটা ঘড়া আনতে গিয়েচেন। জ্যাঠাইমা বলেচেন—ওখানদাঁড়াও, দাওয়াটাতে—অমনি হট ক’রে ঘরে ঢুকলে যে ?

বৌদিদি অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন, জ্যাঠাইমা ঘড়া বার ক’রে দিয়েচেন দাওয়াতে। বৌদিদি নিয়ে এসেচে, কিন্তু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি, বুদ্ধিমতী মেয়ে হ’লেতখনই বুঝত।

এ-কথা তখন সে কাউকে বলেনি।

পরদিন মেজকাকা আমায় ডেকে বললেন—একটা কথাআছে, শোন। তোমার মায়ের কাজটা এখানে না ক’রে অন্যজায়গায় গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয়নি, বড়দাদাও নেই বাড়ি—এ অবস্থায়শ্রদ্ধের সময় কেউ খেতে আসবে না। তোমার দাদার বৌকেআমরা সে-ভাবে ঘরে তো নিইনি। এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থাকরো। বলো তোমার দাদাকে।

তলায় তলায় এঁরা সীতার স্বামী গোপেশ্বরকে কি পরামর্শদিয়েচেন জানি নে, সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে চতুর্থীরশ্রদ্ধ সীতাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে করবে—অথচ আগে ঠিকহয়েছিল চতুর্থীর শ্রদ্ধ এখানেই হবে। এর কোনও দরকারছিল না, সীতা এখানে শ্রদ্ধ করলে তাতে কোন দোষ সমাজের মতেও হবার কথা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই শুনলেনা;এই অবস্থায় বৌদিদিকে পেয়ে সীতা অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল—কিন্তু সে ওদের সইল না। বৌদিদির সঙ্গেসীতার বেশী মেলামেশিটা যেন গোড়া থেকেই আমার ভগ্নীপতি পছন্দ করে নি। নিজেই হোক আর ওদেরপরামর্শই হোক।

যাবার সময় সীতা বৌদিদির গলা জড়িয়ে কাঁদতেলাগল। আমার আড়ালে বললে—ছোড়দা আমায় বনবাসেফেলে রেখে ভুলে থেকো না যেন, মাঝে মাঝে আসবেবল ?আর শোনো, বৌদি বড্ড ভালমানুষ, ও

এখনও জানে না যে ওর জন্যেই মায়ের কাজ এখানে করতে দিচ্ছে নাওরা। এ কথা যেন বৌদিদির কানে না যায়, ব'লে দিওদাদাকে।

বৌদিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এখানে শ্রদ্ধ করতে খরচবেশী পড়বে, কারণ জ্যেষ্ঠামশায়দের নাম বেশী, লোকজন নিমন্ত্রণ করতে হয় অনেক। গঙ্গাতীরে শ্রদ্ধের কাজ করলে অনেক কম খরচ হবে। বৌদিদি তাই বুঝে গেল।

যাবার সময় আমাদের ঘরের চাবিটা ছোটকাকীমার হাতে দিয়ে বললুম—এ বাড়িতে আর কাউকে আপন ব'লে জানিনে, কাকীমা। সীতার খোঁজখবর মাঝে মাঝে একটু নিও—ওর তো এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম মিটেই গেল।

ছোটকাকীমার চোখে জল এল। বললেন—আমার কোনো ক্ষমতা নেই, নইলে নিতুর বৌকে এ বাড়ি থেকে আজকে অন্য জায়গায় যেতে বলে ?

আমি বললুম—সে কথা ব'লো না কাকীমা। আমরা এখানে এসেছিলাম প্রার্থী হয়ে, পরের দয়ার ওপর নির্ভরকরে। এখানে কোন অধিকার নেই আমাদের।

কাকীমা বললেন—তুই ও কি কথা বলচিস জিতু ?এতোদের যে সাতপুরুষের ভিটে। জায়গা-জমি আর দুখানাইট থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি ?এ ভিটেতেহারুর কি যোগেশের যে অধিকার, তোদের দু-ভায়ের তারচেয়ে এক চুল কম নয়।

ছোটকাকীমার এক মূর্তি দেখেছিলাম বাল্যে, এ আর এক মূর্তি। এই একজনই এ বাড়ির মধ্যে বদলে গিয়েচেএকেবারে। গাড়িতে যেতে যেতে সেই কথাটা বার বার মনেহচ্ছিল।

মাস পাঁচ-ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে একবার গেলাম দাদারবাড়িতে।

দাদা ছিল না বাড়ি, বৌদিদি বাটনা-মাখা হাতে ছুটে বারহয়ে এল—আমার হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে বললে—এসএস ঠাকুরপো, রদুরে মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে একেবারে। কই আসবে ব'লে চিঠি দেও নি তো ! তা হ'লে একখানাগরুর গাড়ি স্টেশনে যেত।

তখনই বৌদিদি চিনি ভিজিয়ে শরবৎ ক'রে নিয়ে এল। বললে—ঠাকুরপো তোমার মায়া নেই শরীরে। এত দেরিক'রে আসতে হয় ? উনি কেবল বলেন তোমার কথা।

বিকলে দাদা এল। আমায় পেয়ে যেন হাতে স্বর্গপেলে। কিসে আমার সুখ-সুবিধে হবে, কিসে আমায় বড়মাছ, ভালটা-মন্দটা খাওয়ানো যাবে, এই যোগাড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরা বেশ সুখে আছে। দাদা যা চাইত, তা সে পেয়েচে। সে চিরকালই সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে গৃহস্থালী নিয়েই ওসুখী, তাই নিয়েই ও থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকেদাদাকে দেখে এসেচি, সংসার কিসে গোছালো হবে, কিসেসংসারের দুঃখ ঘুচবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। লেখাপড়াই ছেড়ে দিলে আমাদের দু-পয়সা এনে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু পরের বাড়িতে পরের তৈরী ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে সেখানে তো কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজেই দাদারসে সাধ তখন আর মেটে নি। যার জন্যে ওর মন চিরকালপিপাসিত ছিল, এতদিনে তার সন্ধান মিলেচে, তাই দাদা সুখী। দাদা ও বৌদিদি একই ধরনের মানুষ। নীড় বাঁধবার আগ্রহ ওদের রক্তে মেশানোরয়েছে। বৌদিদির বাপেরবাড়ির অবস্থা খারাপই। একান্নবর্তী প্রকাণ্ড পরিবারের মেয়ে সে। তার বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে কষ্ট পায়, সবাই ছেঁড়া কাপড় পরে, একঘরে পুরানো লেপকাঁথা পেতেশীতের রাতে তুলো বেরনো, ওয়াড়-হীন ময়লা লেপটানাটানি ক'রে ছেলেপুলেরা রাত কাটায়—সব জিনিসই সকলের, নিজের বলে বিশেষ কোন ঘরদোরও নেই, তৈজসপত্রও নেই—সেই রকম ঘরে বৌদিদি মানুষ হয়েছে। এতকাল পরে সে এমন কিছু পেয়েছে যাকে সে বলতেপারে এ আমার। এ আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমারঘরদোর—আর কারও ভাগ নেই এতে। এ অনুভূতিবৌদিদির জীবনে একেবারে নতুন।

দাদা আমায় তার পরদিন সকালে ওর কপির ক্ষেত, শাকের ক্ষেত দেখিয়ে বেড়ালে। বৌদিদি বললে—শুধু ওদিকদেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি আমার গোয়াল দেখে যাও ভাই এদিকে। এই দ্যাখো এই হচ্ছে মুংলী। মঙ্গলবারেসন্ধেবেলা ও হয়, ওই সজনে গাছতলায় তখন গোয়ালছিল। ও হ'ল, সেই রাতেই বিষম ঝড় ভাই। গোয়ালেরচালা তো গেল উড়ে। তারপর এই নতুন গোয়াল হয়েছে এই বোশেখ মাসে।—বৌদিদি বাছুরের গলায় হাত বুলিয়েআদর করতে করতে বললে—বড্ড পয়মস্ত বাছুর, যে-মাসেহ'ল সেই মাসেই ওঁর সেই মনিব আমায় শাঁখা-শাড়ি পাঠিয়েদিলে, ওঁর দু-টাকা মাইনে বাড়ালে।

দিনকতক যাবার পরে বৌদিদির একটা গুণ দেখলাম, লোককে খাওয়াতে বড় ভালবাসে। অসময়ে কোন ফকিরবৈষ্ণব, কি চুড়িওয়ালী বাড়িতে এসে খেতে চাইলে নিজেরমুখের ভাত তাদের খাওয়াবে। নিজে সে-বেলাটা হয়ত মুড়িখেয়ে কাটিয়ে দিলে।

এক দিন একটা ছোকরা কোথা থেকে একখানা ভাঙাখোল ঘাড়ে ক'রে এসে জুটলো। তার মুখে ও গালে কিসেরঘা, কাপড়-চোপড় অতি নোংরা, মাথায় লম্বা চুল। ছ-সাতদিন রইল, দাদাও কিছু বলে না, বৌদিদিও না। আমি একদিন বৌদিদিকে বললাম—বৌদি, দেখচো না ওর মুখে কিসের ঘা। বাড়ির থালা গেলাসে ওকে খেতে দিও না। ও ভাল ঘানয়, ছেলেপুলের বাড়ি, ওকে পাতা কেটে আনতে বললেইতো হয়, তাতেই খাবে। আটদিন পরে ছোকরা চলে গেল। বোধ হয় আরও আট দিন থাকলে দাদা বৌদিদি আপত্তিকরত না।

বৌদিদি খাটতে পারে ভূতের মত। ঝি নেই, চাকর নেই, একা হাতে কচি ছেলে মানুষ করা থেকে শুরু করে ধানসেদ্ধ, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—সমস্ত কাজইকরতে হয়। কোনদিন ব্যাজার হ’তে দেখলাম না সেজন্যেবৌদিদিকে।

এদের মায়ায় আমিও যেন দিনকতক জড়িয়ে গেলাম।এরকম শান্তির সংসার কতকাল ভোগ করি নি—বোধ হয়চা-বাগানেও না, কারণ সেখানে বাবা মাতাল হয়ে রাত্রেকিরবেন, সে ভয় ছিল। ভেবে দেখলাম সত্যিকার শান্তি ওআনন্দভরা জীবন আমরা কাকে বলে কোনদিন জানি নি—শ্রোতের শেওলার মত বাবা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এচা-বাগানে ও চা-বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, শেষকালে না হয় কিছুদিন উমপ্লাং বাগানে ছিলেন—এতে মন আমাদেরএক জায়গায় বসতে না বসতেই আবার অন্য জায়গায় উঠেযেতে হ’ত—এইসব নানা কারণে নিজের ঘর, নিজের দেশ, এমন কি নিজের জাতি ব’লে কোন জিনিস আমাদের ছিলনা।তার অভাব যদিও আমরা কোনদিন অনুভব করিনি—অত অল্পবয়সে করবার কথাও নয়—বিশেষ ক’রে যখনহিমালয় আমাদের সকল অভাবই পূর্ণ করেছিল আমাদেরছেলেবেলাতে।

এখানে সকলের চেয়ে আমার ভাল লেগেচে বৌদিকে।আমি বৌদিদির ধরনের মেয়েকখনও দেখি নি। যা তা জিনিস দিয়ে বৌদিকে খুশী করা যায়, যে-কোন ব্যাপার যতঅসম্ভবই হোক না কেন—বৌদিদিকে বিশ্বাস করানো যায়, খুব অল্পেই ভয় দেখানো যায়—ঠিকিয়ে কোন জিনিসবৌদিদির কাছ থেকে আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। অথচএকটি সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে বৌদিদি ঘরকন্না ও সংসারসম্বন্ধে দাদার চেয়েও ভাল বোঝে, বড় কিছু একটা আশাকখনও করে না, ভারি গোছালো, নিজের ধরনে ঠাকুরদেবতার ওপর ভক্তিমতী। কেবল একটা দোষ আমার চোখে বড় লাগে—নিজে যে-সব কুসংস্কার মানে, অপরকে সেই সব মানতে বাধ্য করবে। অনেক ব্যাপারে দেখলামভাবটা এইরকম, আমার সংসারে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তোমায় মানতেই হবে, তার পর বাইরে গিয়ে হয় মেনো না-হয় না-মেনো,—কড়া কথা ব’লে নয়, মিনতি অনুরোধক’রে মানাবে। কড়া কথা বলতে বৌদিদি জানে না—টকেরঝাঁজ নেই কোথাও বৌদিদির স্বভাবে, সবটাই মিষ্টি।

সপ্তাহ দুই পরে ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলেএলাম। আসবার সময় দাদা বললে—শোন জিতু, আটঘরারবাড়ি সম্বন্ধে কি করা যাবে, তুই একটা মত দিস্। ছোটকাকীমা ঠিকই বলেচেন—ও বাড়ি আমরা ছাড়বো না। আর একটা কথা শোন, একটা চাকরি দেখে নে, এরকমক’রে বেড়াস নে। তোর বৌদিদি বলছিল এই বছরই তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তার পর দু-ভায়ে ঘরবাড়ি করিআয়, দুজনে মিলে টাকা আনলে ভাবনা কিসের সংসার চালাবার ?সংসারটা বেশ গড়ে তুলতে পারবো এখন। আরদ্যাখ, পয়সা রোজগার করতে না পারলে, ঘরবাড়ি নাথাকলে কি কেউ মানে ?নিজের বাড়ি কোথাও একখানাথাকা চাই, নইলে লোকে বড় তুচ্ছতাচ্ছল্য করে।

দাদার শুধু সংসার আর সংসার। আর লোকে আমারসম্বন্ধে কি ভাবলে না-ভাবলে তাতেই বা আমার কি ?লেখাপড়া শিখলে না, কিছু না, দাদা যেন কেমন হয়েগিয়েছে। লোকে কি বলবে সেই ভাবনাতেই আকুল। দাদারওই সব ছাপোষা গেরস্তালী-ধরনের কথাবার্তায় আমার হাসি পায়, দাদার ওপর কেমন একটা মায়াও হয়।

ভাবলুম, কোথায় যাওয়া যায় ?কলকাতায় গিয়ে একটা চাকুরি দেখে নেবো ?দাদা যদি তাতেই সুখী হয়, তাইনা-হয় করা যাক। আমি নিজে বিয়ে করি আর না-করি, ওদের সংসারে কিছু সাহায্য করা তো যাবে ! নৈহাটির কাছেঅনেক পাটের কল আছে, কলকাতা না গিয়ে সেখানে গেলেকেমন হয় ?পাটের কলে শুনেচি চাকুরি জোটানো সহজ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই এলাম। মাস দুই কাটল, একটা মেসে থাকি আর নানা জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করি, কোন জায়গাতেই কিছু সুবিধে হয় না।

একদিন রবিবারে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে বেড়াতেবেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি, দমদমাও প্রায় ছাড়িয়েছি, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এল। দৌড়ে একটা বাগানবাড়ির ঘরে আশ্রয়নিলাম। ঘরটাতে বোধ হ'ল বহুদিন কেউ বাস করে নি, ছাদ ভাঙা, মেজের সিমেন্ট উঠে গিয়েছে। বাগানটাতেও জঙ্গলহয়ে গিয়েছে।

একটা লোক সেই ভাঙা ঘরের বারান্দাটাতে শুয়ে ছিল, বোধহয় ক'দিন থেকে সেখানে সে বাস করছে, একটা দড়ির আল্‌নায় তার কাপড়-চোপড় টাঙানো। আমায় দেখেলোকটা উঠে বসল—এসো, বসো বাবা। বেশ ভিজ্‌চদেখচি বৃষ্টিতে ! বসো।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের ওপর, পরনে গেরুয়াআলখাল্লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আমায় জিজ্ঞেসকরলে— তোমার নাম কি বাবা ?বাড়ি এই কাছাকাছি বুঝি ?

নাম বললাম, সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম।

বললে—বাবা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েছেনআজ। তুমি বসো, তুমি আমার অতিথি। একটু মিষ্টি খেয়েজল খাও—

আমি খেতে না চাইলেও লোকটা পীড়াপীড়ি করতেনাগল। তারপর কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যেকবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।...

আমি ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখেবললে—আর একটা খাবে ?এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়েছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্য হাতখানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার ! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টিথেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শনপাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জলরেখে দেবো, তারপর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাকবে, সেটাছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আসতে পার সত্যি নামিখে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুনছিলাম।এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি না এইমাত্র ওকেখালি-হাতে সন্দেশ আনতে দেখতুম। জিজ্ঞেসকরলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্ছেন ?

—না বাবা, মুর্শিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটাচাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগড়াঘাটথেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লেবেরিয়েচি।

আমি চাকরি-বাকরি খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলেগেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন ?অবিশ্যি যদিআপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতি কষ্টে মতকরালুম। তারপর মেসে ফিরে জিনিসপত্র নিয়ে এলাম।চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক এস বাবা।আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাঁটা যাক।

আমি বললাম—তা কেন ?আমার কাছে টাকা আছে, দু'জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখবার আগ্রহে আমিঅধীর হয়ে উঠেচি।

খাগড়াঘাট স্টেশনে পৌঁছতে বেলা গেল। স্টেশন থেকেএক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌঁছেচি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। দোকানের সামনে বটতলায় আমি আশ্রয় নিলাম। রাত্রে

শোবার সময়চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে। আজকাল আবার হয়েছে চোর-ছেঁচড়েরউৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখেচ তো ?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ তো হাজার হোক, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম—কোন ভয় নেই, দিন আমাকে। এই দেখুনঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেচি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সবচেয়ে সেফ—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটো টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরো পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখি বিষম মুশকিল। ঘণ্টাখানেক কাটল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নেই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেললোকটা ! মুদিটি আমার অবস্থাটা দেখে শুনে বললে—আমিচাল ডাল দিচ্ছি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্রলোকের ছেলে, এমন জুয়াচোরের পাঙ্কায় পড়লেন কি ক'রে ? দামের জন্যে ভাববেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখলে চিনতে দেরি হয় না, আপনি যা দরকার নিন্ এখনথেকে। ভাগ্যিস আপনার সুটকেসটা নিয়ে যায়নি।

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম মুখেচললাম। আমার সুটকেসে একটা ভাল টর্চলাইট ছিল, মুদিকেওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতেই নিলে না।

পথ হাঁটি, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা বড় পাকুড়গাছের তলায় পথের ধারেজনকয়েক লোক দেখে সেখানে গেলাম। চারজনপুরুষমানুষ ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক—তারাগাছতলায় উনুন জ্বলে রাঁধবার উদ্যোগ করছে।

একজন বললে—কনে থেকে আসছেন বাবু ?

—খগড়াঘাট থেকে—তোমরা আসচ কোথা থেকে ?

—আমরা আসতেছি তো বড় দূর থেকে। যাব কেঁদুলিরমেলায়।

একজন তামাক সেজে নিয়ে এসে বললে—তামাক ইচ্ছেকরুন বাবু। ও জুড়ন, বাবুকে বসবার কিছু দে।

—আমি তামাক খাইনে, তোমরা খাও। তোমরা দেশথেকে বেরিয়েচ কতদিন ?

জুড়ন বৈরাগী এগিয়ে এসে সঙ্গীর হাত থেকে হুকোটা নিয়ে বসলে—বাবু বড় কষ্ট, আর পুন্নিমেতে বাড়ির বারহওয়া হয়েছে। রাস্তায় কি অনাবিষ্টি ! তিনদিন ধরে আরথামে না, জিনিসপত্তর ভিজে একশা, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কোশএখান থেকে—নওদা, চেনেন ? সেই নওদার সন্নিপত্যআমাদের বাড়ি, হাতীবাঁধা গ্রাম, যশোর জেলা।

গল্পগুজবে আধঘণ্টা কাটলো। জুড়ন বললে—দাদাঠাকুরেরখাওয়াদাওয়ার কি হবে ? এক কাজ করুন দাদাঠাকুর, আমাদের সঙ্গে সবই আছে, রসুই করুন, আমরা পেরসাদপাব এখন। ব্রাহ্মণের পাতের অন্ন কতকাল খাই নি। ওকাপাসীর মা, পুকুর থেকে জলডা নিয়ে এস, আর রাতকোরো না।

আমি বিশেষ কোন আপত্তি করলাম না। এদের সঙ্গআমার বড় ভাল লাগছিল, ওই রাতে তা ছাড়া যাবই বাকোথায় ? রান্না চড়িয়ে দিলাম। কাপাসীর মা আলু বেগুনছাড়াতে বসলো। ওদের মধ্যে একজনের নাম বাবুরাম—সেপুকুরে চাল ধুতে গেল। জুড়ন শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়েআনতে গেল।

পথের ধারে এই দরিদ্র, সরল মানুষগুলির সঙ্গে গাছতলায় রাত্রিযাপন, জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। রাতটিও বেশ, কি রকম সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে ! নির্জনমাঠে জ্যোৎস্নায় অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

এই জ্যোৎস্নারাতে আমার কেবল মনে হয় আমি আর সে সব জিনিস দেখি নে। কতদিন দেখি নি। যখন চিনতে শিখি নি, তখন রোগ ভেবে যাকে ভয় করেছি কত, এখন তা হারিয়ে বুঝেছি কি অমূল্য সম্পদ ছিল তা

জীবনের। বোধ হয় মাঠের ধারের এই সবুজ দুর্বাঘাসের শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবলে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই—এই সব বিজন মাঠে শেষ প্রহরের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মুখ উঁচু করে চেয়ে থাকলে অনন্তপথের যাত্রীদের দেখা যায়... ওপর আকাশের জ্যোৎস্নাভরা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে—পথ দেহগন্ধে সুরভিত হয়—পরের দুঃখে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী-সমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে পড়লে তা মুক্তা হয়, বিল-বাঁওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মধু সৃষ্টি করে... আমার নিবে-যাওয়া দৃষ্টি-প্রদীপে আলো জ্বলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

সীতার কথা মনে হয়। আচ্ছা, এই রাত্রে এতক্ষণ সে কি করছে? যে জীবনের মধ্যে সে আছে, সে জীবনের জন্যে তৈরী হয় নি। হয়ত রান্নাঘরে বসে এতক্ষণে এইরকমরাঁধচে, ও অত বই পড়তে ভালবাসে, তাদের ঘরে একখানাও বই নেই, বই পড়া হয়ত সেখানে ঘোর অপরাধ—যেমন ছিল জ্যাঠাইমার কাছে। জীবনের যে-কোনো আনন্দভরা অভিজ্ঞতার সময়েই সীতার ব্যর্থ জীবনের কথা আমার মনে না এসে পারে না।

সবাই মিলে খেতে বসলাম। রান্না হ'ল বড়ির ঝোল, আলুভাতে, পটলভাজা। কাপাসীর মা অবিশিষ্য দেখিয়েছিল। কাল ঠিক এই সময়ে খাগড়াঘাটের পথে বটতলায় চৌধুরী-ঠাকুর ভজন গাইছে। কি খারাপ লোকটা! টাকার দরকার ছিল, আমায় বললে তো আমি দিতামই। চুরি ক'রেকি হ'ল!

জুড়ন বৈরাগী খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করতে লাগল। বললে—শুনুন দাদাঠাকুর, এই যে কাপাসীর মা দেখছেন, এর বাবা অনেক টাকা জমিয়ে মারা গিয়েছিল। খেতো না, শুধু টাকা জমাতো। মরবার সময় ভাইকে বললে, অমুক জায়গায় মালসায় টাকা পোঁতা আছে, নিয়ে এসে আমায় দেখা। তা এই পানচালার কোণে ভাঙা উনুনের মধ্য মালসা পোঁতা ছিল—কেউ জানতো না। মরবার সময় তাই টাকার মালসা সামনে নিয়ে খোলে। টাকা দেখতি দেখতি মরেগেল।

—সে টাকা কে পেলে তার পর?

—তারপর বুড়ো তো মরে গেল। তার ভাই রটালে মালসাসুদ্ধ টাকা সেই রাতি গোলমালে চুরি হয়েছে। এমনকি টাকার অভাবে বুড়োর ছেরাদটাও হ'ল না। পেটের ওপরবাগিজ্য ক'রে টাকা জমিয়ে গেল, নিজের ভোগে তোলাগলোই না—একটিমাত্র মেয়ে এই কাপাসীর মা, তার ভোগেও হ'ল না। টাকার মালসা রাতারাতি কে যে কোথায় সরিয়ে ফেললে—

কাপাসীর মা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁগো হ্যাঁ। সরিয়ে ফেলতে এসেছিল পাড়ার লোক! যে নেবার সে নিয়েছে। আমি কি আর কিছু জানি নে, না বুঝি নে? খস্ম আছেন মাথার ওপর তিনি দেখবেন। ছ-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে লোকের দোর দোর ঘুরিচি দুটো ভাতের জন্য—আমায় যিনি বাপের ধনে—

বাবুরাম বললে—আর শাপমন্নি করো না বাপু। তোমার অদেষ্টি থাকত, পেতে। বাদ দেও ওসব কথা। উনুনে আগুন আছে কিনা দেখো তো, আর একবার কল্কেটা ধরাই।

ওদের মধ্যে আর একজন বললে—ও জুড়নখুড়ো, স্বরূপগঞ্জের বাজারে কালদুপুরের আগে পোঁছানো যাবেনা?

—দুটোর কম হবে না। ছ'ডী কোশ, তার আগে খাওয়া-দাওয়া ক'রে নেওয়া যাবে।

বাবুরাম বললে—এবার কেঁদুলির মেলায় লোক যাচ্ছে কই তেমন জুড়নখুড়ো? ...সে-বছর দেখেছিলে তো? পথে সারারাতই লোক হাঁটতো।

অদ্ভুত লাগছিল এ রাতটি আমার কাছে। এত কথাও মনে এনে দেয়! ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম মানুষ এত অন্ধলো ও সুখী হয়? আর সুখ জিনিসটা কি অনির্দেশ্য রহস্যময় ব্যাপার—এই নির্জন রাত্রে মুক্ত অপরিচিত

প্রান্তরের মধ্যে তারাখচিত আকাশের নীচে শুয়ে সবাই সুখের স্বপ্নদেখেছে—কিন্তু একজনের সুখের ধারণার সঙ্গে অন্য আর একজনের ধারণার কি বিষম পার্থক্য !

সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেহাঁটি। রাঢ় দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে। রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মাঝে প্রাচীন কালেরপ্রকাণ্ড দীঘি, তালবনে ঘেরা কি ফাঁকা জায়গা এ-সব ! মনেহ'ত যেন সীমাহারা দিক্‌সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বননীল উপকূলে গিয়ে ভিড়বো, কোনখানে তমালতরুণিকরে বনভূমি শ্যামায়মান, সেখানেগন্ধভরা অন্ধকার বীথিপথ বেয়ে অভিসারিকারা চিরদিন পাটিপে টিপে হাঁটে; বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভারতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেলিকদম্বের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদের ও যাওয়ারশেষ হবে না, আমরাও না।

মাঠের পথের প্রথমটায় কেঁদুলি মেলার লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ত। পরে আর তেমন লোক দেখি নি, এত বড়মাঠের মধ্যে অনেক সময় আমি একাই পথিক। এই ধু-ধুসীমাহীন প্রান্তরে সূর্যাস্তের কি মূর্তি ! আমাদের অঞ্চলেকোনোদিন তা দেখি নি। অন্ধকার হ'লে মাঠের মধ্যেইকতদিন রাত কাটিয়েছি। ছেলেবেলায় চা-বাগানে কাটিয়েএই শিক্ষা পেয়েছিলাম, রাত্রিতে যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, একথা মনেই ওঠে না। শীতের দেশ নয়, ঘনহিমারণ্যের হিংস্র স্থাপদ নেই এখানে—নিতান্ত নিরীহ, নিরাপদ দেশ—এখানে নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ারতলায় মাটির ওপর যা-হয় একটা কিছু পেতে রাত কাটানোরমত আনন্দ খাট-পালঙ্কে শুয়ে পাইনি।

একদিন এই অবস্থায় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল।একটা অপূর্ব নাম-না-জানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা। মুখে সেকথা বলা যায় না, বোঝানো যায় না, শুধু সেই-ই বোঝেযার এ রকম হয়েছে।

সকালে বামুনহাটি বলে একটা গ্রামে এক গ্রাম্য হাতুড়েকবিরাজের অতিথি হয়েছিলুম সেদিন; তাঁর স্ত্রী একটিরণচণ্ডী—যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তাঁর গালবাদ্যের বিরামছিল না। আমি গিয়ে সব বসেছি, তিনি দোরের আড়ালথেকে স্বামীর উদ্দেশে আরম্ভ করলেনও—অল্পেয়ে মিন্‌সে, আমার সঙ্গে তোমার এত শত্রুরতা কিসের বল দিকি ?রাণাঘরের রোয়াকে চালা তুলতে তোমায় বলেছে কে ?গরমে একে ঘরের মধ্যে টেঁকা যায় না উনুন জ্বলে, যাওবা একটু হাওয়া আসতো, চালা তুললেও হাওয়া আসবে তো ও ড্যাক্রা ?ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তোমার পিণ্ডি রাঁধবো খেও।

স্ত্রী চলে গেলে কবিরাজ-মশায় বললেন—আর বলেন কেন মশাই, হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। শুনলেন তোদাঁতের বাদ্যি—ওই রকম সদাসর্বদা চলছে। আর ঘোরশুচিবাই, দুনিয়ার জিনিস সব অশুদ্ধ। দিনের মধ্যে সাতবারনাইছে, নিমুনিয়া হয়ে যদি না মরে তবে কি বলেছি। আজএক বছর ধরে এই গোয়ালের একপাশে তক্তপোশ পেতেশোয় আলাদা—ঘরের জিনিস সব অশুদ্ধ যে, সেখানে কিশোয়া যায় ?ওরকম ছিল না মশায়, ছেলেটা মরে গিয়েঅব্দি ওই রকম—

তারপর যেকথা বলছিলাম ! বামুনহাটি থেকে বিকেলে বার হয়ে ক্রোশতিনেক যেতে-না-যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।মাঠের মধ্যে একটা ছোট নদী, রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদীএত ছোট যে তাকে আমাদের দেশ হ'লে বলতোখাল। দু-পাড়ে রাঙা কাঁকর বিছানো, ধারে ধারে কাঁটাঝোপ আর তালগাছ। সেখানে রাত্রি যাপন করবো বলে মাটির ওপর ছোট শতরঞ্চিখানা পেতে তার ওপরে বসলাম। কোনদিকেজনপ্রাণী নেই।

খালের ওপারে একটা তালগাছের মাথায় শুকনো পাতা হাওয়ায় খড় খড় শব্দ করছে—এই অন্ধকার প্রদোষে তালগাছের মাথার ওপরকার আকাশে নিঃসঙ্গ একটিতারা—আমি একবার তারটির দিকে চাইছি, একবার চারিদিকের নিস্তন্ধ, পাতলা অন্ধকারের দিকে চাইছি। হঠাৎআমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। সে আনন্দ এতঅদ্ভুত যে বেদনা থেকে তা বেশী পৃথক নয়, সে পুলকচোখে জল এনে দিল, মনে কেমন একটা অনির্দেশ্য অভাবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যেন।

কিছুক্ষণ আগেও যে-জগতে ছিলাম, এ যেন সে-জগৎনয় !

এ জগৎ যুগযুগের তুচ্ছ জনকোলাহল কত গভীর মাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার জগৎ। ফুল ফুটে নির্জনেঝরে পড়ার জগৎ...অজানা কত বনপ্রান্তরে কত অশ্রুভরাআনন্দতীর্থের জগৎ...কত স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া...কত আশারহাসি মিলিয়ে যাওয়া...

শুধু নির্জনে চূতবীথির তালীবনরেখার মাথার ওপর শ্যামলতার পাড়টানা সীমাহীন নীল শূন্যে বহুদূরের কোন ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের সঙ্গে এ জগৎ এক...শতাব্দীতেশতাব্দীতে কত লক্ষ মনের আনন্দ, আশা, গর্ব, হাসি, দৃষ্টি-ক্ষমতার বাহাদুরি কোথায় মুছিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়, ক্ষীণ দুর্বল হাত প্রিয়কে নির্মম জীবনের গ্রাস থেকে বাঁচাবারচেষ্টা করে না, না বুঝে হাসে, খুশী হয়, আশার স্বপ্নজালবোনে...

অন্ধকারে কোন্ খনিগর্ভে চুনপাথর হয়ে যায় তাদেরহাড়...

আবার নবীন বুকে নবীন আনন্দ জেগে ওঠে। আবারহাসি, আবার খুশী হওয়া, আবার আশার স্বপ্ন-জাল বোনা...অথচ সব সময় তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত কালের প্রবাহ ছুটে চলে, পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন গানপুরোনো হয়ে যায়। গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে কত দৃশ্য-অদৃশ্য লোকে, কত অজানা জীবজগতেও এরকমবেদনা, দীনতা, দুঃখ। দূরের সে-সব অজানালােকে ক্ষুদ্রগ্রাম্য নদী দীর্ঘ বটগাছের ছায়ায় বয়ে যায়, তাদের শান্ত বন-বীথির মূলে প্রিয়জনের, বহুদিন-হারা প্রিয়জনের কথা ভাবে—নদীর স্রোতে শেওলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তরস্বপ্ন দেখে... যে অনন্ত তার চারধারে ঘিরে আছে সব সময়, তার নিঃশ্বাসে, তার বুকের অদম্য প্রাণস্রোতে, তার মনের খুশীতে, নাক্ষত্রিক শূন্যপারের মিটমিটে তারার আলোয়। দূরের ওই দিগ্বলয় যেখানে চুপি চুপি পৃথিবীর পানে মুখনামিয়ে কথা কইছে, শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবদেবীরা যেন এই সন্ধ্যায় ওখানে নেমে আসেন। যখন নদীজল শেষরৌদ্রে চিক চিক করে, কূলে কূলে অন্ধকার ফিরে আসে, পানকলসশেওলার ফুল কালো জলে সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পড়েযায়—তখনই। আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে—যেন জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়, আটঘরার বটতলার সেইপাথরের প্রাচীন মূর্তিটির চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীস্টেরচেয়েও বড়—চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্নরূপে সেইদেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে স্নান সন্ধ্যার রূপেমাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখারডাকে...সেই দেবতা আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি যাহারিয়েছি তা আর চাই নে, আমি চাই আজকার সন্ধ্যার মতআনন্দ, এবং যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহূর্তের জন্যে জগৎটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে জানি, সে আনন্দ জীবনে অক্ষয় হবে না জানি—কিন্তু আর একবারও যেনঅন্তত তারা আসে আমার জীবনে।

পরদিন দুপুরে সন্ধান মিলল ক্রেশ-চারেক দূরে দ্বারবাসিনী গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়ি আছে, সেখানে মাঝে মাঝেভাল ভাল বৈষ্ণব সাধু আসেন। গাঁয়ের বাইরে আখড়াবাড়ি, সেখানে থাকবার জায়গাও মেলে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দ্বারবাসিনীর আখড়াবাড়িতেপৌঁছলাম। গ্রামের প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে অনেকগুলোগাছপালা—ছায়াশূন্য, কাঁকরভরা, উষর ধু-ধু মাঠের মধ্যেএক জায়গায় টলটলে স্বচ্ছ জলে ভরা পুকুর। পুকুরপাড়েবকুল, বেল, অশোক, তমাল, নিমগাছের ছায়াভরা ঘনকুঞ্জ, দু-চারটে পাখির সান্ধ্যকাকলি—মরুর বৃকে শ্যামল মরুদ্বীপেরমত মনে হ'ল। এ-অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া।আমি যেতেই একজন প্রৌঢ় বৈষ্ণব, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তসরের বহির্বাস, উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে,—কোথেকে আসা হচ্ছে বাবুর ?তারপর তালপাতার ছোটচাটাই পেতে দিলে বসতে, হাত-মুখ ধোয়ার জল নিজেই এনে দিলে। গোলমত উঠোনের চারিধারে রাঙা মাটিরদেওয়াল-তোলা ঘর, সব ঘরের দাওয়াতেই দুটি-তিনটিবৈষ্ণব, খুব সম্ভবত আমার মতই পথিক, রাত্রের জন্য আশ্রয়নিয়েছে।

সন্ধ্যার পরে আমি তালপাতার চাটাইয়ে বসে একটি বৃদ্ধবৈষ্ণবের একতারা বাজনা ও গান শুনচি—এমন সময় একটিমেয়ে আমার সামনে উঠোনে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি রাত্তিরে কি খাবেন— ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমায় বলচেন ?

মেয়েটি শান্ত সুরে বললে—হ্যাঁ। রাত্তিরে কি ভাত খান ?

আমি খতমত খেয়ে বললাম—যা হয়, ভাতই খাবো। আপনাদের যাতে সুবিধে।

মেয়েটি বললে—আমাদের সুবিধে নিয়ে নয়—এখানে আপনার যা ইচ্ছে হবে খেতে তাই বলবেন। চা খান কি আপনি ?

এ পর্যন্ত কোন জায়গায় এমন কথা শুনিনি, কোন মন্দিরে বা বৈষ্ণবের আখড়াতেই নয়। ডেকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি আমি কি খেতে চাই। বললাম—চা খাওয়া অভ্যেস আছে, তবে সুবিধে না হ'লে—

মেয়েটি আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই চলে গেলএবং মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসেনিঃসঙ্কেচে আমার হাতে দিলে। বললে—চিনি ঠিক হয়েছেকিনা দেখুন।

আবার তাকে দেখলাম রাত্রে খাবার সময়ে। লম্বাদাওয়ায় সারি দিয়ে সাত-আটজন লোক খেতে বসেছে, মেয়েটি নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করলে। প্রকাণ্ডভড় ভাতের ডেক্চি নিজে দু-হাতে ধরে নিয়ে এসেআমাদের সামনে রাখলে—তা থেকে থালা ক'রে ভাত নিয়েসকলকে দিতে লাগল। আমার পাশের লোকটিকে বললে—ও কি শ্যামা কাকা, নাউয়ের ঘণ্ট দিয়ে আর দুটো খান্। ওবেলা তো খাওয়াই হয়নি !

সে সম্বন্ধে বললে—না দিদিঠাক্করুন, আমাকে বলতেহবে না আপনার। পেটে জায়গা নেই। তেঁতুল মেখে বরং দুটো খাবো—

—হ্যাঁ কাসছেন, তেঁতুল না খেলে চলবে কেন ?দুধদিচ্ছি—

তারপর আমার সামনে এসে বললে—আপনার বোধহয় ওবেলা খাওয়াই হয়নি ?আপনাকেও দুধ দিচ্ছি।

এতগুলো লোক খেতে বসেছে, দুধ দেওয়া হ'ল মোটে তিনজনকে—কিন্তু সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনবিশেষে এবং তারবিচারকত্রী ওই মেয়েটিই। আমার কৌতুক হ'ল ভারি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলামচমৎকার মেয়েটি ত ! দেখতেসুশ্রী বটে, তবে খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু আমি ওরকম মুখের গড়ন কখনও দেখিনি, প্রথমে সন্ধ্যাবেলায় ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। বার বার চেয়ে

দেখতে ইচ্ছেহয়—সে ওর সুন্দর ডাগর চোখ দুটির জন্যে, না ওর মুখের একটি বিশিষ্ট ধরনের লাভণ্যময় গড়নের জন্যে, রাতে তাভাল বুঝতে পারিনি। মেয়েটি কে? নিতান্ত ছেলেমানুষতো নয়—সারাদেহে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে পরিপূর্ণভাবেই—এখানে ওভাবে থাকে কেন? আখড়ার সঙ্গে ওরকি সম্পর্ক? নানা প্রশ্ন মনে উঠে ঘুম আর আসেনা।

পরদিন সকালে মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার দেখা হ'ল। অতিথিদের কারও অযত্ন না হয় সেদিকে দেখলাম ওর বেশ দৃষ্টি আছে। এ অঞ্চলে চালে কাঁকর ব'লে সে নিজে সকালে কুলো নিয়ে বসে প্রায় আধমণ চাল ঝাড়লে। বেলা ন'টার সময় হঠাৎ এসে আমায় বললে—আপনার ময়লাজামা-কাপড় যদি পুঁটলিতে থাকেত দিন, কেচে দেবো। আপনার গায়ের জামাটাও ময়লা হয়ে গিয়েছে, খুলে দিন। খুব রোদ, দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আমি প্রথমটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। তার পরদেখলাম সে সকলকেই জিজ্ঞেস করছে তারও ময়লাকাপড়-চোপড় কিছু আছে কিনা। একজন বৃদ্ধ বাউলের গেরুয়া আলখাল্লা ময়লা হয়েছিল ব'লে খুলিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম মেয়েটি ওরকম প্রায়ই করে, আখড়াতে ময়লা-কাপড়ে থাকবার জো নেই।

এখানে দিন দুই কাটাবার পরে আর একটা জিনিস আমার বিশেষ ক'রে চোখ পড়ল যে, মেয়েটির মধ্যে কোনমিথ্যে সঙ্কোচ নেই, সহজসিধে ব্যবহার, কি কাজে, কিকথাবার্তায়। সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চরিত্রী দীপশিখা, যদি শ্যামাঙ্গী মেয়েকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে বললে—পুকুরপাড়ের বাগান দেখেছেন? আসুন দেখিয়ে নিয়ে আসি।

এই কথাটা আমার বড় ভাল লাগল—এ পর্যন্ত আমি কোন মেয়ে দেখিনি যে বাগান ভালবাসে, দেখবার জিনিস ব'লে মনে করে।

ওর সঙ্গে গেলাম। অনেক গাছ আমাকে সে চিনিয়ে দিলে। কাঞ্চন ফুলের গাছ এই প্রথম চিনলাম। এক কোণে একটা বড় তমাল গাছের তলায় ইটের একটা তুলসীমঞ্চ ওবেদি দেখিয়ে বললে—বাবা এখানে বসে জপ করতেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার বাবা এখন কোথায়?

মেয়েটি কেমন যেন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—বাবা তো নেই, এই চার বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। এই যে পুকুরটা, বাবা কাটিয়েছিলেন, আর এই বকুলগাছের ওপাশে বিষ্ণুমন্দির তুলছিলেন, শেষ ক'রে যেতে পারেননি।

এই কথায় সূত্র খুঁজে পেলাম ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জিজ্ঞেসকরবার। এ দু-দিন কাউকে ওর সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি, পাছে কেউ কিছু মনে করে। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—আপনার বাবার নামেই বুঝি এই আখড়া?

—কি, লোচনদাসের আখড়া? তা নয়, আমরা ব্রাহ্মণ, আমার বাবার নাম ছিল কাশীশ্বর মুখুয্যে। লোচনদাস এই আখড়া বসান, কিন্তু মরবার সময়ে বাবার হাতে এর ভার দিয়ে যান। তারপর বাবা আট-ন' বছর আখড়া চালান। আখড়ার নামে যত ধানের জমি, সব বাবার। আসুন, বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না?

মনে ভাবি বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত আমি সঙ্গে যেতে রাজি আছি। পুকুরপাড়ের একটা বকুলগাছের পাশে একটা আধ-তৈরি ইটের ঘর। মেয়েটি বললে—গাঁথা শেষ হয়নি তো, হঠাৎ বাবা—তাইতে আন্দেক হয়ে আছে। কাঁচা গাঁথুনি, আর-বছরের বর্ষায় ওদিকের দেওয়ালের খানিকটা আবার ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বকুলগাছে কি লতা উঠেছে, দেখিয়ে বললাম—বেশ ফুলফুটেছে তো, কি লতা এটা?

ও বললে—মালতী লতা।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—জানেন ?আমারনাম—

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হ'ল এ এখনও ছেলেমানুষ। বললাম—আপনার নাম মালতীলতা ?ও ! কাল উদ্ধবদাসবাবাজি রুনি বলে ডাকছিলেন আপনাকে, তাই ভাবলামবোধ হয়—

ও সলজ্জ মুখে বললে—লতা নয়, মালা।

দুজনেই আখড়াবাড়ির নাটমন্দিরে ফিরে এলাম। তারপর মালতীকে আর দেখতে পেলাম না, সেই যে সেরান্নাঘরে কি কাজ নিয়ে ঢুকল রাত দশটা পর্যন্ত আর সেখানথেকে বেরুল না।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে কেমন এক ধরনের মধুরঅনুভূতি। মালতীকে যেন স্বপ্নে দেখেছি—ওর প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থিব অস্তিত্ব যেন নেই। স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তারকথা মনে পড়ল, বকুলতলায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, সেহাসিমুখে নিজের নাম বলেছে, তার চোখমুখের সেই সচেতন নারীত্বের সলজ্জতা অথচ বালিকার প্রগলভকৌতুকপ্রিয়তা—তার সারা দেহের সুঠাম লাভণ্য, এ-সবযেন অবাস্তব স্বপ্নজগৎ থেকে সংগ্রহ করা স্মৃতি। কিন্তু মনে সে বেদনা অনুভব করলাম না, যা আসে এই কথা ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখেছি ও সব মিথ্যে, মায়া, মায়া—ও আর পাবনা, ও ছায়ালোকের রচা স্বর্গ, ওর চন্দ্রালোকিত নির্জনপর্বতশিখরও মিথ্যে, ও দিব্যাঙ্গনারাও মিথ্যে। মালতীএইখানি আছে, কাছে কাছেই আছে, তাকে আরও কতবারদেখবো। মালতী আসবে তো ?

মালতী সকালে একরাশ তুলো পিঁজতে বসল। বেলা এগারোটা পর্যন্ত সে আর কোনো কাজে গেল না। প্রথম এখানে এসে যে প্রৌঢ় বৈষ্ণবটিকে দেখেছিলাম, তার নাম উদ্ধবদাস—সেই লোকটিই মালতীর অভিভাবক, কার্যত কিন্তু মালতীর খেয়ালে তাকে চলতে হয়। সেও মালতীর কাছে বসে তুলো পিঁজতে ব্যস্ত আছে, মালতীর কথা ঠেলবার সাধ্য তার নেই।

মালতীর ইতিহাস উদ্ধবদাসের মুখে একদিন ইতিমধ্যেশুনলুম। উদ্ধব বাবাজিকে একদিন আখড়ার বাইরের মাঠে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে মালতীর কথা জিজ্ঞেস করতেইও বললে—ওর বাবা আমার পাঠশালার পোড়ো বন্ধু। ওরা ব্রাহ্মণ, এ দেশের সমাজে কুলীন। মালতীর ঠাকুরদাদাশ্রীধর মুখুটি বেশ নাম-করা কীর্তন গাইয়ে ছিলেন। নিজেরদল ছিল। দু-পয়সা হাতে করেছিলেনও। একদিন রাত্তিরে বাইরে বেরুচ্ছেন, দরজার চৌকাঠের কাছে বাড়ির বেড়ালটা যেন কিসের সঙ্গে খেলা করছে। ফুটফুট করছে অনন্তচতুর্দশীর রাত, ভাদ্র মাস...যেমন বাইরে পা দিতেগিয়েছে অমনি সাপে ছোবল দিয়েছে পায়ে। সাপ ছিলচৌকাঠের বাইরে, আলো-আঁধারে লেগে বুড়ো তা টের পায়নি। ঘরে তখন ছেলের বৌ মালতীর মা, মালতীর বাবাবাড়ি নেই। চেষ্টা করে বললেন—বৌমা, শীগ্গির আলোজ্বালো, আমায় এক গাছা দড়ি দাও শীগ্গির। দড়ি নিয়েবাঁধন দিয়ে উঠোনে গিয়ে বসলো। বললে—আমায় আরঘরে যেতে হবে না বৌমা, তলব পড়েছে। লোকজন এল, ঝাড়ানো হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ভোর রাতে মারাগেল।

মালতীর বাবা পৈতৃক কিছু হাতে পেয়ে একটালবণ-কলায়ের দোকান করলে। তার মত অতিথিসেবারবাতিক আমি কখনও কারও দেখিনি। দোকান ত ছাই, বাড়িহয়ে উঠল একটা মস্ত বড় অতিথিশালা। যত লোকইবাড়িতে আসুক, ফিরতো না। একবার রাত-দুপুরের সময় পঁচিশজন সাধু এসে হাজির, গঙ্গাসাগর যাচ্ছে, অনেক দূর থেকে শুনে এসেছে এখানে জায়গা পাবে। দোকানেরজিনিসপত্র ভাঙিয়ে পঁচিশমূর্তি সাধুর সেবা হ'ল। সকালে তারা বললে, আমাদের জনপিছু দু-টাকা প্রণামী দাও। অতটাকা নগদ কোথায় পাবে ?সাধুরা বললে—না দাও তোঅভিসম্পাত দেবো। আমি বললাম—মিত, অভিসম্পাতদেয় দিক, টাকা দিও না ওদের। ওরা লোক ভাল না। সেবললে—অভিসম্পাতের ভয় করি নে, তবে আমার কাছেচেয়েছে, আমি যেখান থেকে পাই, নিয়ে এসে দেবোই। মালতীর মায়ের কানের মাকড়ি আর ফাঁদি নথ শ্রীমন্তপুরের বাজারে বিক্রি ক'রে টাকা নিয়ে এল। তাতেও কুলোয় না, আমি বাকি সাতটা টাকা দিলাম—তবে সাধুরা বিদেয় হয়।

মালতী তখন ছোট, একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে এসে বললে—দ্যাখ আর সংসারে থাকবো না। স্ত্রীও বললে—আমায় সঙ্গে নাও। স্ত্রীকে বললে—বাঁশবাগানে ওই হাঁড়িটা পড়ে আছে, নিয়ে এসে ধুয়ে ওতে ভাত রাঁধো। খেয়ে চलो। লবণ-কলায়ের দোকান বিলিয়ে দিলে। ডোমপাড়া থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—যার যা খুশি নিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে দোকানসাফ। সবাই বললে—পাগল হয়ে গিয়েছে। তারপর বৌ আর মেয়ের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। বছর দুই পরে এসে এই লোচনদাস বাবাজির আখড়ায় উঠলো। বাবাজি তখন বুড়ো হয়েছেন, বড় ভালবাসতেন, তিনি বললেন—বাবা, মহাশয় তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার আখড়ার ভার তোমায় নিতে হবে, আমি আর বেশি দিন নয়। পরের বছর বাবাজি দেহ রাখলেন, ওই পুকুরপাড়ের তমালতলায় তাকে সমাধি দেওয়া হ'ল।

ক্রমে মালতীর বাবার নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। গোসাঁইজি বলতো সবাই। গোসাঁইজিকে দেবতা ব'লে জানতো এ-দেশের লোক। অমন নির্লোভ, অমন অমায়িক লোক কেউ কখনও দেখিনি। শরীরে অহঙ্কার বলে পদার্থ ছিল না। আর অমন মুক্ত মানুষ হয় না—কোন বাঁধন, কোন নিয়মগন্ডির ধার ধারত না। আমাদের বোষ্টমের সমাজেও অনেক আইনকানুন আছে, মেনে না চললে সমাজে নিন্দে হয়, বড় বড় মচ্ছবের সময় নেমন্তন্ন পাওয়া যায় না। সে গ্রাহ্যও করতো না, একেবারে আপনভোলা, সদানন্দ, মুক্তপুরুষ ছিল। দ্বারবাসিনী কামারদের গাড়ির কাজ আছে কলকাতায়, একবার তাদের বাড়ি কাঙালিভোজন হচ্ছে, বেশ বড়লোক তারা। কামারদের মেজকর্তা রতনবাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন—এমন সময় দেখেন গোসাঁইজিকাঙালিদের সারিতে পাতা পেতে বসে খাচ্ছেন। পাছে কেউটের পায় ব'লে থামের আড়ালে বসেছেন। হৈ হৈ কাণ্ড, বাড়িসুদ্ধ এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো। এ কি কাণ্ডগোসাঁইজি, আমাদের অকল্যাণ হবে যে ! লোকটা এতসরল—কোনো লম্বা-চওড়া কথা নয়, কোনো উপদেশ নয়, অবাক হয়ে বললে, তাতে দোষ কি? আমি শুনলাম কাঙালিভোজন হবে, ভাল-মন্দ খেতে পাওয়া যাবে, তাই এসেছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জাত মানতো না, সমাজ মানতো না, আপন-পর বুঝতো না, নিয়মকানুনেরধার ধারতো না। কত লোক মন্ত্র নিতে আসতো। বলতো—মন্ত্র কি দেবো? আপনাকে ভাববে সবাইয়েরচাকর, ব্যস, এই মন্ত্র। মালতীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গোসাঁইজির নিজের মরণও হ'ল স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পরে। একদিন কোথা থেকে বৃষ্টি মাথায় ভিজে আখড়ায় এলেন। তার পরদিন সকালে আমায় বললেন—উদ্ধব, কাল আমারবড় ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু যেন জ্বর-মত হয়েছে। আজ আরভাত খাব না, কি বলো? দু-দিন পরে জ্বর নিমোনিয়ায়দাঁড়ালো। বুঝতে পেরেছিলেন বাঁচবেন না, মেয়েকে মরণেরআগের দিন ডেকে বলে গেলেন—মালতী মা, তোর বিয়েদিয়ে যেতে পারলাম না, তা আমার বলা রইল যাকে তোরমন চায়, তাকেই বিয়ে করিস্। তিনি তো চলে গেলেন, মালতীকে একেবারে নিঃসম্বল অসহায় ফেলে রেখে। হাতে পয়সা রাখতে জানতেন না। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেন না—সেটা আমি গুণ বলিনি, দোষই বলি—বিশেষ করে অত বড় মেয়ে—আর ওর কেউ নেই ত্রিসংসারে। বাপ নেই, মা নেই, পয়সা নেই, বাড়ি নেই, ঘরবাড়ি এই আখড়া। মালতীও যে দেখছেন—ও মেয়েও পাগল, ও বাপের ধারায় গিয়েছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে, সেবা করছে—ওই নিয়েইথাকে। কিছু মানে না, ভয় করে না। অন্য মেয়ে হ'লে এইসব পাড়াগাঁয়ে কত বদনাম রটত—গোসাঁইজির মেয়ে বলেসবাই মানে, তাই কেউ কিছু বলে না।

দিন-পনের কেটে গেল।

মালতীর বাবার ইতিহাস শুনে বুঝেছি আমি এখানেছ-মাস থাকলেও এরা আমায় চলে যেতে বলবেনা—বিশেষ ক'রে মালতী তো বলবেই না। কিন্তু আমারপক্ষে থাকাও যেমন অসম্ভব হয়ে উঠছে, চলে যাওয়া তারচেয়েও অসম্ভব যে ! মালতীকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি ওর বাবার পরিচয় শুনে পর্যন্ত। মালতীর বাবার মত লোকের সন্ধান কত ঘুরেছি, এতদিন পরে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হ'ল না। জগতের সকল নিঃস্বার্থনিঃসম্পর্ক লোক পরস্পরের সগোত্র—তা সে লোকগঙ্গাতীরে নবদ্বীপের আকাশেই প্রথম দিনের আলো দেখুনকিংবা দেখুন কপিলাবস্ত্র বা প্যালেস্টাইনবা আসিসিরওপরকার ইতালির ইন্দ্রনীল আকাশের তলে।

মালতীকে কত কথা বলবার আছে ভাবি কিন্তু ওর সঙ্গেআর আমার তেমন নির্জনে দেখা হয় না। আমি দেখিমালতীর আশাতেই আমি সারাদিন বসে থাকি—ও কখনআসবে। ও থাকে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত—হয়তদেখলাম ঘর থেকে ও বার হ'ল, ভাবি আমার কাছেই আসছে বুঝি—কিন্তু তা না এসে থালা-হাতে কাকে ভাতদিতে গেল। নয়ত আলনাতে কাপড় টাঙাতে ব্যস্ত আছে।হয়ত একবার থাকতে না পেরে ডেকে বলি—ও মালতী—

মালতী বললে—আসছি।

আমি বসেই আছি, বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ও এলকই ?

দিনগুলো প্রায়ই এই রকম। তা ছাড়া আমার ওপর ওরকোন বিশেষ পক্ষপাত আছে ব'লে আমার মনে হয় না।প্রথম দিনকতক যে সে রকম ধারণা না হয়েছিল এমন নয়।কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। সকলকে যেমন যত্ন করে,আমাকেও তেমনি করে।

একদিন ব'সে উদ্ধবদাসের একতারা মেরামতকরছি—মালতী দেখতে পেয়ে উঠানের ও-কোণ থেকেচঞ্চলপদে এসে সামনে দাঁড়াল। সকৌতুক সুরে বললে—ও !কাকার সেই একতারাটা ?আপনি সারাচ্ছেন নাকি ?কিজানেন আপনি একতারা সারানোর ?

আমি অপ্রতিভ না হয়ে বললাম—জানাজানির কি আছেএতে ?খানিকটা তার হাতে এসেছিল—তাই পরিয়ে দিচ্ছি।কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে চোখ তুলে চাইতেইওর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনেহ'ল মালতীকে এখানে একা নিঃসহায়, নির্বাক, রিজ্জবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওর এখানে কে আছে ?একপাল অনাত্মীয়, অশিক্ষিত গঁয়ো বৈষ্ণবেরমেলার মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যাব কি ক'রে ?তারা ওরকেউ নয়। তারা ওকে বুঝবে না। তার চেয়ে আমার মনেরদেশে ও আমার অনেক আপন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী।

ভাবলাম মালতীকে সব কথা বলি। বলি, মালতী, সংসারে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তুমিসাধু বাপের সতী মেয়ে, তোমার সংসার-বিবাগীআপন-ভোলা বাপের আশীর্বাদ ওই শ্যামসুন্দর তমালতরু ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে জানি, কিন্তু আমিওযে-সন্ধানে বেরিয়েছি, সে-সন্ধান সফল হবে না তুমি যদিপাশে এসে না দাঁড়াও।

কিন্তু তার বদলে বললাম—ভাল কথা মালতী, তোমাকেঅনেক দিন থেকে বলব ভাবছি। উদ্ধব বাবাজিকে বললামআমায় এখানে একটা পাঠশালা করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার ?আমার কিছু হয় তা থেকে।

মালতী এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। ওর মুখেরপাশটা দেখা যাচ্ছে, একটা সুকুমার লাভণ্য যেন ওর মুখেরচারিপাশে ঘিরে আছে—এক ধরনের সুন্দর মুখ আছে, মনেহয় যেন তাদের মুখের চারিপাশে একটা অদৃশ্য সৌন্দর্যজালের বেষ্টিত রয়েছে, যখন কথা না বলে চুপ ক'রেথাকে, তখন তাদের মুখের এই ভাবটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটেওঠে—মালতীর মুখ সেই ধরনের। আমার কথায় ওরমুখচোখ চিন্তাকুল হয়ে উঠল, যেন কি একটা বিষম সমস্যাতার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছি। বললে—কিন্তু এখানে যাভেবে করবেন, তার কিছু হবে না। এখানে মাইনে দেবে নাকেউ। এখানে ভদ্রলোক নেই। দ্বারবাসিনীতে কামারেরআছে, ওদের কলকাতায় গাড়ির কারখানা, সেইখানেইথাকে। সরকারেরা তিন বছর পরে এসেছিল পুজোর সময়দেশে।—তারপর হেসে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলিয়েবললে—ধান নিয়ে ছেলে পড়াতে পারবেন ?এদেশেমাইনের বদলে ধান দেয়। নাঃ, সে-সব আপনার কাজ নয়।তা আপনি তো এখানে জলে পড়ে নেই ?হাতে কিছু নেই, একদিন হবেই। যতদিন না হয়, এখানে থাকুন। আপনাকে এবস্থায় কোথাও যেতে দেব না। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছেবোধ হয়, না ?সত্যি কথা বলুন।

—সত্যি কথা কি সব সময় বলা যায় মালতী ?

—কেন, বলুন না কি বলবেন ?

—এখন থাক্, আমার কাজ আছে। শোন, উদ্ধবদাসের একতারাটা এখানে রইল, ব'লো তাকে। তোমার জন্যে সারানো হ'ল না।

মালতী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে—কোথায় যাবেন ? শুনুন। বা রে, অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি !

বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এই এক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে আমার চোখে। মালতী ও-কথা বললে কেন যে, আপনাকে এ অবস্থায় কোথায় যেতে দিতে পারব না ?— এই সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে— কিন্তু মালতীর মুখের একটি কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন ?

ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত—মাঠের মধ্যে নির্জন নদীর ধারে শুয়ে যেমন হয়েছিল সেদিন। অনুভূতি হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই দেখলুম। কোথায় সেই বিরাট দেবতা, আর কোথায় সেই মালতী !

তারপর দিন-কতক মালতীর সঙ্গে কি জানি কেন আমার প্রায়ই দেখা হয়। সময়ে অসময়ে, কারণে-অকারণে ও আমার সামনে যখনই এসে পড়ে কিংবা কাছ দিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দুটো কথা না বলে যায় না। হয়ত অতি তুচ্ছ কথা—বসে আছি, সামনে দিয়ে যাবার সময় ব'লেগেল—বসে আছেন ? এ-কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই—কিন্তু সারাদিনের এই টুকরো টুকরো অকারণ কথা, একটুখানি হাসি, কৃত্রিম শ্লেষ, কখনো বা শুধু চাহনি...এর মধ্যে দিয়ে ওর কাছে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই—ও আমার কাছে এগিয়ে আসে। এতে ক'রে বুঝি ও আমার অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না—ও আমার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ পায়।

বিকেলে যখন ওর সঙ্গে এক-এক দিন গল্প করি, তখন দেখি ওর মনের চমৎকার একটা সজীবতা আছে। নিজেবেশি কথা বলতে ভালবাসে না—কিন্তু শ্রোতা হিসাবে সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। যে-কোনো বিষয়ে ওর কৌতূহল জাগানো যায়—মনের দিক থেকে সেটা বড় একটা গুণ। এমনভাবে সেকৌতূহল ডাগর চোখ দুটি তুলে একমনে সে শুনবে—তাতে যে বলছে তার মনে আরও নতুন নতুন কথা যোগায়, ওকে আরও বিস্মিত করবার ইচ্ছে হয়।

মালতী বড় চাপা মেয়ে কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন উদ্ধবের মুখে শুনলাম যে ও বেশ সংস্কৃত জানে। ওর বাবার এক বন্ধু ত্রিগুণাচরণ কাব্যতীর্থ নাকি শেষ বয়সে এই আখড়ায় ছিলেন, এইখানেই মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না—মালতীর বাবা তখন বেঁচে—তিনিই এখানে তাঁকে আশ্রয় দেন। ত্রিগুণা-পণ্ডিতেরই কাছে মালতী তিন-চার বছর সংস্কৃত পড়েছিল। মালতীকে জিজ্ঞেস করতেই মালতী বললে—এখন আর ও সব চর্চা নেই, ভুলে গিয়েছি। সামান্য একটা ধাতুর রূপও মনে নেই। তবে রঘুর শ্লোক অনেক মুখস্থ আছে, যা যা ভাল লেগেছিল তাই কিছু কিছু মুখস্থ করেছিলাম, সেইগুলো ভুলিনি। তবে সহজ ভাষা যদি হয়, পড়লে মানেটা খানিকটা বুঝতে পারি। সে এমন কিছু হাতি-ঘোড়া নয় ! উদ্ধবজ্যাঠা আবার তাই আপনাকে গিয়েছে বলতে—উদ্ধবজ্যাঠার যা কাণ্ড !

বৈষ্ণব-ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন কিছুই মানে না—এই ভাবের। কখনও কোনও পূজা-অর্চনা ওকে করতে দেখিনি, এক ওর বাবার বিষ্ণু মন্দিরে প্রদীপ দেখানো ছাড়া। আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার যোগাড় করে উদ্ধব নিজে, মালতীকে সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতে দেখিনি। তা ব'লে ওর মন ওর বাপের মত সংস্কারমুক্তও নয়। ছোটখাটো বাছ-বিচার এতমানে যে, আখড়ার লোকে অতিষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে তুলেছিল ব'লে একটি বাবাজিকে মালতীর কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই বড়-একটানেই—মুচির ছেলেকেও ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, কাণ্ডা পাড়ায় অসুখ হ'লে সাবু ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে আসতে দেখেছি।

একদিন বিকেলে আখড়ার সামনের মাঠে পাঠশালা করছি, মালতী এসে বললে—দিন আজ ওদের ছুটি। আসুন একটা জিনিস দেখিয়ে আনি।

আখড়ার পাশে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে একটা রাঙা মাটির টিলা। তার ওপর শাল-পলাশের বন—টিলার নীচে ঘন বনসিদ্ধির জঙ্গল। টিলার ওপারে পলাশবনের আড়ালে একটা ছোট মন্দির। মালতী বললে—এই দেখাতে আনলাম আপনাকে। নন্দিকেশ্বর শিবের মন্দির—বড় জাগ্রত ঠাকুর—খ্রিস্টান হ'লেও মাথাটা নোয়ান—দোষ হবে না।

মন্দিরের পূজারি দু'খানা বাতাসা দিয়ে আমাদের জলদিলে। সে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ, উপাধি মহান্তি, বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা জানে ভাল। মালতীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে।

তারপর আমরা তিনজনেই মন্দিরের পশ্চিম দিকেররোয়াকে বসলুম। মালতী বললে—মহাস্ত-কাকা, বলুন তো এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা ঐকে। ইনি আবার খ্রিস্টান কিনা, ওসব মানেন না—

আমি বললুম—আঃ, কেন বাজে বকছ মালতী ?কি মানি না-মানি—মানে প্রত্যেক মানুষের—

মালতী আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—আপনার বক্তৃতা রাখুন। শুনুন, এটা খুব আশ্চর্যকথা—বলুন তো মহান্তি-কাকা ?

মহান্তি বললে—এইখানে আগে গোয়ালাদের বাগানছিল, বছর-পঞ্চাশ আগেকার কথা। রোজ তাদের দুধ চুরিয়েত। দু-তিনটে গরু সকালে একদম দুধ দিত না। একদিনতারা রাত জেগে রইল। গভীর নিশুতি রাতে দেখে টিলার নীচের ওই বনসিদ্ধির জঙ্গল থেকে কে এক ছোকরা বারহয়ে গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাচ্ছে। যে-সব গরু বাছুরভিন্ন পানায় না, তারাও বেশ দুধ দিচ্ছে। ছোকরার রূপদেখে ওরা কি জানি কি বুঝলে, কোন গোলমাল করলে না; ছোকরাও দুধ খেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরের দিন সকালে বনে খোঁজ ক'রে দেখে কিছুই না। খুঁজতে খুঁজতে এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। ওই যে শিবলিঙ্গদেখছেন মন্দিরের মধ্যে। মাঘ মাসে মেলা হয়—ভারি জাগ্রত ঠাকুর।

মালতী গর্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলেনপাদ্রিমশাই ?মানেন না যে বড় কিছু ?

আমি বললাম—আমি বেড়াতে বেড়াতে অনেক জায়গায়এ-রকম দেখেছি। কত গাঁয়ে প্রাচীন বটতলায় নুড়ি, ষষ্ঠীদেবী, ওলাদেবী, কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠার মূলে এই ধরনেরপ্রবাদ আছে। লোকে কত দূর থেকে এসে পূজো দেয়, তাদেরমধ্যে সত্যকার ভক্তি দেখেছি। এক পাড়াগাঁয়ের বোষ্টমেরআখড়ায় একখানা পাথর দেখেছিলাম—তার ওপরে পায়েরচিহ্ন খোদাই করা, আখড়ার অধিকারী পয়সার লোভেযাত্রীদের বলতো ওটা খোদা শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দাগ, সেবন্দাবন থেকে সংগ্রহ করে এনেছে পাথরখানা। আমিদেখেছি একটি তরুণী ভক্তিমতী পল্লীবধূকে চোখের জলেআকুল হয়ে পাথরটা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের মাথার লম্বাচুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে। কি জানি কোথায় পৌঁছলো ওরপ্রণাম। কোন্ উর্ধ্বমূল অধোশাখ দেবতা ওর সেবা গ্রহণকরতে সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুপল্লবিত বাছ ?

কি অপূর্ব সূর্যাস্ত হচ্ছে বিশাল পশ্চিম দিগন্তে ! দূরেরতালগাছের মাথাগুলো যেন বাঁধাকপির মত ছোট দেখাচ্ছে, গুঁড়িগুলো দেখাচ্ছে যেন সরু সরু নলখাগড়ার ডাঁটা—আরতার ওপরকার নীলাকাশে রঙিন মেঘলোকে পিঙ্গলবর্ণেরপাহাড়, সমুদ্র, কোন্ স্বপ্নসাগরের অজানা বেলাভূমি।...পায়ের নীচের মাটি সারাদিন রোদে পুড়েছে—বাতাসেতারই সুগন্ধ।

মালতী বললে—বিষ্ণুমন্দিরে সাঁজ জ্বলেনি এখনও।প্রদীপ দিইগে চলুন—

সেখানে ওর বাবার মন্দিরে প্রদীপ দেওয়া হয়ে গেল।আমি পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের মোটা শেকড়ে বসলুম, ও দাঁড়িয়ে রইল। বললাম—আমায় তুমি যে খ্রিস্টান বল, তুমিআমার কথা কিছু জান না। তারপর ওকে আমারবাল্যজীবন, মিশনারী মেমদের কথা, আমাদের দারিদ্র্য, মাসীতা ও দাদার কথা সব বললাম। বিশেষ ক'রে উল্লেখকরলাম আমার সেই দৃষ্টিশক্তির কথাটা—যা এখনহারিয়েছি। ছেলেবেলার ঘটনা আমার এখন আর তেমনমনে নেই—তবুও বললাম যা মনে ছিল—যেমনচা-বাগানের দু-একটা ঘটনা, বাল্যে পানির মৃত্যুদিনেরব্যাপার, হীরু রায়ের মৃত্যুর কথা, মেজবাবুর পুত্রসন্তান হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার।

বললাম—যীশুখ্রিস্টকে ভক্তি করি ব'লে অনেক লাঞ্ছনাসহ্য করেছি জীবনে। কিন্তু সে আমার দোষ নয়, ছেলেবেলার শিক্ষা। ওই আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলাম। আমি এখনও তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর কথা কিছু জান না—বুদ্ধচৈতন্য যেমনি মহাপুরুষ, তিনিও তেমনি। মহাপুরুষদের কিজাত আছে মালতী ?কর আদায় করতো লেভি, ইহুদিসমাজে সে ছিল নীচ, পতিত, সমাজের ঘৃণ্য। সবাইতাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। যীশু তাকেবললেন—লেভি, তুমি নীচ কে বলে ?তুমি ভগবানেরসন্তান। লেভি আনন্দে কেঁদে ফেললে। সমাজের যত হেয়লোককে তিনি কোল দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ্যা ছিল, জালজীবী ছিল, কুষ্ঠী ছিল। তাঁকে সবাই বলতো পাগল, ধর্মহীন, আচারভ্রষ্ট। তাঁর বাপ, মা, ভাই আপনার জনওতাকে বলতো পাগল—তারা জানত না ঈশ্বরকে যেজেনেছে, তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম সেবার ধর্ম।

তারপর আমি ওকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথাবললাম। পুকুরের ওপারে দূরবিসর্পিত আকাশের দিকে চোখেরেখে আমার মনে এল যে রাঢ়দেশের এই সীমাহীন রাঙামাটির মাঠের মধ্যে সেদিন আমি অন্য এক দেবতারস্বপ্ন দেখেছি। সে কি বিরাট রূপ ! ওই রাঙা গোখুলির মেঘে, বর্ণে, আকাশে তাঁর ছবি। তাঁর আসন সর্বত্র—তালের সারিতে, তমাল-নিকুঞ্জ, পুকুরে-ফোটা মৃগালদলে, দুঃখে শোকে, মানুষের মুখের লাভণ্যে, শিশুর হাসিতে... সে একঅদ্ভুত দেবতা ! কিন্তু কতটুকুই বা সে অনুভূতি হ'ল ! যেমনআসা অমনি মিলিয়ে যাওয়া !...

মালতী, আগেই বলেছি, অদ্ভুত শ্রোতা। সে কি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলে যখন আমি বকে গেলুম। চূপক'রে রইল অনেকক্ষণ, যেন কি ভাবছে।

তারপর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথাবলি। প্রেম ও সেবার ধর্ম কি শুধু যীশুখ্রিস্টের দেওয়া ?আমাদের দেশে ওসব বুঝি বলেনি ?আমাদের আখড়ায়লোচনদাস বাবাজি ছিলেন, ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর পথ থেকেবুকে ক'রে তুলে আনতেন। একবার একটা ষাঁড়ের শিংভেঙে গিয়েছিল, ঘায়ে পোকা থুক থুক করছে, গন্ধে কাছিয়াওয়া যায় না। লোচনজ্যাঠা তাকে জোর ক'রে পেড়েপেলে ঘা থেকে লম্বা লম্বা পোকা বার ক'রে ফিনাইল দিয়েদিতেন ন্যাকড়া ক'রে। তাতেই এক মাস পরে ঘা সারলো।

—এ-সব কথা বলার দরকার করে না, মালতী। আমিতোমাকে বলেছি তো ধর্মের দেশকাল নেই, মহাপুরুষদের জাত নেই। যখন শুনি তোমার বাবা গরিব প্রতিবেশীদেরমেয়ের বিয়েতে নিজের বাড়ি থেকে দানসামগ্রী বাসন বারক'রে দিতেন—দিতে দিতে পৈতৃক আমলের বাসনের বড়সিন্দুক খালি ক'রে ফেলেছিলেন—তখনই আমি বুঝেছিভগবান সব দেশেই অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর বাণী প্রচারকরেছেন, কোন বিশেষ দেশ বা জাতের ওপর তাঁর পক্ষপাতনেই। মানুষের বুকের মধ্যে বসে তিনি কথা কন, আর যারকান আছে, সে শুনতে পায়।

ওর বাবার কথায় ওর চোখে জল ভরে এল। অন্যমনস্কহয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দেখেছি মালতীশুষ্কচোখে কখনও ওর বাপের কথা শুনতে পারে না। সন্ধ্যাহয়েছে। উঠছি এমন সময় তমালছায়ায় বিষ্ণুমন্দিরের দিকে আর একবার চোখ পড়তেই আমাদের গ্রামের পুকুরপাড়ের বটতলার সেই হাতভাঙা পরিত্যক্ত সুন্দর বিষ্ণুমূর্তির কথা আমার কেমন ক'রে মনে এল। মনে এল ছেলেবেলায় সীতা আর আমি কত ফুলের মালা গেঁথে মূর্তির গলায়পরিয়েছি—তারপর আর কতদিন সেদিকে যাইনি, কি জানিমূর্তিটার আজকাল কি দশা হয়েছে, সেইখানে আছে কিনা, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম যেন, মালতী কি একটা কথা বললে, তা আমার কানেই গেল না ভাল ক'রে। বা রে, পুকুরপাড়ের সে ভাঙা দেবমূর্তির সঙ্গে আমার কিসেরসম্পর্ক ?

বিষ্ণুমন্দির থেকে দু-জনে যখন ফিরছি, আখড়ায় তখনআরতি আরম্ভ হয়েছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠের প্রান্তে গাছপালার অন্তরালবর্তী এই নিভৃত ছোট দেবালয়টির সন্ধ্যারতি প্রতিদিনই আমায় কেমন একটা অপূর্বভাবেঅনুপ্রাণিত করত—আজ কিন্তু আমার আনন্দ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেল। তার ওপর আজ একজন পথিক বৈষ্ণবজীবগোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী একতরায় অতি সুস্বরেগাইলে—আমার মানসবন্দাবনের বংশীবটমূলে কিশোর হরিচিরকাল বাঁশী বাজান, আমার প্রাণের গোষ্ঠে তাঁর ধেনুদলচরে; সেখানে তাঁর খেলাধুলো চলে রাখালবালকদের নিয়েদীর্ঘ সারাদিন, দীর্ঘ সারারাত।

কেন এত আনন্দ আমার মনে এল কে বলবে ?আমিযেন অন্য জন্ম গ্রহণ করেছি। ঘুম আর আসে না—সে গভীর রাত্রে তমালশাখার আড়ালে চাঁদ অস্ত গলে আমি আখড়ার সামনে মাঠে গাছের তলায় এসে বসলুম।

আকাশের অন্ধকার দূর করেছে শুধু জ্বলজ্বলে শুকতারার আলোয়। কে জানে হয়ত এই শুকতারার দেশের নদীতীরে, জ্যোৎস্নামাখা বনপ্রান্তরে, উপবনে মৃত্যুহীন জরাহীনদেবকন্যারা মন্দারবীথির ঘন ছায়ায় প্রণয়ীজনের সঙ্গে গোপনে মিলনে সারারাত্রি কাটায়... তৃপ্তিহীন অমর প্রেমতাদের চোখের জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে, লজ্জাভরা হাসিতেধরা দেয়। পীত সূর্যাস্তের আলোয় করুণ সুরে বহুদূরের শূন্যবেয়ে সেখানে ভেসে এসে সাক্ষ্য আকাশকে আরও মধুর ক'রে তোলে—কোথা থেকে সে সুর আসে কেউ জানেনা...কেউ বলে বহু দূরের কোন্ নক্ষত্রলোকে এক বিরহীদেবতা একা বসে বসে এমনি তাঁর বীণা বাজান, সেই সুরভেসে আসে প্রতি সন্ধ্যায়...ঠিক কেউ বলতে পারে না...কেবল আধ-আলো আধ-ছায়ায় পুষ্পবীথিতে লুকিয়ে বসে সুখী প্রেমিক-প্রেমিকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে...তাদেরচোখে অকারণে জল এসে পড়ে...অবাক হয়ে তারাপরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আমার সামনে অস্পষ্ট অন্ধকারে একজন তরুণযুবক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে—এস আমার সঙ্গে—

তার গেরুয়া উত্তরীয় আমার গায়ে এসে পড়ছে উড়ে।আমি বলি—কোথায় যাব ?কে আপনি ?

নবীন বৈষ্ণব বললে—আমি জীবগোস্বামী—আমারই পদাবলী তুমি সন্ধেবেলা শুনেচ যে। এত শীগগির ভুলে যাও কেন হে ছোকরা ?এস আমি বৃন্দাবনে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়া চাই।

—আপনি তো মারা গিয়েছেন আজ তিন-শো বছরেরওপর। আপনি আবার কোথায় ?

—পাগল ! কে বলে আমি মরেছি ?আর মলেই কিআমার যাওয়া ফুরিয়েছে নাকি ?এসো...এসো...আমিসংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি তাঁর জন্যে। দেখছ না পাগলহয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি ?

এমনভাবে কথাগুলো সে বললে আমি যেন শিউরেউঠলুম। বললাম—তা তো দেখতে পাচ্ছি, পাগলের আরবাকি কি ?আপনি যান, আমি যীশুখৃস্টের ভক্ত, আমিবৃন্দাবনে যাব না। তাছাড়া মালতীকে ফেলে এক পা-ওএখান থেকে নড়ছি নে আমি।

তরুণ বাউল হেসে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেল—পথের মাঝে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে, যেতেযেতে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল...অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার গলার মিষ্টি সুর তখনও যেন ভেসে আসছে...

মধু রিপুরুপমুদারম্

মধু রিপুরুপমুদারম্।

সুখদং সুখদং ভবসারম্

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। গাছের গুঁড়িতে হেলানদিয়ে শেষরাতের ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কেজানে—শিশিরে কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে। ফরসাহবার আর দেরি নেই।

দেখতে দেখতে এখানে ছ-সাত মাস হয়ে গেল। এখানেসময় কাটে কোথা দিয়ে বুঝতে পারি নে। সকালে আখড়ারকাজ করি, বিকেলে গোটাকতক ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালাকরি, তাতে যা পাই উদ্ধব বাবাজীর হাতে তুলে দিই। একদিন মালতী আমায় বললে—ছেলে পড়িয়ে যা পান, তাআপনি উদ্ধব জ্যাঠার হাতে দেন কেন? থাকা-খাওয়ার দরুন টাকা নেওয়া তো এখানে নিয়ম নেই, ও-টাকা আপনি নিজে রেখে দেবেন, আপনারও তো নিজের টাকার দরকার আছে। আমি বললাম—তা কি করে হয় মালতী, আমি এমনি খেতেপারি নে। আর আমি তো খাওয়া থাকা ব'লে টাকা দিই নে, বিগ্রহের সেবার জন্যে দিই। এতে দোষ কি ?

সেদিন মালতী আর কিছু বললে না। দিন-চারেক পরেআবার এক দিন ওই কথাই তুললে। টাকা আমি কেন দিই ? আখড়া তো হোটেলখানা নয় যে এখানে টাকা দিয়ে খেতেহবে ? ওতে তার মনে বাধে। তা ছাড়া আমার তো টাকারদরকার আছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি, টাকা না দিতে দিলে আমার এখানে থাকা হবে না। চলে যেতে হবে।

সেদিন থেকে মালতী এ নিয়ে আর কিছু বলে নি।

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলো অদ্ভুত কাটে।—দীঘির পাড়ে রাঙামাটির উঁচু বাঁধে এ-সময়ে একরকম ফুল ফোটে, ছায়া প'ড়ে এলে মাঝে মাঝে একা গিয়ে বসি। বাগ্‌দীদের মেয়েরাহাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে মাছ ধরে, আখড়ার গোয়াল থেকেসাঁজালের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওঠে—তালের দীর্ঘসারির ফাঁকদিয়ে এই সন্ধ্যায় কতদূর দেখতে পাই—দাদার দোকান, দাদার বাতাসার কারখানা, সীতার শ্বশুরবাড়ি, তুষারাবৃতকাঞ্চনজঙ্ঘা, নিমচাঁদের বৌ, শৈলদি।..

মালতীর স্বভাব কি মধুর ! কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায়—এতদিন উঁচু কথা শুনি নি ওর মুখে—কারওপরে রাগ দেখি নি—বাপের মেয়ে বটে !

আখড়ায় ছোট একটা অশ্বখ-চারা আছে, উদ্ধবদাস রোজ স্নান ক'রে এসে গাছটা প্রদক্ষিণ করে, গাছটাকে জল দেয়। এ তার রোজ করাই চাই। একদিন মালতীকে ডেকেবলি—তোমার উদ্ধব জ্যাঠা পাগল নাকি ? ও-গাছটারচারিপাশে ঘোরার মানে কি ? মালতী বললে—কেন ঘুরবে; সবাই তো আর আপনার মত নাস্তিক না। অশ্বখগাছনারায়ণ—ওর সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়—জানেন কিছু ?

আমি বললুম—তাহ'লে তুমিও সেবাটা শুরু ক'রে পুণ্যিকিছু ক'রে নাও না সময় থাকতে ?

মালতী শাসনের সুরে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা থাক্। আপনি ও-রকম পরের জিনিস নিয়ে টিটকিরি দেন কেন ? ওদের ওই ভাল লাগে, করে। আপনার ভাল লাগে না, করবে না। তা নয়, সারাদিন কেবল এর খুঁত ওর খুঁত—ছি, আপনার এ স্বভাব সারবে কবে ?

বললাম—তোমার মত উপদেশ দেওয়ার মানুষের দেখাপেতাম যদি তাহ'লে এতদিন কি আর স্বভাব সারে না ? তসবই অদৃষ্ট !

কথা শেষ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেই মালতী রাগ ক'রেআমার সামনে থেকে উঠে গেল।

বিকলে কিন্তু ওকে আমার কাছেই আসতে হ'ল আবার। নিকটে নকাশিপাড়া গাঁয়ে একটা যাত্রার দল ছিল, তাদের অধিকারী এসে উদ্ধবদাসকে বলে—বাবাজী, তিন মাস ব'সে আছি, বায়না-পত্তর একদম বন্ধ। দল তো আর চলে না। কালনা থেকে ভাল বাজিয়ে এনেছিলাম—টোলকে যখনহাত দেবে, আঃ, যেন মেঘ ডাকচে, বাবাজী। তা আপনাদেরআখড়ায় এক দিন শ্যামসুন্দরজীউকে শুনিয়ে দিই। কিছু খরচদিতে হবে না, তেল তামাক আর কিছু জলখাবার—

—জলখাবার-টাবার হবে না পাল-মশায়। তা ছাড়া আসর খাটানো ওসব কে করে ? এখন থাক্।

মালতী আমায় এসে বললে—উদ্ধব জ্যাঠাকে বলুন, যাতে যাত্রাটা হয়। আমি জলখাবার দেব, জ্যাঠাকে সেজন্যে ভাবতে হবে না। আপনাকে কিন্তু আসরের ভার নিতে হবে।

আমি বললাম—আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি পারবনা।

মালতী মিনতির সুরে বললে—লক্ষ্মীটি, নিতেই হবে। যাত্রা যে আমি কতকাল শুনি নি ! দেশের দলটা উৎসাহ না পেলে নষ্ট হয়ে যাবে ! আপনি আসরের ভার নিলেই আমিওদের ব'লে পাঠাই।

—না, আমি পারবো না, সোজা কথা। তুমি ওবেলা ও-রকম রাগ ক'রে চলে গেলে কেন ?

—তাই রাগ হয়েছে বুঝি ? কথায় কথায় রাগ !

—রাগ জিনিস তোমার একচেটে যে ! আর কারও কিরাগ হ'তে আছে ?

—আচ্ছা, আমি আর কখনও ও-রকম করব না। আপনি বলুন ওদের, কেমন তো ?

যাত্রা হয়ে গেল—মালতী ওদের ছানা খাওয়ালে পেট ভ'রে। বললে—বাবা রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে খাওয়াতেন আর আমরা মুখ ফুটে যারা খেতে চাইছে, তাদের খাওয়াব না ? দলে ছোট ছোট ছেলেরা আছে, রাতজেগে চৌচিয়ে শুধু-মুখে ফিরে যাবে, এ কখনও হয় ?

মালতী অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েছে। সময় পেলেই বিকেলে আমার কাছে বই নিয়ে আসে, দুজনে পুকুরপাড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। আমার হয়েছে কি, সব সময়ওকে পেতে ইচ্ছে করে, নানা কথাবার্তায় ছল-ছুতোয় ওকে বেশীক্ষণ কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিকেলের দিকে ছাড়া সারাদিন ওর দেখা পাওয়া ভার। ওর কাছে বুদ্ধের কথা বলি, সেন্ট ফ্রান্সিসের কথা বলি। ও আমাকে শ্রীচৈতন্যের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনায়।

এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল মালতী বই লেখে। কি কাজে পুকুরের ঘাটে গিয়েছি দুপুরের পরে, দেখি বাঁধানো সিঁড়ির ওপর জামগাছের ছায়ায় একখানা খাতা পড়ে আছে—পাশেই দোয়াত কলম—খাতাখানা উল্টে দেখি মালতীর হাতের লেখা। এখানে ব'সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে গিয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল—না দেখে পারলাম না, প্রথমেই ওর গোটা গোটা মুজার ছাঁদে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখাঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

* * *

সদা হৃদয়কন্দরে স্কুরতু বঃ শচীনন্দনঃ

তার পরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা, বৃন্দাবনের প্রকৃতিবর্ণনা মাঝে মাঝে। খাতার ওপরে লেখা আছে—
“পাষাণ্ডলন-গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত।”

দেখছি এমন সময় মালতী কোথা থেকে ফিরে এসে আমার হাতে খাতা দেখে মহাব্যস্ত হয়ে বললে—ও কি ? ওদেখছেন কেন ? দিন আমার খাতা—

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম—এইখানে পড়ে ছিল, তাই দেখছিলাম কার খাতা—

—না, দিন—ও দেখবার জো নেই।

—যখন দেখে ফেলেছি তখন তার চারা নেই। কে জানতো তুমি কবি ! এ শ্লোকটা কিসের ? মালতী সলজ্জ সুরে বললে—চৈতন্যচরিতামৃতের। কেন দেখছেন, দিন—

—শোনো মালতী—লিখেছ এ বেশ ভাল কথাই। কিন্তু তোমার এ লেখা সেকলে ধরনের। পাষাণ্ডলনের অনুকরণে বই লিখলে একালে কে পড়বে ? তুমি আজকালকার কবিতার বই কিছু পড় নি বোধ হয় ?

মালতী আগ্রহের সুরে বললে—কোথায় পাওয়া যায়, আমায় দেবেন আনিয়ে ?আমি তো জানি নে আজকালকারকবিতার বই আছে—আনিয়ে দেবেন ?আমি দাম দেবো।

দাম দেওয়ার কথা বলাতে আমার মনে ঘা লাগল। মালতী কাছে থেকেও যেন দূরে। বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, ও একালেরও নয়, সেকালেরও নয়। এই পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোনো আধুনিকতার টেউ এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন যে আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরিহয় না। এমন সুন্দর চা করে, শ্রীরামপুরের শৈলদিরা অমনচা করতে পারত না। নিজে মাছমাংস খায় না কিন্তু আমার জন্যে এক দিন মাংস রাঁধলে রান্নাঘরের উনুনেই। আমায় প্রায়ই বলে—আপনি যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবেন। আপনি তো আর বৈষ্ণব হন নি যে মাছমাংস খাবেন না !আমায় বলবেন, আমি রোঁধে দেব এখন।

মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী বটে, কিন্তু সে সুশ্রী। ওর টান ক'রে বাঁধা চুলও ছেলেমানুষের মত মুখশ্রীর একটা নবীন, সতেজ সুকুমার লাবণ্য—বিশেষ ক'রে যখন মুখে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়, কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ উঁচু ক'রে হাসে—তখন সে বিজয়িনী, তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে সুন্দরী মৎস্যনারীর মত মুগ্ধ ক'রে কূলের কাছে অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অঁথে জলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর সেরূপ যখন-তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে দৈবাৎ হয়ত একবার চোখে পড়তে পারে। আমি একবার মাত্র দেখেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সারাদিন খররৌদ্র ও গুমটের পরেউত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ জুড়ে ফেললে এবং হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। আখড়ার বাইরেরমাঠে কাঠ, ধান, ছোলা, তুলো সব রোদে দেওয়া ছিল। কেউ তোলে নি, আখড়ায় আবার ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টাতে লোকজন কেউ নেই। আমিও ছিলাম না। মাঠের মধ্যে বেড়াছিলাম—ঝড় উঠতেই ছুটে আখড়ায় এসে দেখি মালতী একা মহাব্যস্ত অবস্থায় জিনিসপত্র তুলছে। আমায়দেখে বললে—দৌড়ে আলোটা জ্বলে আনুন, অন্ধকারে কিছু কি ছাই টের পাচ্ছি—সব উড়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি..

ওকে দেখলাম নতুন চোখে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সেএকবার এখানে একবার ওখানে বিদ্যুতের বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল—অদ্ভুত কাজ করবার শক্তি—দেখতে দেখতে সেই ঘোর অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ক্ষিপ্র নিপুণতার সঙ্গে অর্ধেক জিনিস তুলে দাওয়ায় নিয়ে এসে ফেললে। এদিকে আমি অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি নে দেখে ছুটেএসে বললে—কোথায় দেশলাই রেখেছিলেন মনে আছে ?কোথা থেকে হাতড়ে দেশলাই বার করলে—তার পরে সেইঝড়ের ঝাপটার মধ্যে আলো জ্বালা—সে এক কাণ্ড !অন্ধকারে দুজনে মিলে অনেক চেষ্টার পরে শেষে ওরইক্ষিপ্রতা ও কৌশলে আলো জ্বলল।

আলো জ্বলে আমার হাতে দেশলাই দিয়ে আমার মুখের অসহায় ভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলা কেমন এক ধরনের উঁচুক'রে হেসে উঠল—ছুটোছুটির ফলে কানের পাশের চুলআলুথালু হয়ে মুখের দু-পাশে পড়েছে, ফুল্ল শ্রমোজ্জ্বলগুণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে উজ্জ্বল কৌতুকেরহাসি—দুজনে মিলে আলো ধরাচ্ছি, ওর মুখ আমার মুখেরঅত্যন্ত কাছে—সেই মুহূর্তে আমি ওর দিকে চাইলাম—আমার মনে হ'ল মালতীকে এতদিন ঠিক দেখি নি, আমি ওকে নতুন রূপে দেখলাম, ওর বিজয়িনী নারীরূপে। মনে হ'ল মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্বসুন্দরী।—কিন্তু বেশীক্ষণ দেখার অবকাশ পেলাম না ওর সেরূপ। আলো জ্বলেই ও আবার ছুটল এবং আমার আনাড়িসাহায্যের অপেক্ষা না ক'রেই বাকী জিনিস আধ-ভেজা, আধ-শুকনো অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দাওয়ায় এনেজড়ো করলে।...

একদিনপুকুরে সকালের দিকে ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে মালতী গিয়ে পড়েছে গভীর জলে। সেই সময় আমিও জলে নেমেছি। আমি জানতাম না যে ও এ-সময়ে নাইতে এসেছে, কারণ সাধারণত ও স্নান করে অনেক বেলায়, আখড়ার কাজকর্ম মিটিয়ে। নাইতে নাইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মালতী নেই, তার ঘড়াওনেই। আমি প্রথমে ভাবলাম মাঝপুকুরে ইচ্ছে ক'রে ডুবদিয়েছে বোধ হয়। বিশেষত সে সাঁতার

জানে—কিন্তু খানিক পরে যখন ও উঠল না, তখন আমার ভয় হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি সেখানটাতে সাঁতার দিয়ে গেলাম, হাতড়ে দেখি মালতী নেই, ডুব দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ওকে পেলাম—চুলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে কেমন বেকায়দায়, অতিকষ্টে তাকে ভাসিয়ে নিজে ডুবে জল খেতে খেতে ডাঙার কাছে নিয়ে এলাম। মালতী তখন অর্ধ অচৈতন্য, আমার ডাক শুনে আখড়া থেকে সবাই ছুটে এল—মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ওর শরীর সুস্থ হ'ল। উদ্ধব বাবাজী বকলে, আমি বললাম, সবাই বকলে।

এই দিনটা থেকে ওর ওপর আমার একটা কি যেন মায়াপড়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলই মনে হতে লাগল ও এখানে নিঃসহায়, একেবারে একা। ও সবার জন্যে খেটেমরে। ওর বাপের ধানের জমির উপস্থিত আখড়াসুদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীরা ভোগ করছে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। ও সকলের ময়লা জামা-কাপড় কেচে বেড়াবে, ভাতরন্ধে খাওয়াবে—সর্বরকমে সেবা করবে, ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ওকে মুখের মিষ্টি তোষামোদে নাচিয়ে নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার ওপর সতের আনা বজায় রাখবে, কিন্তু ওর সুখ-দুঃখ কেউ দেখছে? এই যে আজ পুকুরের ঘাটে ডুবে মরে যাচ্ছিল আর একটু হলে—আমি যদি না থাকতাম!

ভগবান আমাকে এ কিসের মধ্যে এনে ফেললেন, এ কি জালে দিন-দিন জড়িয়ে পড়ছি। আমি! এদের আখড়াতে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁকে ওরা মানুষের মত সেবা করে। সকালবেলায় তাঁকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরের ভোগ তো আছেই। ভোগের পর দুপুরে বিগ্রহকে খাটে শুইয়ে মশারিটাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৈকালে বৈকালিক ভোগ দেওয়া হয়—ফল, মিষ্টান্ন। রাত্রে আবার খাটে শুইয়ে মশারিটাঙিয়ে দেয়—শীতের রাত্রে বিগ্রহের গায়ে লেপ, আশেপাশে বালিশ। উদ্ধবদাস বাবাজী সেদিন লাল শালুকাপড়ের ভাল লেপ করে এনেচে বিগ্রহের ব্যবহারের জন্যে—আগের লেপটা অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব পুতুল-খেলা দেখলে আমার হাসি পায়। সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বললাম—তোমাদের এতদিন হুঁশ ছিল না মালতী ছেঁড়া? লেপটা এই শীতে কিবলে দিতে ঠাকুরকে? যদি অসুখ-বিসুখ হ'ত এইতেপান্তরের মাঠে—না ডাক্তার, না কবিরাজ, দেখত কে তখন? ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড তোমাদের?

মালতী রাগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ও এ-সব কথা আর কাউকে ব'লে দেয় না ভাগ্যে, নইলে উদ্ধবদাস আখড়া থেকে আমায় বিদেয় দিতে এক বেলাও দেরি করত না। অনেক কথা আমি বলি ওদের আখড়া সম্বন্ধে, উদ্ধবদাস সম্বন্ধে—যা অপরের কানে উঠলে আমায় অপমানিত হয়ে বিদায় হ'তে হ'ত, কিন্তু মালতী কোন কথা প্রকাশ করে নিকোনদিন। আজকাল মালতী আমার দিকে একটু টেনে চললে সেটা অনেকের চক্ষুশূলের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—আমিতা বুঝি।

শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমার পাঠশালা গেল উঠে। আরআমার এখানে শুধু-হাতে থাকা অসম্ভব। মালতীকে একদিনবললাম—শোনো, আমি চলে যাচ্ছি মালতী—

সে অবাক হয়ে বললে—কেন চলে যাবেন ?

—কতদিন এসেছি ভাবো তো এখানে ? প্রায় দশ মাসহ'ল—

মালতী চুপ ক'রে থেকে বললে ঘুরে আবার আসবেনকবে ?

—ভগবান জানেন। না-ও আসতে পারি।

মালতীর মুখের স্বাভাবিক হাসি-হাসি ভাবটা যেন হঠাৎনিবে গেল। বললে—কেন আসবেন না ? আখড়ার কত কাজ বাকি আছে মনে নেই ?

ওর মুখ দেখে আমার আবার মনে হ'ল—ওর কেউ নেই, এখানে ও একেবারে একা। ওকে বুঝবার মানুষ এই গ্রাম্য অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে কে আছে ? আমার কাছেই ওর যা-কিছু অভিমান আবদার খাটে—ওর মধ্যে যে লীলাময়ী কিশোরী আছে, সে তার নারীত্বের দর্প, গর্ব ও অভিমান প্রকাশ ক'রে সুখ পায় একমাত্র আমার কাছে—আমি তা জানি। তা ছাড়া, ও এখনও বালিকা, ওর ওপর আমার মনে কি যে একটা অনুকম্পা জাগে... ওকে সকল দুঃখ, বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখি ইচ্ছা হয়। শ্রাবণ মাসে নীল মেঘের রাশি দ্বারবাসিনীর চারিধারের দিগন্তবিস্তৃত তালীবন-শোভা মাঠের ওপর দিয়ে উঠে যায় রোজ... আমি দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দেখে দেখে মনে কত কি অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ছোট্ট কোন কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘরে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতবো... আমরা দুজনে এমনি সব বর্ষা-মেদুর শ্রাবণ-দিনে ব'সে ব'সে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব। ওকে রাঁধতে দেব না, কাজ করতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—কত বিশ্বাসের কথা, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, সাধু-মোহন্তের কথা, আকাশের তারাদের কথা—ও আমায় বোঝাবে, আমি ওকে বোঝাবো।... কিন্তু তা হবার নয়। মালতী ওর বাপের আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—আমি অনেকবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে ওর মনের এ ইচ্ছা বুঝেছি। আমি ওকে চাই একান্ত আমার নিজস্ব-ভাবে—এখানে থাকলে ও দিনে রাতে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওকে সে-ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এই আখড়াই হয়েছে ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান। আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আমিও এখানে থাকতে পারব না চিরকাল। মালতীকে ভালবাসি, কিন্তু ওকে বিবাহ করে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল কি ক'রে কাটাবো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে ? আমি ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

এক দিনের ব্যাপারে মালতীকে আরও ভাল করেচিনলুম। দ্বারবাসিনী গ্রামের বৃদ্ধ শম্ভু বাঁড়ুয়ে চার-পাঁচদিনের জুরে মারা গেল। তিনি এখানকার সমাজের কাছে একঘরে ছিলেন—এটা আমি আগেই জানতাম। তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা নাকি উঠেছিল—তাই থেকে গ্রামে শম্ভু বাঁড়ুয়ে একঘরে হন। শম্ভু বাঁড়ুয়ে কোথাও যেতেন না, কারও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁরহাতেও দু-পয়সা ছিল—সবাই বলত টাকার গুমর।

বেলা পাঁচটার সময় মালতী এসে বললে—শুনেছেন ব্যাপার ? শম্ভু বাঁড়ুয়েকে এখনও বের করা হয়নি—আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। সেই দুপুর থেকে একজন লোকও ওদের বাড়ির উঠোন মড়াইনি। মড়াকোলে মেয়েটা দুপুরথেকে ব'সে আছে—ওর মা তো বাতে পঙ্গু, উঠতে পারেনা। আপনি আসুন, দু-জনে মড়া তো দোতলা থেকে নামাই—তার পর উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলেছি আখড়ারলোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে—ব্রাহ্মণের মড়া অপরজাতে ছুঁলে ওদের কষ্ট হবে—তাই চলুন আপনি আর আমি আগে নামাই—তার পর আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে অজয়ের ধারে—পারবেন তো ?

তিনজনে ধরাধরি করে সেই ঘোরানো ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মড়া নামানো—ওঃ সে এক কাণ্ড আর কি ! মালতী আর শম্ভু বাঁড়ুয়ের মেয়ে নীরদা এক দিকে—আমি অন্যদিকে। নীরদা দেখলুম খুব শক্ত মেয়ে—বয়সে মালতীর চেয়ে বড়—বছর বাইশ হবে ওর বয়স, মালতীর মতমেয়েলি গড়নের মেয়ে নয়, শক্ত, জোরালো হাত-পা, একটু পুরুষ-ধরনের; মালতী খুব ছোটোছুটি করতে পারে বটে, কিন্তু ওর গায়ে তেমনি শক্তি নেই। নীরদার সাহায্য না পেলে সেদিন শুধু মালতীকে দিয়ে মড়া নামানো সম্ভব হ'ত ব'লেমনে হয় না। শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের লোক এল এবং তারাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে গেলুম, মেয়েদের যেতে হ'ল না, মালতী রইল নীরদার কাছে। নীরদা আমায় বললে—দাদা, শ্রদ্ধের সময় কিন্তু আপনাকে সব ভার নিতে হবে। আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না। রুণিতো আছেই, আপনাকে অন্য কিছু খাটাবো না, ভাঁড়ারের ভার আপনাকে হাতে নিতে হবে, নইলে এ-সব পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার আপনি জানেন না।

বেশ ঘটা ক'রেই শ্রাদ্ধ হ'ল। মালতী বুক দিয়ে পড়ে কি খাটুনিটাই খাটলে ! মালতী, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। ঘুম নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বসা নেই—কিসে কাজসর্বাঙ্গসুন্দর হবে, কেউ নিন্দে করবে না ওদের, কোনও জিনিস অপচয় না হয় ওদের, সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। পরের কাজে এমনি ক'রে নিজেকে টেলে দিতে তুমি পারো তোমার বাবার রক্ত তোমার গায়ে বইছে বলে।

নীরদাকেও চিনলুম সেদিন।

রাত দশটা। রান্নাঘরের দরজার কাছে শূন্য ডালেরগামলা, লুচির ধামা, ডালনার বালতির মধ্যে নীরদা দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন কি খাটুনিই খেটেছে সে ! চরকির পাকঘুরেছে মালতীর সঙ্গে সমানে সেই সকাল থেকে—এর মধ্যে আবার পীড়িতা মায়ের দেখাশুনা করেছে ওপরে গিয়ে। ঘামে ও শ্রমে মুখ রাঙা (নীরদার রং বেশ ফর্সা), চুল আলুথালু হয়ে মুখের পাশে কপালে পড়েছে।

আমি বাইরের ক-জন লোককে খাওয়াব ব'লে কি আছে না—আছে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নীরদা বললে—দাদা, কিছু নেই আর; ক-জন লোক ? আচ্ছা দাঁড়ান, ময়দা মাখছি, দিচ্ছি ভেজে।

আমি বললুম—আর তুমি আঙনের তাতে যেও না নীরদা। তোমার চেহারা যা হয়েছে ! আচ্ছাদাঁড়াও—মালতীকে বলি একটু মিছরির শরবত তোমায় বরখদিতে—

নীরদা বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান দাদা। রুণি কতবার খাওয়াতে এসেছিল—সে কি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে ?

তারপর হেসে বললে—আজ যে একাদশী, দাদা।

আমার চোখে জল এল। আর কিছু বললাম না। মেয়েমানুষের মত সহ্য করতে পারে কোন্ জাত ? অনেক শিখলাম এদের কাছে এই ক-মাসে।

মাকে দেখেছি, বৌদিদিকে দেখেছি, সীতাকে দেখেছি, শৈলদিকে দেখেছি, এদেরও দেখলাম। অথচ এই নীরদাকে ভেবেছিলুম অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে ওর কথাবার্তায় রাঢ়দেশের টান বড় বেশি ব'লে।

মালতী আখড়ায় ফিরে এসে আমায় বললে—অনেকগুলো সন্দেহ এনেছি, খান—নীরদাদিদি জোর ক'রে দিলে। ভালসন্দেহ, দ্বারবাসিনীতে এ-রকম করতে পারে না, সিউড়ি থেকে আনানো।

তার পর কেমন এক ধরনের ভঙ্গি করে হাসতে হাসতে বললে—বসুন, ঠাঁই করে দিই আপনাকে। ও-বেলার লুচি আছে, দই আছে, নীরদাদিদি একরাশ খাবার দিয়েছে বেঁধে—

ওকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় এই—সব সময়ে !

ঘরে কেউ নেই, নিঃসঙ্কেচে আমার কাছে ব'সে ও আমায় খাওয়ালে—খেতে খেতে একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব স্নেহ-মমতামাখা দৃষ্টি ওর চোখে ! মালতীর কাছে এত ঘনিষ্ঠ যত্ন এই কিন্তু প্রথম। বললে—আমি কি আর দেখিনি যে আজ সারাদিন আপনি শুধু খেটেছেন আর পরিবেশন করেছেন, খাওয়া যা হয়েছিল ও-বেলায় আপনার, তার আমি সন্ধান রাখিনি ভেবেছেন ? খান,—না—ও লুচি ক-খানা খেতেই হবে।

খাবো কি, লুচি গলায় আটকে যেতে লাগল—সে কি অপূর্ব উল্লাস, আমার সারাদেহে কিসের যেন শিহরণ। আজ সারাদিনের ভূতগত খাটুনির মধ্যেও মালতী দৃষ্টি রেখেছিল আমি কি খেয়েছি না-খেয়েছি তার ওপর !

ঘন বর্ষা নামল। সারা মাঠ আঁধার ক’রে মেঘ রুপসি হয়ে উপুড় হয়ে আছে। এই সব দিনে মালতীকে সর্বদা কাছেপেতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে ঘরের কোণে বসে ওর সঙ্গে সারা দিনমান বাজে বকি। কিন্তু ও আসে না, এমনই সববর্ষার দিনে আখড়ার যত সব খুচরো কাজে ও ব্যস্ত থাকে।

দু-একবার যখন দেখা হয় তখন বলি—মালতী, আস নাকেন ?

মালতী বলে সে আসবে। তার পর এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টাকেটে যায়, ও আসে না। আমার রাগ হয়, অভিমান হয়। ও যদি আমার জন্যে একটুও ভাবত, তা’হলে কি আর না এসেপারত ? ওর কাছে কাজই বড়, আমি কেউ নই। কিন্তু হয়তঅপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মালতী এসে পড়ে। প্রায়ই বিকেলের দিকে, এমনকি সন্ধ্যার সময়। চুলটি টান-টানকরে বেঁধে পান খেয়ে ফুল্ল ওষ্ঠাধর রাঙা ক’রে হাসিমুখে আমার দাওয়ার সামনে এসে বলে—কি করছেন ?

—এস মালতী, সারাদিন দেখিনি যে ?

—আপনার কেবল—সারাদিন দেখিনি, আর, এই তখনডাকলুম এলে না কেন, আর, কেন আস না—এইসব বাজে কথা। আসি কখন ? দেখেছেন তো। খেয়ে উঠেছি এই তোঘণ্টাখানেক আগে। কাজ ছিল।

—কি কাজ ছিল আমি আর জানিনে মালতী ? উদ্ধব-বাবাজির কোণের ঘরে মেঝের চাটাই পেতে বসেতোমার সেই কবিতার বই লিখছিলে—আমি দেখিনি বুঝি ?

—বেশ, দেখেছেন তো দেখেছেন। আসুন বিষুঃমন্দিরেসন্ধে দেখিয়ে আসি—একা ভয় করে।

বাস্তবিকই আমি ওকে একমনে বই লিখতে দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখি। মালতী ঠিক পাগল, আচ্ছা, পাষাণদলনেরঅনুকরণে লেখা ওর বই কে পড়বে যে রাত নেই দিন নেইবই লিখছে ! ওর মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওই একখেয়াল ওর। মালতীর সঙ্গে বিষুঃমন্দিরে গেলাম। মালতীরএই এক গুণ, ও যখন মেশে তখন মেশে নিঃসঙ্কোচে, উদার ভাবে। সে-সম্বন্ধে কোনও বাধা বা সংস্কার ও মানে না। কেন এই সন্ধ্যাতে আমার সঙ্গে একা যাবে পুকুরপাড়েরবিষুঃমন্দিরে—এ-সব নিয়ে সঙ্কোচ নেই ওর। মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে হ’ল মালতীকে পেয়ে আমার এই বর্ষাসন্ধ্যাটি সার্থক হ’ল। ওকে ছেড়ে আর কিছু চাইনে। কাঞ্চনফুলতলায় গিয়ে বললাম—সেই গানটা গাও না, সেদিন গাইছিলে গুনগুন করে !

মালতী ছেলেমানুষের মত ভঙ্গিতে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠাযে শুনতে পাবেন ?

—তা পাবেন, পাবেন।

—তা পাবেন, পাবেন।

—তবে আসুন পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।

মালতীর মুখে গানটা বেশ লাগে—দু-তিনবার শুনলাম।

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা হৃদয়ে মোর রাধা-প্যারী

আমার বুকের কোমল ছায়ায় লুকিয়ে খেলে বনবিহারী।

গান শেষ হ’লে বললাম—শোনো কথাটা বলিমালতী, তুমি আস না কেন ? তোমাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ সারাদিন বসেছিলাম ঘরের দাওয়াতে, এমন বর্ষা গেল—তুমি চৌষট্টিবার আমার ঘরের সামনেদিয়ে যাও, একবার তো এলে পারতে ? তোমার সে-সব নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এই যে তোমাকে পেয়েছি, আরআমার যেন সব ভুল হয়ে গিয়েছে—সত্যি বলছি মালতী।

মালতী মুখ নীচু ক’রে হাসি-হাসি মুখে চুপ ক’রে রইল।

আমি বললাম—হাসলে চলবে না মালতী। কথার উত্তরদাও। তুমি কি ভাবো আমি তোমাদের এখানে পড়ে আছিখতে পাইনে বলে তাই ?তা নয়।

—কে বলেছে আপনাকে যে না খেতে পেয়ে এখানেআছেন ?আমি আপনাকে বলেছি নাকি ?

—যাক ওসব বাজে কথা। আমার কথার উত্তর দাও।

মালতী আবার ছেলেমানুষি আরম্ভ করলে। মুখ নীচুকরে হাঁটুর কাছে ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসিমুখে হাত দিয়েশানের ওপর কি আঁকজোক কাটতে লাগল, কখনই ওর কাছেআমার কথার সোজা জবাব পেলাম না।

এক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঁধের ওপর ব'সে আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলুম। আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যেনড়বার সাধ্য নেই এতটুকু। ও আমার সব কিছু ভুলিয়েদিয়েছে—যে উদ্দেশ্যে এই দু-বছর পথে পথে ঘুরেছি সেউদ্দেশ্য এখন হয়ে পড়েছে গৌণ। এখন মালতীই সব, মালতীই আমার বিশ্বের কেন্দ্র, ও যখন আসে তখন জীবনেআর কিছু চাইবার থাকে না, ও যেদিন আসে, যেদিন হেসেকথা বলে—আমার মত সুখী লোক সেদিন জগতে আরকেউ থাকে না,—মাঠের ওপর সূর্যাস্ত সেদিন নতুন রঙেরঙিন হয়, বিচালি-বোঝাই গাড়িগুলোর দ্বারবাসিনীর হাটের দিকে যায়, তাদের চাকার শব্দও ভাল লাগে, আখড়ার বাবাজিরা নিমগাছে উঠে নিমপাতা পাড়ে—সে-ইযেন এক নতুন দৃশ্য। মালতী যেদিন আসে না, কি ভালক'রে কথা বলে না, সারাদিন আমার মনে শান্তি থাকে না, ওরই কথা ভাবি সারাক্ষণ—কতক্ষণে দেখা হবে, কতক্ষণেকথা বলব। মালতী আমায় এমন জালেও জড়িয়েফেলেছে।

হয়ত আমি এখান থেকে যেতাম না—হয়ত শেষ পর্যন্ত থেকেই যেতে হ'ত—কিন্তু যেদিন মালতী আমার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে গান গাইলে তার পরদিনই দুপুরের পরে উদ্ধব-বাবাজি আমায় ডেকে বললে—একটা কথা বলি আপনাকে—কিছু মনে করবেন না। আপনার এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, আমাদের আখড়ার নিয়ম অনুসারে তিন দিন মাত্র এখানে অতিথ-বোষ্টমের থাকবার কথা। আপনার প্রায় এগারো মাস হল—

আমি চুপ ক'রে রইলাম, কারণ ওর মুখ দেখেই আমারমনে হ'ল এটা কথার ভূমিকা—আসল কথাটা এখনও বলেনি। ঘটলও তাই। একটু ইতস্তত ক'রে উদ্ধববললে—তাতেও কিছু না—কি জানেন, আপনার রুগির সঙ্গে এই মেলামেশাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আপনার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে বিকেলে ও গান গেয়েছিল—একথা নিয়েসবাই—বুঝলেন না, মেয়েমানুষের নামে দুর্নাম রটতে দেরিলাগে না। আমি ওর অভিভাবক—এসব যাতে না হয় আমার দেখা উচিত বলেই আপনাকে জানাচ্ছি এ-কথা। রুগি-মা সেরকম মেয়ে নয়। আমি সেটা খুবই জানি, কিন্তুলোকে তো—রাগ করবেন না, ভেবে দেখুন। লোকে যদিওর নামে পাঁচটা কথা ওঠায় বা বলে—সেটা আমার উচিত হতে না দেওয়া—নয় কি ?

আমি বললাম—সেটা আমার অন্যায হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি তোবলেছিলেন, মালতীর যদি ইচ্ছে হয়—ওর বাবার ওর ওপরআদেশ আছে।—

—কিন্তু ওর বাবা কণ্ঠধারী বৈষ্ণব ছিলেন—আপনিব্রাহ্মণ বটে, বৈষ্ণব নন, তার ওপর আপনি খৃস্টানি মতেরলোক, আপনার সঙ্গে কি ক'রে ওর বিয়ে হতে পারে ?... ওবৈষ্ণবের মেয়ে, বৈষ্ণবের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তবে মালতীর এতে কি ইচ্ছে জানুন, সে যদি বলে, আমারআপত্তি নেই—ওর বাবা ওরই ওপর সে ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওকে নির্জনে পেলাম। ওকেবললাম—একটা কথা বলব মালতী ?তুমি অভয় দেবে ?

মালতী কৌতুকের সুরে বললে—উঃ মাগো—যাত্রারদলের মত কথা শুনে আর বাঁচিনে। কি বলবেন বলুন না ?

—তুমি কি চিরকাল এই ভাবে জীবন কাটাবে ?না, হাসিখুশি না—দরকারি কথা। সবতাতেই হাস কেন—ভেবেদেখ আমি কি বলছি—

—কেন এ জায়গা কি খারাপ ?এমন চমৎকার মাঠ, দীঘি—আপনি সেদিন কি কবিতাটা বলছিলেন।

মালতী কথা শেষ না ক’রেই ছেলেমানুষি হাসি শুরু করলে। আমি বললাম—না মালতী, লক্ষ্মীটি ওভাবে কথা উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় চাই। তোমায় বিয়ে ক’রে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। কি বলো তুমি ?

মালতীর মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে এল—সে কেমন বিস্ময়বিহ্বল-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে—তার পরেই তারমুখেচোখে ঘনিয়ে এল লজ্জা। ওর এ ধরনের লজ্জা আমিকখনও দেখিনি।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। মালতীর মুখে উত্তর নেই। বললাম—ভেবে উত্তর দিও। এখুনি চাইনে তোমার উত্তর। তাড়াতাড়ি কিছু না বলাই ভাল।

মালতী এতক্ষণ মুখ নীচু ক’রে ছিল—এইবার মুখ তুলেকিন্তু অন্যদিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে যেতেহবে কেন ?

—ছেড়ে যেতে হবে এই জন্য মালতী যে, আমি তোতোমাকে এখানে আখড়ায় থাকতে দিতে পারব না। আমিওএখানে চিরদিন কাটাতে পারিনে।

মালতীর মুখের ভাবে আমার মনে হল আমার মুখেএ-কথা যেন ওর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ও কি ভেবেছে আমিওচিরকাল এই আখড়াতেই থেকে যাব ?ওর মুখ দেখে মনেহল আমার এ কথায় ও মনে বেদনা পেয়েছে। আমি কথাটায়তদূর সম্ভব নরম করতে পারা যায় ক’রে বললাম—তুমিএখনও ছেলেমানুষ ! নিজের সম্বন্ধে বিচার ক’রে দেখতেপাবার ক্ষমতা এখনও হয়নি। তুমি একা এখানে কি করবে বল ?উদ্ধব-বাবাজীও চিরকাল থাকবেন না। এই মাঠের মধ্যে আখড়ায় চিরজীবন কাটাতে একা একা ?

মালতী মুখ নীচু ক’রেই আস্তে আস্তে নরম সুরেবললে—বাবা মরণকালে এর ভার সঁপে দিয়েছিলেন উদ্ধব-জ্যাঠার ওপর নয়, আমারই ওপর। বাবার বিষ্ণুমন্দিরআমায় শেষ করে তুলতে হবে। উদ্ধব-বাবাজি চিরদিনথাকবেন না বলেই তো আমার এখানে আরও থাকাদরকার। বাবার ধানের জমি পাঁচজনে লুটেপুটে খাবে অথচআখড়ার দোর থেকে অতিথ-বোষ্টম গরিব লোকে ফিরেযাবে খেতে না পেয়ে, এ আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারবনা। তাতে কোথায় গিয়ে আমার শান্তি হবে ?

মালতীর মুখে এ ধরনের গম্ভীর কথা—বিশেষ করে ওর নিজের জীবন নিয়ে—এই প্রথম শুনলাম। সব জিনিস নিয়েও হালকা হাসি-ঠাট্টা ক’রে উড়িয়ে দেয়, এই ওর স্বভাব। ও এ ধরনের কথা বলতে পারে তা আমি ভাবিনি। বললাম—মালতী, এটা কি তোমার মনের কথা ?জীবনটাএই ক’রে কাটাতে ?এতেই শান্তি পাবে ?আমি যে প্রস্তাবকরেছি, তাতে তুমি রাজি নও ?কারণ আমি এখানে থাকতেপারব না চিরকাল এটা নিশ্চয়।

শেষ কথাটা বলতে আমার বুক বেদনায় টনটন ক’রেউঠল, তবুও বলতে হল।

মালতী অনেকক্ষণ বিমুখী হয়ে বসে রইল। কাপড়েরএকটা আঁচল পাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ছেলেমানুষের মতসেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেকক্ষণ। আমারমনে হল ও হয়ত কাঁদছে, নয়ত কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে।

তার পরে আমার দিকে একবার চেয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে বললে—কি করব বলুন, আমার অদৃষ্টে ভগবান এইলিখেছেন, এই আমায় করতে হবে।

আমার কেমন একটা অভিমান হ’ল,বললাম—এইতা’হলে তোমার শেষ কথা ?বেশ মালতী।

মালতী সে কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক’রে রইল মাথা নীচু ক’রে। আবার আমার মনে হ’লও কাঁদছে, কিংবা কান্নাচেপে রাখবার চেষ্টা করছে—একবার মনে হ’ল ওর ডাগরচোখ দুটি জলে ভ’রে এসেছে—কিন্তু অভিমানের আবেগেআমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না।

রাত্রে বাইরে ব’সে ভাবলুম। সারারাত্রিই ভাবলুম।

মালতীকে ছেড়েই যেতে হ'ল শেষ পর্যন্ত ?

ও না এক দিন আমায় বলেছিল...আখড়ার কত কাজবাকি আছে মনে নেই ?

আমার ওপর কিসের দাবিতে এ কথা বলেছিল ও ?

সে দাবি অগ্রাহ্য ক'রে নিষ্ঠুর ভাবে যাব চলে ?

যদি না যাই—তবে এখানে আখড়ার মোহন্ত সেজে চিরকাল থাকতে হবে। এই গ্রাম্য বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্ণ গভী ও আচার-সংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

নিস্তরু তারাভরা রাত্রি। দীঘির পার থেকে হু-হু হাওয়াবইছে।

নীল আকাশের দেবতা, যাঁর ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়, এইরকম তারাভরা অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে, তাঁকে পাওয়া আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়... যে দেবতা সকল ধর্মের অতীত, দেশকালের অতীত... যার বেদি যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাস্ত্রতনীলাকাশে অনন্ত নক্ষত্রদলের মধ্যে... মর্ত্যে ও অমর্ত্যে তাঁর বীণার দুই তার... আমার মনে হোমের আগুন তিনি প্রজ্জ্বলিত রাখুন সুদীর্ঘ যুগসমূহের মধ্যে... শাস্ত্রত সময়ব্যাপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড়, তাই দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাই। গভীর মধ্যে তিনি থাকেন না।

পরদিন খুব ভোরে—আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি—কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিসের সন্ধ্যানে বেরিয়েছি তা আমি জানিনে—আমার সে সন্ধ্যানের আশা আলেয়ার মত হয়ত আমাকে পথভ্রান্ত ক'রে পথ থেকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—শুধু আমি এইটুকু বুঝি যে, যে কোনও গভীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে তার প্রবুদ্ধমান রূপ ক্ষীণ হয়ে আসবে—আমার কাছে সেই সন্ধ্যানই সত্য—আর সব মিথ্যে, সব ছায়া।

লোচনদাসের আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন্দিকে যাব তার কিছুই ঠিক নেই। বর্ষাকাল কেটে গিয়েছে, আকাশ নির্মল, শরতের সাদা লঘু মেঘখণ্ড নীল আকাশবেয়ে উড়ে চলেছে, মণিহারী ঘাটের কাছে গঙ্গা পার হবার সময় দেখলুম গঙ্গার চরের কাশবনে কি অজস্র কাশফুলের মেলা ! খানিকটা রেল খানিকটা পায়ে হেঁটে এলাম কহলগাঁয়ে। গঙ্গার ধারে নির্জন স্থানটি বড় ভাল লাগল। স্টেশনের কাছেই পাহাড়, সামনে যে পাহাড়টা, তার ওপরে ডাকবাংলো—এখানে একটা রাত কাটলাম। ডাকবাংলোর কাছে কি চমৎকার এক প্রকার বন্যফুল ফুটেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে তার সুগন্ধে ডাকবাংলোর বারান্দা আমোদক'রে রেখেছে।

এক দিন কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে শুনলাম ক্রোশখানেকদূরে গঙ্গার ধারে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে একজন সাধু থাকেন। একখানা নৌকা ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। বটেশ্বরনাথপাহাড় দূর থেকে দেখেই আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গা আমি কমই দেখেছি, এখানে শান্তি ও আনন্দ পাব। গঙ্গার ধারে অনুচ্চ ছোট পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল, নানা ধরনের বুনো গাছ, এক ধরনের হলদে-পাপড়ি বড় বড় ফুল ফুটেছে পেয়ারাগাছের মত গাছে, নাম জানিনে। একটাবড় গুহা আছে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে জঙ্গলের মধ্যে। গুহার মুখের কাছে প্রাচীন একটা বটগাছ, বড় বড় বুরি নেমেছে, ঘন ছায়া, পাকা বটফল তলায় প'ড়ে আছেরাশি রাশি। সাধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, বাড়ি ছিল তাঁর মাদ্রাজে, কিছু কথাবার্তায় চেহারায় হিন্দুস্থানি। সাধুটি খুব ভাল লোক, লম্বাচওড়া কথা নেই মুখে, বাঙালি বাবু দেখে খুব খাতির করলেন। নিজে কাঠ কুড়িয়ে এনে চা করে খাওয়ালেন, আমার সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকুন, এখানে খরচ খুব কম। আমি এর আগে মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটেছিলাম, শহর বাজার জায়গা, এত খরচ পড়ত যে টিকতে পারলাম না। তাও বটে, আর দেখুন বাবুজি, সাধুরা চিড়িয়ারজাত, আজ এখানে, কাল ওখানে—এক জায়গায় কি ভাললাগে বেশি দিন ?

লোকজন বিশেষ নেই, স্থানটি অতিশয় নির্জন, কথাবলবার লোক নেই, তার প্রয়োজনও বোধ করি নেইবর্তমানে—সারাদিনের মধ্যে সন্ধ্যার সময় সাধুজির সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করি। এতদিন কোথাও যে-শান্তি পাইনি, এখানে তার দেখা মিলেছে। একদিন পাহাড়ের ওপরেবেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝুঁড়িপথ পেলাম।পাহাড়ের গা কেটে পথটা বার করা হয়েছে, ডাইনে উঁচুপাহাড়ের দেওয়ালটা, বাঁয়ে অনেক নীচে গঙ্গা, ঢালটাতে চামেলির বন, একটা প্রাচীন পুষ্পিত বকাইন গাছ পথেরধারে। কিছু দূর গিয়ে দেখি, পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা কতকগুলো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি—গভর্নমেন্টের নোটিশ টাঙানো আছে এই মূর্তিগুলো কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইত্যাদি। আমি জানতাম না এদের অস্তিত্ব। জায়গাটা অতি চমৎকার, সূর্যাস্তের সময় সেদিন পীরপৈঁতির অনুচ্চ শৈলমালার ওপরের আকাশটা লাল হয়ে উঠল, গঙ্গার বুকে আকাশজোড়া রঙিন মেঘমালার ছায়া, খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্তি গোধূলির চাপা আলোয় কেমন একটাঅনির্দেশ্য শ্রী ধারণ করেছে—সে শ্রী বড় অদ্ভুত, কোন মূর্তির নাক ভাঙা, কোনটার নাক নেই, বেশির ভাগ মূর্তিরই মুখ খসে গিয়েছে—কিন্তু গোধূলির রক্ত-পিঙ্গল আকাশের ছায়ায় যক্ষ্মণী যেন জীবন্ত হয়ে উঠল; পাথরে কাটা পীন স্তনযুগল যেন রক্তমাংসের ব'লে মনে হল, লুম্বিনী উদ্যানের ছায়াতরুগুলো শায়িতা আসন্নপ্রসবা মায়াদেবীরচোখের পলক যেন পড়ে পড়ে, তারপর চামেলির বন কালো হয়ে গেল, গঙ্গার বুকে নোঙর-করা বড় বড় কিস্তির মাঝিরাহনুমানজির ভজন গাইতে শুরু করে দিলে, পাহাড়ের পূর্বদিকে ছোট কেওলিন খনিটাতে মজুরদের ছুটির ঘণ্টা পড়ল—আমি তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছি।...রাঢ়দেশের মাঠে সেই খালের ধারের তালবনে সেদিন যেঅদ্ভুত ধরনের শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটা আবারপাবার আশায় কতক্ষণ অপেক্ষা করলুম—কিন্তু পেলাম কই ?তার বদলে একটা ছবি মনে এল।

আমি জানি এসব কথা বলে কি কিছু বোঝানো যায় ?যার না হয়েছে, সে কি পরের লেখা পড়ে কিছু বুঝতেপারবে, না আমিই বোঝাতে পারব ?মনে হ'ল কোথায় যেনএকজন পথিক আছেন, ওই নীল আকাশ, ওই রঙিন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন...চলেছেন... কোথায় চলেছেন নিজেই হয়ত জানেন না। তাঁরকোন সঙ্গীও নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে কেউভালবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথচলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য—তিনিআছেন বলেই আছে।

আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়েপুতুলখেলার বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ করেআসছি। তিনি বিরাট, মানুষে দশ হাজার বছরে তাঁকে যতবুঝে এসেছে আগামী দশ হাজার বছরে তাঁকে আরও ভাল ক'রে বুঝবে। এক-আধ জন মানুষে কি করবে ?সমগ্র মানবজাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধির পথে চলেছে। আমি তাঁকে হঠাৎ বুঝে শেষ করতে চাইনে—কোটি যোজন দূরের তারার আলো যেমন লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে আসছে... আসছে... তেমনি তাঁর আলোও আমার প্রাণে আসছে... হয়ত সিকি পথও এখনও এসে পৌঁছয়নি—কত যুগ, কত শতাব্দী, এখনও দেরি আছে পৌঁছবার। এই তো আমারমনের আসল অ্যাডভেঞ্চার (adventure), এ যেন আমারহঠাৎ ফুরিয়ে না যায়। আমি খুঁজে বেড়াব... এই খোঁজাইআমার প্রাণ, বুদ্ধি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখবে, আমার দৃষ্টিকেচিরনবীন রাখবে।

আমি হয়ত এজন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমারমনের বেদিতে হোমের আগুন কখনও নিভে যেতে না দেন, শাস্ত্রত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যেপে। আমিচাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর, কলনাদিনী গঙ্গা, দূরেরনীহারিকাপুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য, ওই হলদে-ডানাপ্রজাপতি, এই শোভা, এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকেপেতে।

লোচনদাসের আখড়াতেই সবাই বললে, আমি নাস্তিক, কারণ আমি বলতাম নাম-জপ করা কেন ?ঈশ্বরের নামদিতে পেরেছে কে ?শেষ পর্যন্ত উদ্ধব-বাবাজি আমাকে আখড়া ছাড়িয়ে দিল এই জন্যে বোধ হয়।

একদিন বৈকালে গঙ্গায় নাইতে নেমেছি—কাটারিয়ারওপারের বহুদূর দিক্চক্রবালের প্রান্ত থেকে কালো মেঘ ক'রে ঝড় এল, গঙ্গার বুকে বড় বড় ঢেউ উঠল, আমার মুখেকপালে মাথায় বুকে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, ওপারের

চরের উপর বিদ্যুৎ চমকচ্ছে, জলের সুঘ্রাণ পাচ্ছি—এরকম কত ঝটিকাময় অপরাহ্ন ও কত নীরঞ্জ অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা মনে এল—আমারই জীবনের কত সুখদুঃখময় মুহূর্তের কথামনে এল—

মনে কেমন একটা অপূর্ব ভাবের উদয় হ'ল, তাকে আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে। বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার ঠিক ধূসর স্তূপের দিকে চেয়ে, দূর, বহুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে যেখানে বাংলা দেশ, যেখানে মালতী আছে, যেখানে এমন কত সুন্দর বর্ষার সন্ধ্যা মধুর আনন্দে কাটিয়েছি, কত জ্যোৎস্নারাত্রীে শুকনো মকাইঝোলানো চালাঘরের দাওয়ার তলায় ব'সে দুজনে কত গল্প করেছি, তার মুখে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে... কতবার অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে সে এসেছে—আবার কতদিন ডাকলেও আসেনি, কতবার চোখাচোখি হ'লেই হেসে ফেলেছে—এ কথা মনে হয়ে আমার মনে কেমন একটা উন্মাদনা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি আরও কত কি ভাবের উদয় হ'ল একটা বড়ভাবের মধ্যে দিয়ে। ওই একটার মধ্যেই সবটা ছিল। তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না—কিন্তু তারই প্রেরণায় আমার আঙুল আপনা-আপনি বেঁকে গেল, গঙ্গার জলে মা, বাবা, হীরু-জ্যাঠার নামে তর্পণ করলুম, ভগবানের নামে সমস্ত দেহ-মন নিয়ে এল, জলের ওপরই মাথা নত ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলুম। সীতার জন্যে করুণ সহানুভূতিতে চোখে জল এল। হঠাৎ ঘোর বৈষয়িকতার জন্যে জ্যাঠামশায়ের প্রতি অনুকম্পা হ'ল—আবার সেই সৃষ্টিছাড়া অপরূপ মুহূর্তেই দেখলুম মালতীকে কি ভালই বাসি, মালতীর সহায়হীন, সম্পদহীন, ছলছাড়া মূর্তি মনে ক'রে একটা মধুর স্নেহে তাকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচানোর আশ্রয়, তাকে রক্ষা করবার, আশ্রয় দেবার, ভালবাসার, ভাল করবার, তার মনে আনন্দ দেবার, তার সঙ্গে কথা বলবার আকুল আশ্রয় সমস্ত মন ভরে উঠল—কি জানি সেমুহূর্ত কি করে এল, সেই মেঘাঙ্ককার বর্ষণমুখর সন্ধ্যাটিতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই মহামুহূর্তে আমার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত পুলকের, গৌরবের, অনুভূতির সঞ্চয়হীন বিপুল আত্মপ্রকাশ করলে। সেদিন দেখলুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরনের, একই জাতীয়। যেখানে হৃদয়ের সহানুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই। ভগবানের প্রতি সেদিন যে-ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ব আনন্দের রূপে—সত্যিকার ভক্তি একটা joy of life... আত্মা, দেহ, মন সেখানে আনন্দে মাধুর্যে আপ্তহয়ে যায়।

ঠিক মালতী আমাকে ভালবেসেছে বা আমি মালতীকে ভালবেসেছি। এই ভেবে যেমন হয় তেমনি। কোনও পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নামমাত্র। এতেও মন অবশ্য হয়ে যায় আনন্দে—ওতেও।

উপলব্ধি ক'রে বুঝলুম যদি কেউ আমাকে আগে এ-সব কথা বলত, আমার কখনই বিশ্বাস হ'ত না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সাধুজি সন্ধ্যাবেলা রোজ ধর্মকথা পড়েন। আমি মনেমনে বলি—সাধুজি আপনি জীবন দেখেননি। ভালবেসেছেন কখনও জীবনে? প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন? যে কখনও নরকন হাতে নিতে সাহস করেনি, সে যাবে তলোয়ার খেলতে। শুকনো বেদান্তের কথার মধ্যে ঈশ্বর নেই—যেখানে ভাব নেই, ভালবাসা নেই, হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই। হৃদয়ের খেলা যে আনন্দ করেছে, ও-রস কি জিনিস য়েবোঝে—ভগবানকে ভালবাসার প্রথম সোপানে সে উঠেছে।

আমি মালতীর কথা এত ভাবি কেন ? সে আমাকে এত অবিভূত ক'রে রেখেছে কেন দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা ?... এই বিক্রমশিলা বিহারের পাহাড়মালা, বনশ্রেণি পাদমূলে প্রবাহিতা পুণ্যস্রোতা নদী, সন্ধ্যার পটে রাঙা সূর্যাস্ত, বনচামেলির উগ্র উদাস গন্ধ—এ-সবের মধ্যে সে আছে, তার হাসি নিয়ে, তার মুখভঙ্গি নিয়ে, তার গলার সুর নিয়ে, তার শতসহস্র টুকরো কথা নিয়ে, তার ছেলেমানুষি ভঙ্গি নিয়ে। কেন তাকে ভুলিনি, কেন তার জন্যে আমার মনসর্বদাই উদাস, উন্মুখ, ব্যাকুল, বেদনায় ভরা, স্মৃতির মাধুর্যে আপ্ত, নিরাশায় যন্ত্রণাময়—হঠাৎ তাকে এত ভালবাসলুম কেন ? তার কথা মনে যখন আসে, তখন কেওলিন খনির উপরকার পাহাড়চূড়াটায় একটা বকাইন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সারাদিন তার কথা ভাবি—খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না, ভালও লাগে

না—তার মুখের হাসির স্মৃতিতেই যেন আমার শান্তিময় নিভৃত গৃহকোণ, তার কথার সুর দূরেরব্যবধান ঘুচিয়ে, মাঠ নদী বন পাহাড় পার হয়ে ভেসে এসে আমার প্রদীপ-জ্বালানোশান্ত আঙিনার ছোট্ট খড়ের রান্নাঘরের একপাশে উপবিষ্ট নিরীহ গৃহস্থ সাজায়—জীবনেতাই যেনচেয়ে এসেছি, সব দুরাশা, সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়... এদিকে রোদ চড়ে ওঠে কিংবা সূর্য ঢলে পড়ে, বটেশ্বরনাথের পাহাড় রঙে রঙে রাঙা হয়, পাখির গান হঠাৎ যায় থেমে—সাধুজিরচেলা বর্মানারায়ণ আমাকে খুঁজতে আসে চা খাবার জন্যে...তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতেহয়... গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকারসাধু-বাবাজির গুহার সামনে ব'সে দুধবিহীন কড়া চা খেতেখেতে হনুমানচরিত শুনতে হয়।

সাধুজি আমাকে ভালবাসেন। এই জন্যেই ওঁর এখানে আছি। এখানে পয়সার খরচ নেই বললেই হয়। বারোটা টাকা এনেছিলুম, সাধুজির হাতে তুলে দিয়েছি—নিতে চাননি—আমি পীড়াপীড়ি করে দিয়েছি। একবেলা খাই মকাইয়ের ছাতু, একবেলা রুটি আর টেঁড়সের তরকারি। অন্য কিছু এখানে মেলে না। কেওলিন খনির ম্যানেজারমাঝে মাঝে কহলগাঁও থেকে মাছ আনায়, সেদিন ওরবাংলোতে আমায় খেতে বলে—কারণ সাধুর এখানে ওসবকারবার হবার জো নেই।

মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে না ?কিন্তু কী ক'রে হবে তা তো বুঝিনে। আমি আবার সেখানে কোন্ ছুতোয়যাব ?উদ্ধবদাস-বাবাজি আমায় ভাল চোখে দেখত না। দু-একবার অসন্তোষ প্রকাশও করেছিল, মালতীর সঙ্গে যখনবড় মিশছি—তখন দু-একবার আমায় এমন আভাসওদিয়েছিল যে এখানে বেশি দিন আর থাকলে ভাল হবে না। ও-সবে আমি ভয় করিনে। সন্তুসিন্ধু পারের দেশ থেকেমালতীকে আমি ছিনিয়ে আনতে পারি, যদি আমি জানতামযে মালতীও আমায় চায়। কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের জন্যেই যত বেদনা, যা-কিছু যন্ত্রণা ! কিজানি, বুঝতে পারিনে সবখানি। রহস্যময়ী মালতীর মনেরখবর পুরো এক বছরেও পাইনি।

এক-একবার কিন্তু আমার মনের গভীর গোপন তল থেকে কে বলে, অত সন্দেহ কেন তোমার মনে ?তোমারচোখ ছিল কোথায় ?মালতীকে বোঝানি এক বছরেও ?

মালতী—কি মাধুর্যের রূপ ধরেই সে মনে আসে ! তারকথা যখনই ভাবি, অন্ত-আকাশের অপরূপ শোভায়পাহাড়ের ধূসর ছায়ায় গঙ্গার কলতানের মধ্যে ওপারেরখাসমহলের চরে কলাইওয়ালি মাথায় কলায়ের বোঝা নিয়েঘরে যখন ফেরে, যখন সাদা পাল তুলে বড় বড় কিস্তিকহলগাঁয়ের ঘাট থেকে বাংলা দেশের দিকে যায়... কিংবাযখন গঙ্গার জলে রঙিন মেঘের ছায়া পড়ে, খেয়ার মাঝিরানিজেদের নৌকোতে বসে বিকট চিৎকার ক'রে ঠেট্ হিন্দিতে ভজন গায়—সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, পাহাড় একটা নতুনরঙে রঙিন হয়ে ওঠে আমার মনে—ওই দূর বাংলা দেশেরএক নিভৃত গ্রামের কোণে মালতী আছে, যখন আবার বর্ষানামে, খুব বড় ওঠে, কিংবা পুকুরের ঘাটে একা গা ধুতেযায়, কি বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখায় সন্ধ্যায়—আমার কথাতার মনে পড়ে না ?আমার তো পড়ে—সব সময়ই পড়ে,তার কি মনে পড়ে না ?

মালতীকে নিয়ে মনে কত ভাঙা-গড়া করি, কত অবস্থায়দুজনকে ফেলি মনে মনে, কত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারকরি, আমার অসুখ হয়, সে আমার পাশে ব'সে না ঘুমিয়েসারারাত কাটায়—কত অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে দু-জনে সংসারকরি—সে বলে—ভেবোনা না লক্ষ্মীটি, মদনমোহন আবারসব ঠিক ক'রে দেবেন ! তার ছোটখাটো সুখদুঃখ, আখড়ার বিগ্রহের ওপর গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস, তার সেবা—আমারভাল লাগে। মনে হয় কত মেয়ে দেখেছি, সবারই খুঁত আছে, মালতীর খুঁত নেই। আবার মেয়েরা যেখানে বেশি রূপসী, সেখানে মনে হয়েছে এত রূপ কি ভাল ?মালতীর স্নিগ্ধ শ্যামল সুকুমার মুখের তুলনায় এদের এত নিখুঁত রূপকি উগ্র ঠেকে ! মোটের ওপর যেদিক দিয়েই যাই—সেইমালতী।

এক-একবার মনকে বোঝাই মালতীর জন্যে অত ব্যস্তহওয়া দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কি ?তাকে আর দেখতেইপাব না। তাদের আখড়াতে আর যাওয়া ঘটবে না। স্বপ্নকেআঁকড়ে থাকি কেন ?কিন্তু মন যদি অত সহজে বুঝত !

মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মত মনে উদয় হয়। তখন সবইসুন্দর হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, সাধুরবকুনি, পাণ্ডা-ঠাকুরের জ্ঞাতি-বিরোধের কাহিনী—অর্থাৎ কি ক’রে ওর জ্যাঠাতুতো ভাই ওকে ঠকিয়ে এতদিন বটেশ্বর শিবের পাণ্ডাগিরি থেকে ওকে বঞ্চিতরেখেছিল তার সুদীর্ঘইতিহাস—সব ভাল লাগে। কিন্তু কোনও কথা বলতে ইচ্ছেকরে না তখন, ইচ্ছে হয় শুধু বসে ভাবি, ভাবি—সারা দীর্ঘদিনমান ওরই কথা ভাবি।

বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের দিনগুলো মনে আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায়কানায় ভরা কি সে-সব অপূর্ব দিন ! অনেক দিন হয়েগিয়েছে। কিন্তু প্রেমের অমর মধু-মুহূর্তগুলির ছায়াপাতেতাদের স্মৃতি আমার কাছে চিরশ্যামল। শরতের দুপুরে নিভৃতবননিবিড় অধিত্যকায় চূপ ক’রে ঝরা-পাহাড়ি-কুরগচি-ফুলেরশয্যায় ব’সে চারিদিকে রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়শ্রেণির রূপ ওশরতের আকাশের সাদা সাদা মেঘখণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে মালতীর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। তিনটাঙারমাঠে বটগাছের সবুজ মগডালে সাদা সাদা বকের সারি ব’সে আছে, যেন সাদা সাদা অজস্র ফুল ফুটে আছে—কত কি রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তার পর কালো সবুজ গাছপালা, তার ওপরের পর্দায় নীলকৃষ্ণ পাহাড়, তার ওপরেসুনীল ও সাদা মেঘস্বূপ, সকলের নীচে কূলে কূলে ভরাগৈরিক জলরাশি। কিসে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায় মনেপড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর,
বুঝি দূরে—অতি দূরে সাগর,
তাই গতি মস্তুর,
শান্ত, শান্ত পদসঞ্চর ধীর !

আগে প্রেম কাকে বলে তা জানতাম না, জীবনে তা কিদিতে পারে, তা ভাবিওনি কোনও দিন। এখন মনে হয় প্রেমইজীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা নয়—স্বর্গ এইপিয়ালতলায়, স্বর্গ তার স্মৃতিতে। নয়তো কি এত রূপ হয় এই শিলাস্তুত অধিত্যকার, ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওইপুণ্যসলিলা নদীর, ওই বননীল দিগন্তরেখার !

দিনে রাতে মালতী আমায় ছাড়ে কখন ? সব সময় সে আমার মনে আছে। এই দুপুর, এখন সে আখড়ার দাওয়ায় পরিবেশন করছে। এই বিকেল, এখন সে কাপড় সেলাই করছে, নয়তো মুগকলাই ঝাড়ছে। এই সন্ধ্যা, এখন সে টান-টান করে তার অভ্যস্ত ধরনে চুলটি বেঁধে, ফুল্লাধরে মৃদু হেসে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখাতে চলেছে। আজ মঙ্গলবার, সারাদিন সে উপবাস করে আছে, আরতির পরে দুধ ও ফলখাবে। সেই নিঃসঙ্কোচে পুকুরের ঘাটে বসে বসে আমাকেগান-শোনানো, আমার সঙ্গে শিবের মন্দিরে যাওয়া—খাতাপড়ে শোনানো—সকলের ওপরে তার হাসি, তার মুখের সে অপূর্ব হাসি ! কত কথাই মনে এসে নির্জনে যাপিত প্রতিপ্রহরটি আনন্দবেদনায় অলস ক’রে দিত।

দূরের গিরি-সানুর গায়ে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘরাজির মধ্যেএমন কি কোনও দয়ালু মেঘ নেই যে এই কূটজ-কুসুমাস্তীর্ণনিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিয়ালতলারএই নির্বাসিত যক্ষের বিরহবার্তাটি শুনে জেনে নিয়ে বাংলাদেশের প্রান্তরমধ্যবর্তী অলকাপুরীতে পৌঁছে দেয় তারকানে ?

কতবার মনে অনুশোচনা হয়েছে এই ভেবে যে কেনচলে আসতে গিয়েছিলুম অমন চুপি চুপি ? তখন কিবুঝেছিলুম মালতী আমায় এত ভাবাবে ! কি বুঝে আখড়া ছেড়ে চলে এলাম পাগলের মত ! এমনধারা খামখেয়ালীস্বভাব আমার কেন যে চিরকাল, তাই ভাবি। আমারমাথারঠিক নেই সবাই বলে, সত্যিই বলে। এখন বুঝেছি কি ভুলইকরেছি মালতীকে ছেড়ে এসে ! ওকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনাকরতে পারছি নে—এও যেমন ঠিক, আবার এও তেমনিঠিক যে আর সেখানে আমার ফেরা হবে না।

না—মালতী, আর ফিরে যাব না। কাছে পেয়ে তুমি যদিঅনাদর কর সহিতে পারব না। তোমার খামখেয়ালী স্বভাবকেআমার ভয় হয়। তার চেয়ে এই-ই ভাল। আমার জীবনে তুমি পুকুরে ঘাটের কত জ্যোৎস্নারাত্রি অক্ষয়

ক'রে দিয়েছ, সেই সব জ্যোৎস্নারাত্রির স্মৃতি, তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দিরের কত সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়ার স্মৃতি—
তোমার সে সব আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাক।

এক বছর কেটে গেল, আবার শ্রাবণ মাস।

হঠাৎ দাদার শালার একখানা চিঠি পেলাম কলকাতাথেকে। দাদার বড় অসুখ, চিকিৎসার জন্যে তাকে আনা হয়েছে ক্যান্সেল হাসপাতালে।

পত্র পেয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সাধুজির কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলাম। হাসপাতালে দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। সামান্য ব্রণ থেকে দাদার মুখে হয়েছে ইরিসিপ্লাস, আজসকালে অস্ত্রও করা হয়ে গিয়েছে। দাদা আমায় দেখে শরীরে যেন নতুন বল পেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত হাসপাতালে বসে রইলাম দাদার কাছে। দাদা বললে—এখানে বেশ খেতে দেয় নিতু। রোজ প্রতিবেলায় একখানা বড় পাঁউরুটি আর আধ সেরক'রে দুধ দিয়ে যায়। দেখিস এখন, এখুনি আনবে। খাবিরুটি একখানা ?

পরদিন সকালে আবার গেলাম হাসপাতালে। আঙুরকিনে নিয়ে গিয়েছিলাম বৌবাজারের মোড় থেকে, দাদাকে ব'সে ব'সে খাওয়ালাম। দুপুরের আগে চলে আসছি, দোরপর্যন্ত এসেছি, দাদা পেছু ডাকলে—জিতু, শোন !

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে—তার চোখ দুটিতে যেন গভীর হতাশা ও বিষাদ মাখানো। বললে—জিতু, তোর বৌদিদি একেবারে নিপাট ভালমানুষ, সংসারের কিছুবোঝে না। ওকে দেখিস—

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম—ও কি কথা দাদা ! তুমিসেরে ওঠ, তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব, তোমার সংসার তুমি দেখবে।

দাদা চুপ ক'রে রইল।

বিকলে দাদার ওয়ার্ডে ঢুকবার আগে মনে হ'ল দাদাত বিছানাতে বসে নেই ! গিয়ে দেখি দাদা আগাগোড়া কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে চার্চে দেখি জ্বর উঠেছে ১০৪ ডিগ্রীর ঘরে। পাশের বিছানার রোগী বললে—আপনি চলে যাবার পরে খুব জ্বর এসেছে। কোন কথা বলতে পারেন নি, আপনি আসবার আগে ডেকেছিলাম, সাড়া পাইনি।

সেদিন সারাদিন তেমনি ভাবে কেটে গেল। পরদিনও তাই, দাদার জ্ঞান আর ফিরে এল না—জ্বরও কমল না, পরদিন রাত্রে আমি রোগীর কাছে রইলাম।

ওঃ কি বর্ষা সে রাত্রে ! ঘনকৃষ্ণ শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ আকাশে গিয়েছে, নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে কোথাও একটা তারাচোখে পড়ে না। একখানা বই পড়ছিলাম দাদার বিছানার ধারে ব'সে। রাত বারোটায় একবার নার্স এল। আমি তাঁকে বললাম—রোগীর অবস্থা খারাপ—একবার রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসারকে ডাকাও। ডাক্তার এল, চলেও গেল। রাত তখন দেড়টা। বাইরে কি ভীষণ মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি পৃথিবীর ওপরে—বৃষ্টিবুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ছাত্র এসে রোগীকে দেখে বললে—ইন্জেকশন দিতে হবে।

আমি বললাম—বেশ দিন—

তারপর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘন মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। হাসপাতালের বারান্দাতে কুলিরা ঘুমুচ্ছে। টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে অনেকক্ষণ ধরে আর্ত পশুর মত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একবার সেটা থামছে, আবার জোরে জোরে হচ্ছে। সামনের ওয়ার্ডে মেম নার্সটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হেডলাইট জ্বালিয়ে একখানা মোটর এসে ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়াল। সুপারিন্টেনডেন্টদারক করতে এসেছেন। দাদাকে তিনি দেখলেন। নার্সকে কি বললেন। ছাত্রটিকে ডেকে কি জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্রটি আর একটা ইন্জেকশন দিলে।

রাত আড়াইটে। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দার ওদিকের আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে—অনেকটা অন্ধকার।

দাদার সঙ্গে অনেক কথা বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল। ছেলেবেলাকার কথা, দার্জিলিঙের কথা। সেই আমরা কার্টরোড ধ'রে উম্প্লাণ্ডের মিশন-হাউস পর্যন্ত বেড়াতে যেতুম, মনে আছে দাদা? একদিন থাপা তোমাকে কাদার পুতুলগড়িয়ে দিয়েছিল! মুরগীর ঘরে লুকিয়ে তুমি আমি মিছরিচুরি করে শরবৎ খেতুম? তুমি দোকান করলে আটঘরাতে বাবা মারা যাওয়ার পরে পাঁচ সের নুন, আড়াই সের আটা, পাঁচ পোয়া চিনি নিয়ে—সবাই ধার নিয়ে দোকান উঠিয়েদিলে। বৌদিদিকে কি বলব দাদা?

এবার এসে দাদার খাটের পাশে বসে রইলাম। একটানা বৃষ্টি-পতনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল টিটেনাস ওয়ার্ড থেকে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও সেই আর্ত চীৎকারটা শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলের টনসিলকাটা হয়েছিল—সে একবার ঘুম ভেঙে উঠে খাবার চাইলে। কুলিটা উঠে তাকে জল দিলে।

এই কুলিগুলো, ওই বুড়ো মেথরটা, নার্সেরা—এরাঘুমোয় কখন? সারারাত জেগে জেগে রোগীদের ফাইফারমাশ খাটছে। দাদার অবস্থা খারাপ ব'লে সবাই এসে একবার ক'রে দেখে যাচ্ছে। নার্স যে কতবার এল! সবাই তটস্থ... দাদাকে বাঁচাবার জন্যে সবারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা। বাঁচলে সবাই খুশী হয়। নার্স একবার আমায় বললে—তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বাবু। সারারাত জেগে ব'সে থাকলে অসুখ করবে তোমার।

হাসপাতালটিকে আমার মনে হল যেন স্বর্গ। আর্তের সেবা যেখানকার মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে করে, সে স্বর্গই। ওই বুড়ো মেথরটা এখানকার দেবদূত। যেদিন কয়েক শতাব্দী আগে শ্রীচৈতন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিংবা শঙ্করাচার্য সংসারের অসারত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন—তাদের স্বপ্নে এই স্বর্গের কল্পনা ছিল। চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দলে, নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে এই বুড়ো মেথরটা যোগদান করতে পারত, তিনি ওকে কোল দিতেন, ঝাড়ুখণ্ডের পথে শ্রীক্ষেত্র রওনা হবার সময়ে ওকে পার্শ্বচর ক'রে নিতেন। ...রাত সাড়ে তিনটে। রাত আজ কি পোয়াবে না? বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশ কিন্তু মেঘে মেঘে কালো।

এই সময়ে দাদার নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। কলের ঘোলাজল দাদার মুখে দিলাম। কানের কাছে গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম। এই বিপদের সময় কি জানি কেন মালতীর কথা মনে পড়ল। মালতী যদি এখানে থাকত! আটঘরার অশুখতলার সেই বিষুঃমূর্তির কথা মনে পড়ল—হে দেব, দাদার যাওয়ার পথ আপনি সুগম ক'রে দিন। আপনার আশীর্বাদে তার জীবনের সকল ত্রুটি, সকল গ্লানি ধুয়ে মুছেপবিত্র হোক, যে সমুদ্র আপনার অনন্ত শয়্যা, যে লোকালোকপর্বত আপনার মেখলা—সে-সব পার হয়েও বহুদূরের যে পথে দাদার আজ যাত্রা, আপনার কৃপায় সে পথ তার বাধাশূন্য হোক, নির্ভয় হোক, মঙ্গলময় হোক।

পাশের বিছানার রোগী বললে—একবার মেডিকেল অফিসারকে ডাকান না!

আমি বললাম—আর মিথ্যে কেন?

তারপর আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার ঘুম এসেছে, ভয়ানক ঘুম। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারি নে। মধ্যে নার্স দুবার এল, আমি তা ঘুমের ঘোরেই জানি—আমায় জাগালে না। পা টিপে টিপে এল, পা টিপেই চলে গেল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হবার দেরি নেই, হাসপাতালের আলো নিস্প্রভ হয়ে এসেছে—কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকা, দিনের আলো যদিও একটু থাকে, বোঝা যাচ্ছে না। দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়েকেমন হয়ে গেলাম। এখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি? দাদার খাটের চারিপাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই

আটঘরারসেই হীরু রায়—স্যুলাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা-বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে যে কোলেপিঠে ক’রে মানুষকরেছিল। তার পরই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ-দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট কাকীমার মেয়ে পানী। এদেরমূর্তি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হ’ল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। পাশের খাটের রোগীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে যদিও জেগে আছে এবং মাঝেমাঝেদাদার খাটের দিকে চাইছে—কিন্তু তার মুখ-চোখদেখে বোঝা যাচ্ছিল মুমূর্ষদাদাকে ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। অথচ কেন দেখতে পাচ্ছে না, এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সজীব মানুষগুলোকে কেন যে ওরা দেখে না—এভাবে ছেলেবেলা থেকে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

আমি জানি এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষ চোখে যা দেখে না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজী হয় না। এই জন্যহাসপাতালের এই রাত্রিটির কথা আমি একটি প্রাণীকেওবলি নি কোনদিন।

দু-তিন মিনিট কেটে গেল। ওরা এখনও রয়েছে। আমিচোখ মুছলাম, এদিক-ওদিক চাইলাম—চোখে জল দিলাম উঠে। এখনও ওরা রয়েছে। ওদের সবারই চোখ দাদারখাটের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানীর কাছে দাঁড়লাম। ওরা সবাই হাসিমুখে আমার দিকে চাইলে। কতকথা বলব ভাবলাম মাকে, বাবাকে, পানীকে—থাপা কবেমারা গিয়েছে জানি নে—সে এখনও তাহলে আমাদেরভোলে নি ?...তাকে কি বলব ভাবলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এই সময়ে নার্স এল। আমি আশ্চর্যহয়ে ভাবছি নার্স কি এদের দেখতে পাবে না ?এইত সবাইএরা এখানে দাঁড়িয়ে। নার্স কিন্তু এমন ভাবে এল যেন আমিছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়েবললে—এ তো হয়ে গিয়েছে। —এ কুলি, কুলি—

কুলি খাটটাকে ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দিতে এল।

তখনও ওরা রয়েছে।...

তারপর আমার একটা অবসন্ন ভাব হ’ল—আমার সেই সুপরিচিত অবসন্ন ভাবটা। যখনই এ-রকম আগে দেখতাম, তখনই এ-রকম হ’ত। মনে পড়ল কত দিন পরে আবারদেখলাম আজ—বহুকাল পরে এই জিনিসটাপেয়েছি—হারিয়ে গিয়েছিল, সন্ধান পাই নি অনেক দিন, ভেবেছিলুম আর বোধ হয় পাব না—আজ দাদার শেষশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তা ফিরে পেয়েছি। আমার গা যেন ঘুরে উঠল—পাশের চেয়ারে ধপ্ করে ব’সে পড়লাম।

নার্স আমার দিকে চেয়ে বললে—পুওর বয় !

জীবনে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন কাজ একেবারে করি নি তানয়, কিন্তু বৌদিদিকে দাদার মৃত্যুসংবাদটা দেওয়ার মতনিষ্ঠুর কাজ আর যে কখনও করি নি, একথা শপথ করেবলতে পারি। বেলা দুটোর সময় দাদার বাড়ি গিয়েপৌঁছলাম। পথে দাদার শ্বশুড়বাড়ি এক শরিকের সঙ্গে দেখা।আমার মুখে খবর শুনেই সে গিয়ে নিজের বাড়িতেঅবিলম্বে খবরটি জানালে। বোধ হয় যেন বৌদিদির ওপর আড়ি করেই ওদের বাড়ির মেয়েরা—যারা দাদার অসুখেরসময় কখনও চোখের দেখাও দেখতে আসেনি—চীৎকারকরে কান্না জুড়ে দিলে। বৌদিদি তখন অত বেলায় দুটো রুঁখেছেলেমেয়েকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিচ্ছে। নিজে তখনওখায় নি। পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে বৌদিদি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ রে বিনু, ওরা কাঁদছেকেন রে ?কি খবর এল ওদের ?কারও কি অসুখ-বিসুখ?

এমন সময়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমায় দেখে বৌদিদির মুখ শুকিয়ে গেল। বললো ঠাকুরপো ! তোমার দাদাকোথায় ?

আমি বললাম—দাদা নেই, কাল মারা গিয়েছে।

বৌদিদি কাঁদলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমারমুখের দিকে চেয়ে।

পাশের বাড়িতে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ছন্দে ও সুরেশোক-প্রকাশের ঘটনা কি ! পাড়ার অনেক মেয়ে এলেন সাঙ্ঘনাদিতে বৌদিদিকে। কিন্তু একটু পরে যখন বৌদিদি পুকুরেরঘাটে নাইতে গেল, সঙ্গে একজন যাওয়া দরকারনিয়মমত—তখন—এক একটা অজুহাতে যে যার বাড়িতেচলে গেল। আমি বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে এরা তোবৌদিদির বাপের বাড়ির লোক ! তার একটু পরে বৌদিদিখানিকটা কাঁদলে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে বললে, শেষকালে জ্ঞান ছিল ঠাকুরপো ?সেইত মরেই গেল—হাসপাতালে নানিয়ে গেলেই হ'ত ! তবু আপনার জন কাছে থাকত।

আমি বললাম,—বৌদিদি তুমি ভেবো না, এখানে যেরকম গতিক দেখছি তাতে এখানে থাকলে দাদার চিকিৎসাইহ'ত না। এখানে কেউ তোমায় তো দেখে না দেখছি। হাসপাতালের লোকে যথেষ্ট করেছে। বাড়িতে সে রকম হয়না।আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে হাসপাতালই ভাল।

বৌদিদির বাবা মা কেউ নেই—মা আগেই মারা গিয়েছিলেন—বাবা মারা গিয়েছিলেন আর-বছর। একথাকলকাতাতেই বৌদিদির ভায়ের মুখে শুনেছিলাম। বৌদিদিরসে ভাইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ নিতান্তঅপদার্থতার ওপর নিতান্ত গরিব, বর্তমানে কপদকর্হীনবেকার—তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বয়সও অল্প, কলকাতা ছেড়ে আসে নি, সেখানে চাকুরির চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখলাম এদের সংসারের ভার এখন আমিই নানিলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। দাদা এদেরএকেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেছে। কাল কি করে চলবেসে সংস্থানও নেই এদের। তার উপর দাদার অসুখের সময়কিছু দেনাও হয়েছে।

এদের ছেড়ে কোথাও নড়তে পারলুম না শেষ পর্যন্ত। কালীগঞ্জই থাকতে হ'ল। এখান থেকে দাদার সংসার অন্যস্থানে নিয়ে গেলাম না, কারণ আটঘরাতে এদের নিয়েযাবার যো নেই, অন্য জায়গায় আমার নিজের রোজগারেরসুবিধা না হওয়া পর্যন্ত বাড়িভাড়া দিই কি ক'রে ?

এ সময়ে সাহায্য সত্যি সত্যিই পেলুম দাদার সেইমাসীমার কাছ থেকে—সেই যে বাতাসার কারখানার মালিককুণ্ডু-মশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—সেবার যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। এই বিপদের সময় আমাদের কোন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সেরকম সাহায্য আসেনি।

ক্রমে মাসের পর মাস যেতে লাগল।

সংসার কখনো করি নি, করবো না ভেবেছিলাম। কিন্তুযখন এ-ভাবে দাদার ভার আমার ওপর পড়ল, তখনদেখলাম এ এক শিক্ষা—মানুষের দৈনন্দিন অভাব-অনটনেরমধ্যে দিয়ে, ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পরের জন্যে খাটুনি ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে এই যে এতগুলি প্রাণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার গুরুভার নিজের ওপর নিয়ে সংসার-পথের চলার দুঃখ—এই দুঃখের একটা সার্থকতাআছে। আমার জীবনে এর আগে চলেছিল শুধু নিজেকেকেন্দ্র ক'রে, পরকে সুখী করে নিজেকে পরিপূর্ণ করার শিক্ষা আমায় দিয়েছে মালতী। পথে বেরিয়ে অনেক শিক্ষার মধ্যেএটিই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

কত জায়গায় চাকুরি খুঁজলাম। আমি যে লেখাপড়া জানিবাজারে তার দাম কানাকড়িও না। হাতের কোন কাজওজানি নে, সবতাতেই আনাড়ি। কুণ্ডু-মহাশয়ের স্ত্রীর সুপারিশধরে বাতাসার কারখানাতেই খাতা লেখার কাজ যোগাড় করলাম—এ কাজটা জানতাম, কলকাতায় চাকুরির সময়মেজবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় শিখেছিলাম তাই রক্ষে।কিন্তু তাতে ক'টা টাকা আসে ?বৌদিদির মত গৃহিণী, তাই ওই সামান্য টাকার মধ্যে সংসার চালানো সম্ভব হয়েছে।

ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। গাংনাপুরের হাটে আমি কাজেবেরিয়েছি গরুর গাড়ি ক'রে। মাইল-বারো দূর হবে, বেগুনপটলের বাজরার ওপরে চটের থলে পেতে নিয়ে আমি আরতনু চৌধুরী ব'সে। তনু চৌধুরীর বাড়ি নদীয়া

মেহেরপুরে, এখানকার বাজারের সাহেবের পাটের গদির গোমস্তা, গাংনাপুরে খরিদারের কাছে মাল দেখাতে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতে তনু চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়ল বাজারের উপরেই। আমি চুপ করে বসে আছি। পথের ধারে গাছেগাছে কচি পাতা গজিয়েছে, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পথের পাশেমাঠের মধ্যে সর্বত্র।

শেষরাতে বেরিয়েছিলুম, ভোর হবার দেরি নেই, কিসুন্দর ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়া, পূব আকাশে জ্বলজ্বলেবৃশ্চিক রাশির নক্ষত্রগুলো বাঁশবনের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে—যেন ওই দ্যুতিমান তারার মণ্ডলী পৃথিবীর সকলসুখদুঃখের বাস্তবতার বন্ধনের সঙ্গে উর্ধ্ব আকাশের সীমাহীন উদার মুক্তির একটা যোগ-সেতু নির্মাণ করেছে—যেন আমাদের জীবনের ভারক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংকীর্ণ পরিসরের প্রতি নক্ষত্র-জগৎ দয়াপরবশ হয়ে জ্যোতির দূত পাঠিয়েছে আমাদের আশার বাণী শোনাতে—যে কেউ উঁচু দিকে চেয়ে দেখবে, চলতে চলতে সে-ই দেখতে পাবে তার শাস্ত্র মৃত্যুহীন রূপ। যে চিনবে, যে বলবে আমার সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক যোগ আছে—আমি জানি আমি বিশ্বের সকল সম্পদের, সকল সৌন্দর্যের, সকল কল্যাণের উত্তরাধিকারী—তার কাছেই গুরবাণী সার্থকতা লাভ করবে।

এই প্রস্ফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমার মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, যেন কি পেয়েছিলুম, হারিয়েফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্যের অরুণ রাগ অতীত দিনেরকত কথা মনে এনে দেয়। সব সময় আমি সে-সব কথা মনেস্থান দিতে রাজী হই নে, অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকি আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ বাড়ে বৈ কমে না। হঠাৎ দেখি অন্যমনস্ক হয়ে কখন ভাবছি, দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে সেই ভোরে যে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম কাউকে না জানিয়ে, মালতীকে তো একবার জানাতে পারতাম—মালতীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলুম কেমন করে !

ওকথা চেপে যাই—মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। আগে যতটা কষ্ট হ'ত এসব চিন্তায়—এখন আরততটা হয় না, এটা বেশ বুঝতে পারি। মালতীকে ভুলে যেতে থাকি—কিছুদিন পরে আরও যাব। এক সময়ে যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আজ সপ্তসিন্ধুপারের দেশের রাজকন্যার মত অবাস্তব হয়ে আসছে। হয়ত একদিন একেবারেই ভুলে যাব। জীবন চলে নিজের পথে নিজের মর্জিমত—কারও জন্যে সে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে—যখন ভাবি বহুদিন আগে রাঢ়ের বননীল-দিগ্বলয়ে-ঘেরা মাঠের মধ্যে যে দেবতার স্বপ্নদেখেছিলুম তিনি আমায় ভুলে যান নি। তাঁরই সন্ধান বেরিয়েছিলাম, তিনি পথও দেখিয়েছিলেন। এই অনুদাররুদ্ধগতি জীবনেও তিনি আমার মনে আনন্দের বাণী পাঠিয়েছেন।

এতেও ঠিক বলা হ'ল না। সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন কি করি, কি বলি কিছু জ্ঞান থাকে না—সে এক অন্য ব্যাপার। আজও ঠিক তাই হ'ল। আমি হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। তনু চৌধুরী বললে—ও কি, উঠে এস। তনু চৌধুরী জানে না আমার কি হয় মনের মধ্যে এ সবসময়ে, কারও সাহচর্য এসব সময়ে আমার অসহ্য হয়, কারও কথায় কান দিতে পারি নে—আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিখের ছানাগুলো খাদ্যকণা খুঁটে খাচ্ছে যদিকে, তাদের অসহায়পক্ষ-ভঙ্গিতে কি যেন লেখা আছে—একবার চাই তিসির ফুলের রঙের আকাশের পানে—ঝলমল প্রভাতের সূর্যকিরণের পানে, শস্যশ্যামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ ! এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, এক গৌরব-সমৃদ্ধ পবিত্র নবজন্ম।

মনে মনে বলি, আপনি আমায় এ-রকম করে দেবেন না, আমায় সংসার করতে দিন ঠাকুর। দাদার ছেলেমেয়েরা, বৌদিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওদের অল্পের জন্যে, ওদের আমি তো ফেলে দিতে পারব না ! এখন আমায় এ-রকম নাচাবেন না।

বৈকালের দিকে পায়ে হেঁটে গাংনাপুরের হাটে পৌঁছলাম। তনু চৌধুরী আগে থেকে ঠিক করেছে আমার মাথা খারাপ। রাস্তার মধ্যে নেমে পড়লাম কেন ও-রকম?

ফিরবার পথে সন্ধ্যার রাঙা মেঘের দিকে চেয়ে কেবলইমানে হ'ল ভগবানের পথ ঐ পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘপর্বতের ওপারে কোনো অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয়, তাঁর পথ আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু-গাড়েয়ান যেপথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও ! আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলেছেন এইমুহূর্তে—আমি আছি তাই তিনি আছেন। যেখানে আমার অসাফল্য সেখানে তাঁরও অসাফল্য, আমার যেখানে জয়, সেখানে তাঁরও জয়। আমি যখন সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, ছোটছোট ছেলেমেয়েদের আদর করি, পরের জন্যে খাটি—তখন বুঝি ভগবানের বিরাট শক্তির স্বপক্ষে আমি দাঁড়িয়েছি—বিপক্ষে নয়। এই নীল আকাশ, অগ্নিকেতন উল্কাপুঞ্জ, বিদ্যুৎ আমায় সাহায্য করবে। বিশ্ব যেন সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিব ও সুন্দরের মধ্যে নিজের সার্থকতাকে খুঁজতে, কিন্তু পদে পদে সে বাধা পাচ্ছে কি ভীষণ ! বিশ্বের দেবতা তবুও হাল ছাড়েন নি—তিনি অনন্ত ধৈর্যে পথ চেয়ে আছেন। নীরব সেবারত সূর্য ও চন্দ্র আশায় আশায় আছে, সমগ্র অদৃশ্যলোকে চেয়ে আছে—আমিও ওদের পক্ষে থাকব বিশ্বের দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারব না। জীবনে মানুষ ততক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিসই, যতক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না হয়। আগে স্রোতের শেওলার মত ভেসে ভেসে কত বেড়িয়েছি জীবন-নদীর ঘাটে ঘাটে—তটপ্রান্তবর্তী যেমহীরুহটি শত স্মৃতিতে তিলে তিলে বর্ধিত হয়েমানার্থিনীদের ছায়াশীতল আশ্রয় দান করেছে—সে হয়ত বৈচিত্র্য চায় নি তার জীবনে—কিন্তু একটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর সূর্য তার মাথায় কিরণ বর্ষণ করেছে, তার শাখা-প্রশাখায় ঋতুতে ঋতুতে বনবিহঙ্গদের কৌতুকবিলাস কলকাকলিনিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—তার মৃদু ও ধীর, পরার্থমুখীগম্ভীর জীবন-ধারা নীল আকাশের অদৃশ্য আশীর্বাদতলে এই একটি শতাব্দী ধরে বয়ে এসেছে—বৈচিত্র্য যেখানে হয়ত আসে নি—গভীরতায় সেখানে করেছে বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ। প্রতিদিনের সূর্য শুক্রতারার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীর অন্ধকারে অদৃশ্যহন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ আসে—দেখি যে পুকুরের ধারে বর্ষার ব্যাঙের ছাতাসূর্যের অমৃত কিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে—দেখি উইয়ের টিবিতে নতুন পাখা ওঠা উইয়ের দল অজানাবায়ুলোক ভেদ ক'রে হয়েছে মরণের যাত্রী, শরতের কাশবনজীবন-সৃষ্টির বীজ দূরে দূরে, দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার মধ্যেই পরম কাম্য সার্থকতাকে লাভ করেছে—দারিদ্র বা কষ্ট তুচ্ছ, পৃথিবীর সমস্ত বিলাসলালসাও তুচ্ছ, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি নে যদি এই জাগ্রত চেতনাকে কখনও না হারাই—যদি হে বিশ্বদেবতা, বাল্যে তুমারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন সকালবেলাকার সূর্যের আলোয় সোনার রঙে রঞ্জিত হ'তে দেখতুম—তেমনি যদি আপনি আপনার ভালবাসার রঙে আমার প্রাণ রাঙিয়েতেন—আমিও আপনাকে ভালবাসি যদি—তবে সকলসংকীর্ণতাকে, দুঃখকে জয় ক'রে আমি আমার বিরাটচেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম করে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।

দাদার মৃত্যুর মাস তিনেক পরে বাতাসার কারখানারকুণ্ডুমশায় হঠাৎ মারা গেলেন। এতে আমাকে বিপদে পড়তে হ'ল। কুণ্ডুমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলেরা এসে কারখানা ওবাড়িঘর দখল করলে। কুণ্ডুমশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার হাতের হাজার দুই নগদ টাকা বার ক'রে নিলে। টাকাগুলো হাতে না আসা পর্যন্ত ছেলেরা বৌয়েরা সংশাশুড়ীকে খুব সেবায়ত্ন করেছিল, টাকা হস্তগত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমেতাদের মূর্তি গেল বদলে। যা দুর্দশা তার শুরু করলে ওরা !বাড়ির চাকরাণীর মত খাটাতে লাগল, গালমন্দ দেয়, তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। আমি একদিন গোপনে বললাম—মাসীমা, পঞ্চকে ডাকঘরের পাস-বই দিও না বা কোন সই চাইলেও দিও না। তুমি অত বোকা কেন তাই ভাবি ! আগের টাকাগুলো ওদের হাতে দিয়ে বসলেই বা কি বুঝে?

ডাকঘরের পাস-বইয়ের জন্যে পঞ্চ অনেক পীড়াপীড়িকরেছিল। শেষ পর্যন্ত হয়ত মাসীমা দিয়েই দিত—আমিমেখানা নিজের কাছে এনে রাখলাম গোপনে। কত টাকা ডাকঘরে আছে না জানতে পেরে পঞ্চ আরও ক্ষেপে উঠল। বেচারীর দুর্দশার একশেষ ক'রে তুললে। কুণ্ডুমশায়ের স্ত্রীরবড় সাধ ছিল সংছেলেরা তাকে মা ব'লে ডাকে, সে সাধতারা ভাল করেই মেটালে ! একদিন আমার চোখের সামনে সংমাকে ঝগড়া ক'রে খিড়কীদোর দিয়ে বাড়ির বাইরে বার ক'রেদিলে। আমি মাসীমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম, চিঠিলিখে তার এক দূরসম্পর্কের ভাইকে আনালাম—সে এসে মাসীমাকে নিয়ে গেল। আমার অসাম্মতে মাসীমা আবার বৌদিদির হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলে গেল যাবার সময়—জিতু মাসীমা বলেছিল, আমি তিলির মেয়ে, কিন্তু বেঁচে থাক সে, ছেলের কাজ করেছে। আমার জন্যেই তার কারখানার চাকরিটা গেল, যতদিন অন্য কিছু না হয়, এতে চালিয়ে নিও, বৌমা। আমি দিচ্ছি এতে কিছু মনে ক'রো না, আমার তিনকুলে কেউ নেই, নিতুর বৌয়ের হাতে দিয়ে সুখ যদি পাই, তা থেকে আমায়নিরাশ ক'রো না।

পঞ্চ কারখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে দিলেও আমি আরএকটা দোকানে চাকরি পেলাম সেই মাসেই। সংমায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করার দরুন কালীগঞ্জ কেউই ওদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, মাসীমার অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে ভালবাসত। তবে পঞ্চদের টাকার জোর ছিল, সব মানিয়েগেল।

ইতিমধ্যে একদিন সীতার শ্বশুরবাড়ি গেলাম সীতাকেদেখতে। দাদা মারা যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কারণ এক বেলার জন্যেও ওরা সীতাকে পাঠাতেরাজী হয় নি। সীতা দাদার নাম ক'রে অনেক চোখের জল ফেললে। দাদার সঙ্গে ওর শেষ দেখা মায়ের মৃত্যুর সময়ে। তার পর আমার নিজের কথা অনেক জিজ্ঞেস করলে। সন্ধ্যাবেলায় ও রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল, আমি কাছে বসে গল্প করছিলাম। ওর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল না, বসতবাটিটা বেশ বড়ই, কিন্তু বাস করবার উপযুক্ত কুটুরীমাত্র চারটি, তাদেরও নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা, চুনবালিখসাদেওয়াল, কার্নিসের ফাটলে বট অশ্বথের গাছ। রান্নাঘরেরএক দিকের ভাঙা দেওয়াল বাঁশের চাঁচ দিয়ে বন্ধ, কার্তিকমাসের হিম তাতে আটকাচ্ছে না। সীতার বড়-জা ওদিকে আর একটা উনুনে মাটির খুড়িতে ট্কা খেজুর রস জ্বালদিচ্ছিলেন, তিনি বললেন—যা হবার হয়ে গেল ভাই, এইবার তুমি একটা বিয়ে কর দিকি ?এই গাঁয়েইবাঁড়ুয়োবাড়িতে ভাল মেয়ে আছে, যদি মত দাও কালইমেয়ে দেখিয়ে দি।

সীতা চুপ করে রইল। আমি বললাম—একটা সংসারঘাড়ে পড়েছে, তাই অতি কষ্টে চালাই, আবার একটা সংসার চালাব কোথা থেকে দিদি ?

সীতা বললে—বিয়ে আর কাউকে করতে বলিনে।মেজদা, এ অবস্থায় বড়দারও বিয়ে করা উচিত হয় নি।তোমারও হবে না। তার চেয়ে তুমি সন্নিসি হয়ে বেড়াচ্ছিলে, ঢের ভাল করেছিলে। আচ্ছা মেজদা, তুমি নাকি খুব ধার্মিকহয়ে উঠেছ সবাই বলে ?

আমি হেসে বললাম—অপরের কথা বিশ্বাস করিস্ নাকিতুই ?পাগল ! ধার্মিক হলেই হ'ল অমনি—না ?আমি কিছিলাম, না-ছিলাম, তুই তো সব জানিস সীতা। আমারধাতে ধার্মিক হওয়া সয় না, তবে আমার জীবনের আর একটা কথা তুই জানিস নে, তোকে বলি শোন্।

ওদের মালতীর কথা বললুম, দু-জনেই একমনে শুনলে।ওর বড়-জা বললে—এই তো ভাই মনের মত মানুষ তোপেয়েছিলে—ওরকম ছেড়ে এলে কেন ?

আমি বললাম—এক তরফা। তাতে দুঃখই বাড়ে, আনন্দ পাওয়া যায় না। সীতা তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয় ?

সীতা মুখ টিপে হেসে বললে—এক তরফা বলে মনে হয়না। তোমার সঙ্গে অত মিশত না তা হলে—বা তোমারসঙ্গে কোথাও যেত না।

একটু চুপ করে থেকে বললে—তুমি আর একবারসেখানে যাও, মেজদা। আমি ঠিক বলছি তুমি চলে আসবারপরেই সে বুঝতে পেরেছে তার আখড়া নিয়ে থাকা ফাঁকাকাজ। ছেলেমানুষ, নিজের মন বুঝতে দেরি হয়। এইবার একবার যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এস তো ?

সীতা নিজের কথা বিশেষ কিছু বলে না, কিন্তু ওর ওইশান্ত মৌনতার মধ্যে ওর জীবনের ট্রাজেডি লেখা রয়েছে।ওর স্বামী সতিই অপদার্থ, সংসারে যথেষ্ট দারিদ্র্য, কখনওবাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পয়সা আনবার চেষ্টা করবে না। একধরনের নিষ্কর্মা লোকেরা মনের আলস্য ও দুর্বলতা প্রসূতভয় থেকে পুজো-আচার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সীতারস্বামীও তাই। সকালে উঠে ফুল তুলে পুজো করবে, স্নানের সময় ভুল সংস্কৃতে স্তবপাঠ করবে, সব বিষয়ে বিধান দেবে, উপদেশ দেবে। একটু আদা-চা খেতে চাইলাম—সীতাকেবারণ ক'রে ব'লে দিলে—রবিবারে আদা খেতে নেই। দুপুরে খেয়ে উঠেই বিছানায় গিয়ে শোবে, বিকালে চারটে পর্যন্তঘুমবে—এত ঘুমতেও পারে ! এদিকে আবার ন'টা বাজতে নাবাজতে রাত্রে বিছানা নেবে। সীতা বই পড়ে ব'লে তাকেযথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়। বই পড়লে মেয়েরা কুলটাহয়, শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে !

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত দুর্মুখও বটে। কথায় কথায় আমার মুখে একবার যীশুখৃষ্টের নাম শুনে নিতান্ত অসহিষ্ণুও অভদ্র ভাবে বলে উঠল—ওসব স্লেচ্ছ ঠাকুর দেবতারনাম করো না এখানে, এটা হিন্দুর বাড়ি, ওসব নাম এখানেচলবে না।

সীতার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম, নইলে একথার পর আমি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করতাম না।সীতা ওবেলা পায়ের পিঠে খাওয়াবার আয়োজন করছে আমি জানি, তাঁর আদরকে প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরল না। আমি রাগ করে চলে গেলে ওর বুকে বড় বিঁধবে। ওকে একেবারেই আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি সবাই মিলে। সীতা একটাও অনুযোগের কথা উচ্চারণ করলে না।কারুর বিরুদ্ধেই না। বৌদিদিকে ব'সে ব'সে একখানা লম্বাচিঠি লিখলে, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললে—আমায় পাঠাবে না কালীগঞ্জ, তুমি মিছে ব'লেকেন মুখ নষ্ট করবে মেজদা ! দরকার নেই। তার পরজল-ভরা হাসি হাসি চোখে বললে—আবার কবে আসবে ?ভুলে থেকে না মেজদা, শীগগির আবার এসো।

পথে আসতে আসতে দুপুরের রোদে একটা গাছেরছায় বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলুম। উমপ্লাণ্ডেরমিশন-বাড়ির কথা মনে পড়ল, মেমেরা সীতাকে কত কিছুঁচের কাজ, উল-বোনার কাজ শিখিয়েছিল যত্ন করে। কার্ট রোডের ধারে নদীখাতের মধ্যে বসে আমি আর সীতা কতভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি ঐঁকেছি ছেলেমানুষী মনে—কোথায়কি হয়ে গেল সব ! মেয়েরাই ধরা পড়ে বেশী, জগতেরদুঃখের বোঝা ওদেরই বইতে হয় বেশী করে। সীতার দশাযখনই ভাবি, তখনই তাই আমার মনে হয়।

মনটাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে সীতার স্বামীর একটাকথায়। সে আমায় লক্ষ্য করে একটা শ্লোক বললে কাল রাত্রে। তার ভাবার্থ এই—গাছে অনেক লাউ ফলে, কোনলাউয়ের খোলে কৃষ্ণনাম গাইবার একতারা হয়, কোন লাউআবার বাবুর্চি রাঁধে গোমাংসের সঙ্গে।

তার বলবার উদ্দেশ্য, আমি হচ্ছি শেষোক্ত শ্রেণীরলাউ। কেননা আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের আচার মানি নে, দেবদেবীর পূজো-আচ্চা করি নে ওর মত। এই সব কারণেও আমাকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে বুঝলাম এবং বোধহয় নিজেকে মনে মনে হরিনামের একতারা বলেই ভাবে।

ভাবুক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার মতেরসঙ্গে মিল না হলেই সে যদি আমায় ঘৃণা করে তবে আমি নিতান্ত নাচার। কোন্ অপরাধে আমি বাবুর্চির হতে-রাঁখালাউ ?ছেলেবেলায় হিমালয়ের ওক্ পাইন বনে তপস্যাস্তব্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘার মূর্তিতে ভগবানের অন্য রূপ দেখেছিলাম, তাই ?রাঢ়দেশের নির্জন মাঠের মধ্যে সঙ্ক্যায় সেবার সেইএক অপরূপ দেবতার ছবি মনে এঁকে গিয়েছে, তাই ?সেইঅজানা নামহীন দেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলি—যে যা বলেবলুক, আমি আচার মানি নে, অনুষ্ঠান মানি নে, সম্প্রদায় মানি নে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত মানি নে, গোঁড়ামি মানিনে,—আমি আপনাকে মানি। আপনাকে ভালবাসি। আপনারএই বননীল দিগন্তের রূপকে ভালবাসি, বিশ্বের এই পথিকরূপকে ভালবাসি। আমার এই চোখ, এই মন জন্মজন্মান্তরেওএই রকম রেখে দেবেন। কখনও যেন ছোট ক'রে আপনাকেদেখতে শিখি নে। আর আমার উপাসনার মন্দির এই মুক্তআকাশের তলায় যেন চিরযুগ অটুট থাকে। এই ধর্মই আমারভাল।

বাড়ি ফিরে দেখি বৌদিদি অত্যন্ত অসুখে পড়েছে।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কারও সাহায্য পাই নে,ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—দাদার বড় মেয়েটি আট বছরেরহ'ল, সে সমস্ত কাজ করে, আমি রাঁধি আবার বৌদিদির সেবাশুশ্রূষা করি। রোগিণীর ঠিকমত সেবা পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও আমি আর খুকীতে মিলে যতটা পারি করি।

বৌদিদির অসুখ দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ—বৌদিদি অচৈতন্য হয়ে বিছানায় শুয়ে, ছেলেমেয়েরা যা খুশী তাই করছে, ঘরের জিনিসপত্রভাঙছে, ফেলছে, ছড়াচ্ছে—এখানে নোংরা, ওখানেঅপরিষ্কার—কোন্ জিনিস কোথায় থাকে কেউ বলতে পারেনা, হঠাৎ অসময়ে আবিষ্কার করি ঘড়ায় খাবার জল নেই, কি লণ্ঠন জ্বালাবার তেল নেই। বাজার নিকটে নয়, অন্তত দেড় মাইল দূরে এবং বাজারে যেতে হবে আমাকেই।সুতরাং বেশ বোঝা যাবে অসময়ে এসব আবিষ্কারের অর্থ কি।

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাটল। এই এক মাসের কথাভাবে আমার ভয় হয়। আমি জানতুম না কখনও যেজগতে এত দুঃখ আছে বা সংসারের দায়িত্ব এত বেশী। রাত দিন কখন কাটে ভুলে গেলাম, দিন, বার, তারিখের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলুম—কলের পুতুলের মত ডাক্তারের কাছে যাই, রোগীর সেবা করি, চাকরি করি, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করি। এই দুঃসময়ে দাদার আটবছরের মেয়েটা আমাকে অদ্ভুত সাহায্য করলে। সে নিজেরাঁধে, মায়ের পথ্য তৈয়ারী করে, মায়ের কাছে বসেথাকে—আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাই ওকে ব'লে যাইঠিক সময় ওষুধ খাওয়াতে, কি পথ্য দিতে।

মেজাজ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, একদিন কোথা থেকে এসে দেখি রোগিণীর সামনের ওষুধের গ্লাসে ওষুধ রয়েছে। খুকীকে ব'লে গিয়েছিখাওয়াতে কিন্তু সে ওষুধ গ্লাসে ঢেলে মায়ের পাশে রেখেদিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। দেখে হঠাৎ রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আর ঠিক সেই সময় খুকী আঁচলে কি বেঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি রুক্ষ সুরে বললাম—খুকীএদিকে এস—

আমার গলার সুর শুনে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।সে ভয়ে ভয়ে দু-এক পা এগিয়ে আসতে লাগল, বারবারআমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বললাম—তোরমাকে ওষুধ খাওয়াস নি কেন ?কোথায় বেরিয়েছিলি বাড়িথেকে ?

সে কোনো জবাব দিতে পারল না—ভয়ে নীলবর্ণ হয়েআমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কি যে রাগহল চণ্ডালের মত। তাকে পাখার বাঁট দিয়ে আতালি-পাতালি মারতে লাগলাম—প্রথম ভয়ে মার খেয়েও সে কিছু বললেনা, তার পরে আমার মারের বহর দেখে সে ভয়ে কেঁদে উঠে বললে—ও কাকাবাবু আপনার পায়ে পড়ি, আমায়মারবেন না, আর কখনও এমন করবো না—

তার হাতের মুঠো আল্গা হয়ে আঁচলের প্রান্ত থেকেদুটো মুড়ি পড়ে গেল মেজেতে। সে মুড়ি কিনতে গিয়েছিল এক পয়সার, খিদে পেয়েছে ব'লে। ভয়ে তাও যেন তারমনে হচ্ছে কি অপরাধই সে ক'রে ফেলেছে।

আমার জ্ঞান হঠাৎ ফিরে এল। মুড়ি ক'টা মেজেতে পড়েযাওয়ার ঐ দৃশ্যে বোধ হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরথেকে বার হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন ভাবলাম—ছি, এ কিক'রে বসলাম ! আট বছরের কচি মেয়েটা সারাদিন ধরেখাটছে, এক পয়সার মুড়ি কিনতে গিয়েছে আর তাকে এমনক'রে নির্মমভাবে প্রহার করলাম কোন্ প্রাণে ?

জীবনে কত লোকের কত বিচার করেছি তাদেরদোষগুণের জন্যে—দেখলাম কাউকে বিচার করা চলনা—কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কে কি করে সে কথা কি কেউ বুঝে দেখে ?

বৌদিদির অসুখ ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। দিন-দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দেখে ভয়ে আমার প্রাণউড়ে যাচ্ছে। এদিকে এক মহা দুশ্চিন্তা এসে জুটল, যদিবৌদিদি না-ই বাঁচে—এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করব ?বিশেষ করে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কি করি ?ছোট খুকী মোটে এই দশ মাসের—কি সুন্দর গড়ন, মুখ, কিচমৎকার মিষ্টি হাসি ! এই দেড় মাস তার অযত্নের একশেষহচ্ছে—উঠোনের নারকোলতলায় চটের থলে পেতে তাকেরোদুরে শুইয়ে রাখা হয়—বড় খুকী সব সময় তাকে দেখতেপারে না—কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্তন্য বন্ধ এইদেড় মাস—হর্লিকস্ খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে। রাতে আমার পাশে তাকে শুইয়ে রাখি, মাঝরাতে উঠে এমন কান্না শুরুকরে মাঝে মাঝে—ঘুমের ঘোরে উঠে তাকে চাপড়ে চাপড়েঘুম পাড়াই—বড় খুকীকে আর ওঠাই নে। রাতে তো প্রায়ই ঘুম হয় না, রোগীকে দেখা-শুনো করতেই রাত কাটে—মাঝেমাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। পাড়ায় এত বৌ-ঝি আছে—দেখেবিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বলে না খুকীকে নিয়েগিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই। আমি একা কত দিকেযাব—তা ছাড়া আমার হাতের পয়সাও ফুরিয়েছে। এই দেড়মাসের মধ্যে সংসারের রূপ একেবারে বদলে গিয়েছেআমার চোখে—আমি ক্রমেই আবিষ্কার করলাম মানুষ মানুষকে বিনাস্বার্থে কখনও সাহায্য করে না—আমি দরিদ্র,আমার কাছে কারুর কোনো স্বার্থের প্রত্যাশা নেই, কাজেই আমার বিপদে কেউ উঁকি মেরেও দেখতে এল না। না আসুক, কিন্তু কোলের খুকীটাকে নিয়ে যে বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম। ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে। ওর অমন কাঁচাসোনার রঙের ননী র পুতুলেরমত ক্ষুদ্রে দেহটিকে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কিকরবো ভেবে পাই নে, আমি একেবারেই নিরুপায় ! স্তন্যদুগ্ধ আমি ওকে দিতে তো পারি নে !

কিন্তু এর মধ্যে আবার মুশকিল এই হল যে স্তন্যদুগ্ধ তোদূরের কথা, গরুর দুধও গ্রামে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। গোয়ালারা ছানা তৈরি করে কলকাতায় চালান দেয়, দুধকেউ বিক্রী করে না। একজন গোয়ালার বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটা-একটার এদিকে দুধদিত না। খুকী ক্ষিদেতে ছটফট করত, কিন্তু চুপ করে থাকত—একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো আঙুলটা তারমুখের কাছে সে সময়ে ধরলেই সে কচি অসহায় হাত দুটি দিয়ে আমার আঙুলটা তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বুঝতাম মাতৃস্তন্য-বঞ্চিতএই হতভাগ্য শিশুর স্তন্যক্ষুধার পরিমাণ।

ওকে কেউ দেখতে পারে না—দু-একটি পাড়ার মেয়েযারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানারকম মন্তব্যকরত। ওর অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারাগেল, ওর মা শক্ত অসুখে পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাসযখন-তখন হাস্য—কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক, সে আপনমনে ঘরের আড়ার দিয়ে চেয়ে ফিক্ করে একগাল হাসবে। তার সে ক্ষুধাশীর্ণ মুখের পবিত্র, সুন্দর হাসি কতবার দেখেছি—কিন্তু সবাই বলত, আহা কি হাসেন, আর হাসতেহবে না, কে তোমার হাসি দেখছে ?উঠোনেরনারকোলতলায় চট পেতে রৌদ্রে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কত দিন দেখেছি নীল আকাশের দিকে চোখ দুটি তুলে সে আপনমনে অবোধ হাসি হাসছে। সে অকারণ, অপার্থিব হাসি কি অপূর্ব অর্থহীন খুশিতে ভরা ! ছোট্ট দেহটিদিন-দিন হাড়সার হয়ে যাচ্ছে। অমন সোনার রং কালো হয়ে গেল, তবুও ওর মুখে সেই হাসি দেখছি মাঝেমাঝে—কেন হাসে, কি দেখে হাসে।

এক এক দিন রাতে ঘুম ভেঙে দেখি ও খুব চোঁচিয়ে কাঁদছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। বড় খুকীকে বলতাম—একটু দুধ দে তো গরম ক’রে, হয়তখিদেয় কাঁদছে। সব দিন আবার রাতে দুধ থাকত না। সেদিনআঙুল চুষিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াতে হ’ত। একদিনসকালে ওর কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না—রোগীরসেবা ফেলে দু-ক্রোশ তফাতের একটা গ্রাম থেকে নগদপয়সা দিয়ে আধসের দুধ যোগাড় করে নিয়ে এসে ওকেখাওয়ালুম। গোয়ালাকে কত খোশামোদ করেও বেলাবারোটীর আগে কিছুতেই দুধ দেওয়ানো গেল না।

মানুষ যদি বিবেচনাহীন হয়, নির্বোধ হয়, তবে বাইরেথেকে তাকে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর মনে করা দোষের নয়। যখন খুকীর দুধের জন্যেআমি সারা গ্রামখানার প্রত্যেক গোয়ালাবাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছি যদি সকালের দিকে কেউএকটু দুধ দিতে পারে—যে বলেছে হয়ত ওখানে গেলেপাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি, আগাম টাকা দিতেচেয়েছি কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—সেসময় ঠিক আমার বাড়ির পাশেই সুরপতি মুখুজ্যের বাড়িতে দেড় সের করে দুধ হ’ত। সুরপতি সস্ত্রীক বিদেশে থাকেন, বাড়িতে থাকেন তাঁর বিধবা ভাজ নিজের একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে। এঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা কোঠা বাড়ি, ছ-সাতটা গরু, জমিজমা, ধানভরা গোলা। সকালে মায়ে-ঝিয়ের চা খাবার জন্যে দুধ দোয়া হত, মেয়েটানিজেই গাই দুইতে জানে, সকালে আধ সের দুধ হয়, দুপুরেবাকী এক সের। ওঁরা জানেন যে দুধের জন্যে খুকীর কি কষ্টযাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে আমারও এ সম্বন্ধে কথাও হয়েছেঅনেকবার। আমায় অনেকবার প্রৌঢ়া মহিলাটি জিজ্ঞেসও করেছেন আমি দুধের কোন সুবিধা করতে পারলাম কি না—দু-চার দিন সকালে ডেকে আমায় চা-ও খাইয়েছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি, এই দুধটুকু নিয়ে গিয়ে খুকীকেখাওয়াও ততক্ষণ। আমিও কখনও তাঁদের বলি নি এ নিয়ে, প্রথমত আমার বাধ-বাধ ঠেকেছে, দ্বিতীয়ত আমার মনেহয়েছে, এঁরা সব জেনেও যখন নিজে থেকে দুধের কথা বলেন নি, তখন আমি বললেও এঁরা ছলছুতো তুলে দুধদেবেন না। তবুও আমি এঁদের নিষ্ঠুর বা স্বার্থপর ভাবতে পারি নে—বিবেচনাহীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব এঁদের এরকম করে তুলেছে।

কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—“ওর কষ্টআমি আর দেখতে পারি নে, আপনি ওকে একটু দুধ দিন।”

ওর মুখের সে অবোধ উল্লাসের হাসি প্রতিবার ছুরিরমত আমার বুকে বিঁধেছে। কতবার মনে মনে ভেবেছি আমি যদি দেশের ডিক্টেটর হতাম, তবে আইন করে দিতামশিশুদের দুধ না দিয়ে কেউ আর কোন কাজে দুধ লাগাতেপারবে না।

কতবার ভেবেছি বৌদিদি যদিনা বাঁচে, এই কচি শিশুকেআমি কি করে মানুষ করব ? স্তন্যদুগ্ধ একে কেউ দেবে নাএই পাড়াগাঁয়ে, বিলিয়ে দিলেও মেয়েসস্তান কেউ নিতেচাইবে না—নিতান্ত নীচু জাত ছাড়া। আটঘরাতে থাকতেছেলেবেলায় এরকম একটা ব্যাপার শুনেছিলুম—গ্রামের শশীপদ ভট্টচার্যের কেউ ছিল না—এদিকে শিশু দুটিই মেয়ে, অবশেষে যদু মুচির বৌ এসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সোনার খুকীকে সেই রকম দিতে হবে পরের হাতে ? কত বিনীত রজনী কাটিয়েছি ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়েএই ভাবনায়। এই বিপদে আমার প্রায়ই মনে হয়েছেমালতীর কথা। মালতী আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, সে কোন উপায় বার করবেই, যদি খুকীকে বুকে নিয়ে তারকাছে গিয়ে দাঁড়াই। সে চুপ করে থাকতে পারবে না। তারওপর অভিমান করে চলে এসেছিলাম, দেখা পর্যন্ত করে আসি নি আসবার সময়—আর তার পর এতদিন কোনখোঁজখবর নিই নি—একখানা চিঠি পর্যন্ত দিই নি, আমার বিপদের সময় সে আমার সব দোষ ক্ষমা করে নেবে।

কিন্তু খুকী আমায় সব চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকেসে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যেএসেছিল কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল। কিছুই সে চায় নি, শুধুএকটু মাতৃস্তন্য, কি লোলুপ হয়ে উঠেছিল তার জন্যে, তারক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুটি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমার আঙুলটা আঁকড়ে ধরে কি অধীর আগ্রহে সেটা চুষত মাতৃস্তন্য ভেবে ! আমারও কি কম কষ্ট

গিয়েছে অবোধ শিশুকে এই প্রতারণাকরতে ?জগতে কত লোক কত অসঙ্গত খেয়াল পরিতৃপ্তকরবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে, আর একটি ক্ষুদ্র অক্ষুটবাক্শিশুর নিতান্ত ন্যায্য একটা সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল কেন তাইভাবি।

বৌদিদি ক্রমে সেরে উঠলেন। কিছুদিন পরে আমার হঠাৎ একদিন একটু জ্বর হ'ল। ক্রমে জ্বর বেঁকে দাঁড়াল, আমিঅজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন যায় জ্বরছাড়ে না। একুশ দিন কেটে গেল। দিনের রাতের জ্ঞানহারিয়ে ফেলেছি যেন, কখন রাত কখন দিন বুঝতে পারি নে সব সময়। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখি বাইরের রোদ একটু একটু ঘরে এসেছে, তখন বুঝি এটা দিন। বিছানারওপাশটা ক্রমশ হয়ে গেল বহুদূরের দেশ, আফ্রিকা কিজাপান, ওখানে পৌঁছনো আমার শরীর ও মনের শক্তিরবাইরে। অধিকাংশ সময়ই ঘোর-ঘোর ভাবে কাটে—সেঅবস্থায় যেন কত দেশ বেড়াই, কত জায়গায় যাই। যখনযাই তখন যেন আর আমার অসুখ থাকে না, সম্পূর্ণ সুস্থ, আনন্দে মন ভরে ওঠে, রোগশয্যা স্বপ্ন বলে মনে হয়। ছেলেবেলাকার সব জায়গাগুলোতে আবার গেলাম যেন, আটঘরার বাড়িও বাদ গেল না। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, দেখি কুলদা ডাক্তার বুকে নল বসিয়ে পরীক্ষা করছে।

একবার মনে হ'ল দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, আমি দ্বারবাসিনীতে যাচ্ছি খুকীকে কোলে নিয়ে। দুর্গাপুরের ডাঙাপার হয়ে গেলাম, আবার সেই কাঁদোড় নদী, সেই তালবন, রাঙা মাটির পথ। মালতী বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কি কাজ করছে। উদ্ধবদাস আমায় দেখে চিনলে, কাছে এসে বললে—বাবু যে—কি মনে করে এতদিন পর ? আপনারকোলে কে ? মালতী কাজ ফেলে মুখ তুলে দেখতে গেল উদ্ধবদাস কার সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। তারপর আমায়চিনতে পেরে অবাক ও আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে রইল। আমি এগিয়ে দাওয়ার ধারে গিয়ে বললাম—তুমি কি ভাববে জানিনে মালতী, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েইএসেছি। এই ছোট খুকী আমার দাদার মেয়ে, এর মা সম্প্রতিমারা গিয়েছে। একে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ব্যবস্থা আমারমাথায় আসে নি। আর আমার কেউ নেই—একমাত্র তোমার কথাই মনে হল, তাই একে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। একে নাও, এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর। তুমিছাড়া আর কারও হাতে একে দিয়ে আমি নিশ্চিত হতেপারব না।

মালতী তাড়াতাড়ি খুকীকে আমার কোল থেকে তুলে নিলে। তার পর আমার রুম্ফ চুল ও উদ্ভাস্ত চেহারার দিকেঅবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরক্ষণেই সে দাওয়া থেকে নেমেএসে বললে—আপনি আসুন, উঠে এসে বসুন।

আখড়ায় আর যেন কেউ নেই। উদ্ধবদাসকেও আর দেখলাম না। শুধু মালতী আর আমি। ও ঠিক সেই রকমই আছে—সেই হাসি, সেই মুখ, সেই ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলারভঙ্গি। হেসে বললে—তারপর ?

আমি বললাম—তারপর আর কি ? এই এলাম।

—এতদিন কোথায় ছিলেন ?

—নানা দেশে। তারপর দাদা মারা গেলেন, আমারওপরে ওদের সংসারের ভার।

—উঃ, কি নিষ্ঠুর আপনি !

তারপর সে বললে—আপনি বসুন, খুকীর সম্বন্ধে একটাব্যবস্থা তো করতে হবে। একবার নীরদা-দিদিকে ডাকি।

আমি বললাম—আমি কিন্তু এখনই যাব মালতী। ছোটছোট ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে এসেছি পরের বাড়িতে। আমাকে যেতেই হবে।

মালতী আশ্চর্য হয়ে বললে—আজই ?

আমি বললাম—আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এখনতুমি যা করবে কর খুকীকে নিয়ে। আমি থেকে কি করব ? আমি যাই।

মালতী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—আমায়নিয়ে যান তবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি মালতী ?তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?তোমার এই আখড়া ?

মালতীর সঙ্গে যেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিনটি যেমন ও চোখ নামিয়ে কথা বলেছিল—ঠিক তেমনইভঙ্গিতে চোখ মাটির দিকে রেখে স্পষ্ট ও দৃঢ় সুরেবললে—আপনি আমায় নিয়ে চলুন সঙ্গে যেখানে আপনিযাবেন। এবার আপনাকে একলা যেতে দেব না।

একচল্লিশ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। সেরে উঠলে বৌদিদি একদিন বললেন—জ্বরের ঘোরে ‘মালতী’ ‘মালতী’ বলে ডাকতে কাকে, মালতী কে ঠাকুরপো ?

আমি বললাম—ও একটি মেয়ে। বাদ দাও ও-কথা।রোজ বলতাম ?কত দিন বলেছি ?

এই অসুখ-বিসুখে মাসীমার দেওয়া সেই একশো টাকাতো গেলই, বৌদির গায়ের সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তা-ও গেল। নতুন চাকুরিটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামালপুর বলে একটাগ্রাম আছে। নিতান্ত পাড়াগাঁ এবং জঙ্গলে ভরা। সেখানকারদু-একজন জানাশোনা ভদ্রলোকের পরামর্শে সেখানে একটা পাঠশালা খুললাম। বৌদিদিদের আপাতত কালীগঞ্জ রেখে আমি চলে গেলাম কামালপুরে। একটা বাড়ির বাইরের ঘরেবাসা নিলাম—বাড়ির মালিক চাকুরির স্থানে থাকেন, বাড়িটাতে অনেকদিন কেউ ছিল না। বাড়ির পিছনে একটাআম-কাঁঠালের বাগান।

পাঠশালায় অনেক ছেলে জুটল—কতকগুলি ছোট মেয়েও এল। যা আয় হয়, সংসার একরকমে চলে যায়।

সময় বড় মনের দাগ মুছে দেবার মন্ত্র জানে। আবার নতুন মন, নতুন উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটানতুন অধ্যায় কি রকমে শুরু হ’ল তাই এখানে বলব।

পাঠশালা খুলবার পরে প্রায় দু-বছর কেটে গিয়েছে।ভাদ্র মাস। বেশ শরতের রোদ ফুটেছে। বর্ষার মেঘ আকাশেআর দেখা যায় না। একদিন আমি পাঠশালায় গিয়েছি, একটা ছোট মেয়ে বলছে—মাস্টার মশায়, পেনোহিরণদিদির হাত আঁচড়ে কামড়ে নিয়েছে, ওই দেখুন ওরহাতে রক্ত পড়ছে।

যে মেয়েটির হাত আঁচড়ে নিয়েছে তার নাম হিরণ্যায়ী, বয়স হবে বছর চৌদ্দ, পাঠশালার কাছেই ওদের বাড়ি—কিন্তু মেয়েটি আমার পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বেশীদিন নয়। ওর বাবার নাম কালীনাথ গাঙ্গুলী, তিনি কোথাকারআবাদের নায়েব, সেইখানেই থাকেন, বাড়িতে খুব কমইআসেন।

আমি লক্ষ্য করেছি এই মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত চঞ্চল। সকলের চেয়ে সে বয়সে বড়, সকলের চেয়ে সভ্য ও শৌখীন। কিন্তু তার একটা দোষ, কেমন একটু উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে।

একদিন কি একটা অঙ্ক ওকে দিলাম, সবাইকে দিলাম।ওর অঙ্কটা ভুল গেল। বললাম—তুমি অঙ্কটা ভুল করলেহিরণ ?

অঙ্কটা ভুল গিয়েছে শুনে বোধ হয় ওর রাগ হল—আর দেখেছি সব সময়, অপর কারোর সামনে বকুনি খেলে ক্ষেপে ওঠে। খুব সম্ভব সেই জন্যই ও রাগের সুরেবললে—কোথায় ভুল ?কিসের ভুল বলে দিন না ?

আমি বললাম—কাছে এস, অতদূর থেকে কি দেখিয়েদেওয়া যায় ?

আমি দেখে আসছি যে কদিন ও এসেছে, আমার কাছথেকে দূরে বসে।

ও উদ্ধতভাবে বললে—কেন, ওখান থেকেই বলুন না ?আপনার কাছে কেন যাব ?

আমার মনে হ’ল ও বড় মেয়ে বলে আমার কাছেআসতে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু তার জন্যে ওরকম উদ্ধত সুর কেন ?বললাম—কাছে এসে অঙ্কদেখেনিতে দোষ আছে কিছু ?

ও বললে—সে-সব কথার কি দরকার আছে ?আপনি দিন অঙ্ক ওখান থেকেই বুঝিয়ে।

রাগে ও বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠল। আচ্ছামেয়ে তো ?মাস্টারদের সঙ্গে কথাবার্তার এই কি ধরন ?আর আমায় যখন এত অবিশ্বাস তখন আমার স্কুলে নাএলেই তো হয় ?সেদিন আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথাইবললাম না। পরদিনও তাই, স্কুলে এল, নিজে বসে বসে কিলিখলে বই দেখে, একটা কথাও কইলাম না। ছুটির কিছু আগে আমায় বললে—আমার ইংরেজিটা একবার ধরুননা ?

আমি ওর পড়াটা নিয়ে তারপর শান্তভাবে বললাম—হিরণ, তোমার বাড়িতে ব'লো, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। অন্য ব্যবস্থা করতে বলো কাল থেকে।

হিরণ্যীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, বললে—কেন ?

আমি বললাম—না—তুমি বড় মেয়ে, এখানে তোমারসুবিধে হবে না।

ও বললে—রাগ করেছেন নাকি ?কি করেছি আমি ?

আমি বললাম—কাল তোমার ও-কথাটা কি আমায় বলা উচিত হয়েছে, হিরণ ?কি বলে তুমি বললে, আপনার কাছে কেন যাব ?...ওখান থেকেই বলুন না ?তুমি আমার কাছেতবে পড়তে এসেছ কেন ?

হিরণ্যী হেসে বললে—এই ! তা কি এমন বলেছিআমি ?তা যখন আপনি বলছেন দোষ হয়েছে বলাতে, তখনদোষ নিশ্চয়ই হয়েছে।

—কেন তুমি বললে ওরকম ?তোমার দুঃখিত হওয়াউচিত ওকথা বলার জন্যে, তা জান ?

হিরণ্যী বললে—হ্যাঁ, হয়েছে। হল তো ?এখন নিন।

তারপর যখন ওর অঙ্ক দেখছি, তখন হঠাৎ আমার মুখের দিকে কেমন একটা বুঝতে না পারার দৃষ্টিতে চেয়েবললে—উঃ, আপনার এত রাগ ?...আগে তো কখনও রাগ দেখি নি এরকম ?...তখনও সে আমার মুখের দিকেসেইরকম দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। ওররকম-সকম দেখে আমি হাসি চাপতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে হিরণ্যীকে নতুন চোখে দেখলাম। দেখলাম হিরণ্যী অত্যন্ত লাভণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত ডাগর, টানা-টানা জোড়া ভুরু দুটি কালো সরু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।

ও তখনও আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। একমিনিটের ব্যাপারও নয় সবটা মিলে।

পরদিন থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হিরণ্যীআমার কাছ থেকে তত দূরে আর বসে না—আর নাডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন আমায় বললে—জানেন মাস্টার মশায়, আমারসব দল এরা—আমায় এরা ভয় করে।

অবাক হয়ে বললুম—কারা ?

হাত দিয়ে পাঠশালার সব ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিয়েবললে—এরা। আমার কথা না শুনে কেউ চলতে পারে না।

—ভয় করে কেন ?

—এমনি করে। আমি যা বলব ওদের শুনতেই হবে।

পাঠশালার সকলেরই ওপর সে হুকুম ও প্রভুত্ব চালায়। এটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—সেদিন থেকে সেটালক্ষ্য করলাম। তবে পেনো যে সেদিন ওর হাত আঁচড়ে দিয়েছিল সে আলাদা কথা। দেশের রাজার বিরুদ্ধেও তোতাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়।

রোজ রাত্রে বাসায় এসে সন্ধ্যাবেলা পরোটা গড়ি। দু-একদিন পরে সন্ধ্যাবেলা ময়দা মাখছি একা রান্নাঘরে বসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী নয়, একটা হ্যারিকেন-লঠনজ্বলছে ঘরে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যেদাঁড়িয়ে হিরণ্যী। শশব্যস্তে উঠে বিস্মিত মুখে বললাম—হিরণ ! এস, এস, কি মনে করে ?

হিরণ্যীর একটা স্বভাব গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি, কখনই প্রশ্নের ঠিক জবাবটি দেবে না। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—ময়দা মাখেন বুঝি নিজে রোজ ? এই বুঝি ময়দা মাখা হচ্ছে ?

আমি বিপন্ন হয়ে পড়লুম—চোদ্দ বছরের মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে বড়ই বলে। আমার কাছে এ রকম অবস্থায় আসাটা কি ঠিক হল ওর ? এসব জায়গার গতিক আমি জানিতো।

বললাম—তুমি যাও হিরণ, পড় গে।

হিরণ্যী হেসে বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ? আমি যাব না—এই বসলাম।

বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে, আমি তো জানি ওকে। বললে—একটা অঙ্ক কষে দেবেন ? না—থাক, একটা গল্প বলুন না !...ও, আপনি বুঝি ময়দা মাখবেন এখন ! সরুন, সরুন দিকি। আমি মেখে বেলে দিচ্ছি। কি হবে—রুটি, নালুচি ?...আপনি এই পিঁড়িটাতে বসে শুধু গল্প করুন।

সেই থেকে হিরণ্যীর রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাহায্য করতে আসা চাই-ই। মৃদু প্রদীপের আলোতে হাসি-হাসি মুখে সে তার খাতাখানা খুলে নামে অঙ্ক কষে—কাজে কিন্তু সে আমার রুটি-পরোটা তৈরী করে দেয়। কিছুতেই আমার বারণ শোনে না—ওর সঙ্গে পারব না বলে আমিও কিছু আর বলিনে। ওর মায়ের বারণও শোনে না, একদিন কথাটা আমার কানে গেল।

শুনলাম একদিন মাকে বলছে ওদের বাড়ির উঠোনেদাঁড়িয়ে—কেন, যাই তাই কি ? আমি অঙ্ক কষতে যাই। বেশ করি—যাও।

হিরণ্যীকে বললাম—শোন হিরণ, আমার এখানে সন্ধ্যাবেলা আর এস না, যখন তোমার মা বকেন। মার কথাটা অন্তত তোমার মানা উচিত। বুঝলে ?

পরদিন হিরণ্যী সত্যিই আর এল না। আমার সন্ধ্যাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ওর না আসাতে, সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম। সাত-আট দিন কেটে গেল—হিরণ্যী পাঠশালাতে রোজই আসে। তাকে জিজ্ঞেস করা করি না অবিশ্যি কেন সে সন্ধ্যাবেলা আসে না।

একদিন সে পাঠশালাতেও এল না। দু-তিন দিন পরে জিজ্ঞেস করে জানলাম সে মামার বাড়ি গিয়েছে তার মায়ের সঙ্গে।

দেখে আশ্চর্য হলাম যে আমার পাঠশালা আর সেপাঠশালা নেই—আমার সন্ধ্যাও আর কাটে না। হিরণের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ওর মামার বাড়ি থেকে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছে—বরপক্ষ ওখানে মেয়েকে আশীর্বাদ করবে।

মানুষের মন কি অদ্ভুত ধরনের বিচিত্র ! হঠাৎ কথাটা শুনেই মনে হল ও গাঁয়ের পাঠশালা উঠিয়ে দেব, অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে। কেন, যখন প্রথম পাঠশালা খুলেছিলাম এ গাঁয়ে, তখন তো হিরণের অপেক্ষায় এখানে আসি নি, তবে সে থাকলো বা গেল—আমার তাতে কি আসে যায় ?

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। আমি কলের মত কাজ করে যাই, একদিন সামান্য একটু বাদলা মত হয়েছে—পাঠশালার ছুটি দিয়ে সকাল-সকাল রান্না সেরে নেব বলে রান্নাঘরে ঢুকেছি, বেলা তখনও আছে। এমন সময় দোরের কাছে দেখি হিরণ্যী এসে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়েছে। আমি বিস্ময়মিশ্রিত খুশীর সুরে বলে উঠলাম—এস, এস হিরণ,—কখন এলে তুমি ? ব'সো।

হিরণ্যী বললে—কেমন আছেন আপনি ?তারপর সে এগিয়ে এসে সলজ্জ আড়ষ্টতার সঙ্গে ঝপ্ করে আমারপায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে আবার সোজা হয়ে দোরেরকাছে দাঁড়ালো।

আমি এত খুশী হয়েছি তখন, ওকে কি বলবো ভেবেপাইনে যেন। বললাম—ব'সো হিরণ, দাঁড়িয়ে কেন ?

হিরণ্যী বোধ হয় একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এসেছিল, আমি ওর আসাটা কি চোখে দেখি—এ নিয়ে। আমার কথাশনে—হাজার হোক নিতান্ত ছেলেমানুষ তো—ও যেন ভরসা পেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা পিঁড়ি পেতে বসল।আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি সেই শিথিয়েদিলেন, 'নয় পরিত্যাগ-প্রণালী' না কি ?সব ভুলে গিয়েছি—হি-হি—

দেখলাম ওর বিয়ে হয় নি।—ওকে আর কোন কথা বলি নি অবিশ্যি তা নিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে সে-সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিন পরে অপরের মুখে শুনলাম। আবার হিরণ্যী আমার পাঠশালাতে নিত্য আসে যায়—সন্ধ্যাবেলাতেও রোজ আসে—ঝড় হোক বৃষ্টি হোক, তার সন্ধ্যায় আসা কামাই যাবে না। কেন তার মা এবার তাকে বকেন না—সেকথা আমি জানি নে—তবে বকেন না যে, এটা আমি জানি।

বরং একদিন হিরণ্যী বললে—আজ আলো জ্বলেএকটা বই পড়ছি, মা বললে আজ যে তুই তোর মাস্টারের কাছে গেলিনে বড় ?তাই এলুম মাস্টার মশায়।

আমি বললাম—তা বেশ তো, গল্পের বই পড়লেইপারতে। মা না বলে দিলে তো আজ আসতে না ?

কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অলক্ষিতে একটা অভিমানের সুর বার হয়ে গেল—হিরণ্যী সেটা বুঝতে পেরেছে অমনি। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এইটুকু বয়সে। বললে—নি, আর রাগ করে না। ভেবে দেখুন, আপনি না আমায় এখানে এলে তাড়িয়ে দিতেন আগে আগে ?

দুগুণিত ভাবে বললাম—ছিঃ ও-কথা বলো না হিরণ, তাড়িয়ে আবার তোমায় দিয়েছি কবে ?ও-কথাতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

হিরণ্যী মুখে কাপড় দিয়ে খিল খিল করে উচ্ছ্বসিত ছেলেমানুষি হাসির বন্যা এনে দিল। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়েবলতে লাগল—না—না দেন নি ?বটে ?একদিন সেইতাড়ালেন না ! আজ আবার বলা হচ্ছে—। পরে আমারসুরের নকল করতে চেষ্টা করে—'ওতে আমার মনে কষ্টদেওয়া হয়'—কি মানুষ আপনি !—হি-হি-হি-হি—

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত সুকুমার লাভণ্যভরা মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—চোখ আর ফেরাতে পারিনে—কি অপূর্ব হাসি ! কি অপূর্ব চোখমুখের শ্রী !

যখন চোখ নামিয়ে নিলাম তখন সে আমার বেলুনটাতুলে নিয়ে রুটি বেলতে বসে গিয়েছে। সেদিন ও যখনচলে যায়, ঝাঁকের মাথায় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ওকেআবার বললাম—এ রকম আর এস না, হিরণ ! না, সত্যিবলছি তুমি আর এস না।

মনকে খুব দৃঢ় করে নিয়ে কথাটা বলে ফেলেই ওর মুখেরদিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর খচ্ করে বিঁধলো। দেখলাম ও বুঝতে পারে নি আমি কেনএকথা বলছি—কি বোধ হয় দোষ করে ফেলেছে ভেবে ওরমুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে উদ্বেগ ও ভয়ে।

আমার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে রইল—যদি মুখের ভাবে কারণ কিছু বুঝতে পারে। না বুঝতে পেরে যাবার সময় দেখলাম শুষ্ক বিবর্ণ মুখে বললে—আমায় তাড়িয়ে দিলেন তো, এই দেখুন—তাড়ালেন কি না।

দুগুণে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। নিমগাছটার তলাদিয়ে ও ওই যাচ্ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি, ডেকে দুটোমিষ্টি কথা বলব ?ছেলেমানুষকে একটু সান্ত্বনা দেব ?

ডাকলুম শেষটা না পেরে।—শোনো ও হিরণ—শোনো—

ও দাঁড়াল না—শুনেও শুনল না। হন্ হন্ করে হেঁটেবাড়ি চলে গেল। পরদিন খুব সকালে উঠে বারান্দাতে বসেব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ছি—হিরণ এসে দাঁড়িয়েবললে—কি খাচ্ছেন ?

—এস এস হিরণ। কাল তোমাকে ডাকলাম রাত্রে, এলে না কেন ? তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে—একবার শোনা উচিতছিল না কি বলছি ?

মুখরা বালিকা এবার নিজমূর্তি ধরলে। বললে—আমিকি কুকুর নাকি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন, আবার তুকের ডাকলেই ছুটে আসব ? আপনি বুঝি মনে ভাবেন আমারশরীরে ঘেন্না নেই, অপমান নেই—না ? আমি বলতে এলাম সকালবেলা যে আপনার পাঠশালায় আমি পড়তে আসবনা।—মা অনেক দিন আগেই বারণ করেছিল—তবুও আসতাম, তাদের কথা না শুনে। কিন্তু যখন আপনিকুকুর-শেয়ালের মত দূর করে তাড়িয়ে—

ওর চোখে জল ছাপিয়ে এসেছে—অথচ কি তেজ ও দর্পের সঙ্গে কথাগুলো সে বললে ! আমি বাধা দিয়েবললাম—আমায় ভুল বুঝো না ! ছিঃ হিরণ—আচ্ছা, চোঁচিওনা বেশী, কেউ শুনলে কি ভাবে। আমার কথা শোন—রাগকরে না ছিঃ !

হিরণ দাঁড়াল না এক মুহূর্তও। অতটুকু মেয়ের রাগ দেখেযেমন কৌতুক হল, মনে তেমনই অত্যন্ত কষ্টও হল। কেনমিথ্যে ওর মনে কষ্ট দিয়েছি কাল ? আহা, বেচারী বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়েছে। আমার জ্ঞান আর হবে কবে ? ছেলেমানুষকে ও-কথাটা ও-ভাবে বলা আমার আদৌ উচিতহয় নি।

মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল—ভাবলাম, এ গ্রামেরপাঠশালা তুলে দিয়ে অন্যত্র যাবই। এদিকে হিরণুয়ীও আরআমার পাঠশালাতে আসে না। মাসের বাকি আটটা দিন পড়িয়ে নিয়ে পাঠশালা তুলে দেব ঠিক করে ফেললাম। সবাইকে বলেও রাখলাম কথাটা। আগে থেকে যাতে সবাইঅন্য ব্যবস্থা করে নিতে পারে।

যাবার দু-দিন আগে জিনিসপত্র গোছাচ্ছি—হঠাৎ হিরণুয়ী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে ওর দিকে চাইতেই হেসে ফেললে। বললে—আপনি নাকি চলে যাবেন এখান থেকে ?

আমি বললাম—যাবই তো। তার পর, এত দিন পরে কিমনে করে ?

হিরণুয়ী তার অভ্যাসমত আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললে—কবে যাবেন ?

—বুধবার বিকেলে গাড়ি ঠিক করা আছে, চাকদাতেগিয়ে উঠবো।

হিরণুয়ী একবার ঘরের চারিধারে চেয়ে দেখল। বললে—আপনার সে বড় বাক্সটা কই ?

—সেটা কানুর বাবার কাছে বিক্রী করে দিয়েছি। অত বড় বাক্স কি হবে ! তাছাড়া সঙ্গে টেনে টেনে নিয়েবেড়ানোও মুশকিল।

হঠাৎ হিরণুয়ী ঝপ ক'রে মেঝেতে বসে পড়ল—কর্তৃত্বও আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললে—না, আপনি যেতে পারবেননা। দেখি দিকি কেমন যান ?

আমার হাসি পেল ওর রকম দেখে। খুব আনন্দও হল—একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ হল। বললাম তোমার তাতে কি, আমি যাই আর না-যাই ? তুমি তো আর এতদিনউঁকি মেরেও দেখতে আস নি হিরণ, তুমি আমার পাঠশালাপর্যন্ত যাওয়া ছেড়েছ।

—ইস্ ! তাই বৈ কি ?

—তুমি ভেবে দেখ তাই কি না। উড়িয়ে দিলে চলবে না হিরণ, আমি যাবই ঠিক করেছি, তুমি আমায় আটকাতেপারবে না। কারুর জন্যে কারুর আটকায় না—এ তুমিনিজেই আমায় একদিন বলেছিলে।

হিরণুয়ী বালিকাসুলভ হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলেবললে—ওই ! কথা যদি একবার শুরু করে দিলেন তো কি আর আপনার মুখের বিরাম আছে ? কারুর জন্যে কারুরআটকায় না, হেন না তেন না—মাগো—কথার ঝুড়ি একেবারে !

—সে যাই হোক, আমি যাবই।

—কখখনো না। উঃ বললেই হল যাব !

আমি চুপ করে রইলাম—ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক করে আর লাভ কি ?

দেখি যে বিকেলে পাঠশালায় হিরণ্যী বইখাতা নিয়েহাজির হয়েছে। সে এসে সব ছেলেমেয়েকে বলে দিলে আমার পাঠশালা উঠবে না, আমি কোথাও যাব না, সবাইয়েন ঠিকমত আসে। এমন সুরে বললে যে সে যেন আমারদগুমুণ্ডের মালিক। বললে—এই হাঁদু, মাস্টার মশায় তোমায়বলেছিলেন না ধারাপাত আনতে—কেন আন নি ধারাপাত ?এই সোমবারের হাট থেকে আনতে বলে দেবে। বুঝলে ?

হাঁদু বোকার মত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—মাস্টারমশাই যে সোমবার চলে যাবেন এখান থেকে ?

হিরণ্যী তাকে এক তাড়া দিয়ে বললে—কে বলেছে চলে যাবেন ?মেরে হাড় ভেঙে দেব ছোঁড়ার ! যা যা বলছি তা শোন। বাঁদর কোথাকার—

আমি বললাম—কেন ওকে মিথ্যে বকছ হিরণ, ছেলেমানুষকে—ওর দোষ কি, আমি যাবই, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

হিরণ্যী ঝঙ্কার দিয়ে বলল—আচ্ছা আচ্ছা হবে। যাবেনতো যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনেকদিন পরে ও রান্নাঘরে এসেচুকল। বললে—গুড়ের ভাঁড়টা কই !

—সেটা তিনকড়িদের দিয়ে দিইছি। দু-দিনের মত খানিকটা গুড় ওই বাটিতে রেখেছি—দুটো দিন ওতেই চলেযাবে।

হিরণ্যী অন্য দিনের মত বসল না দাঁড়িয়ে রইল।একবার বাইরে যাবার সময় ও সেরে দরজার কপাটের আরদেওয়ালের মধ্যের যে জায়গাটুকু, সেখানটাতে দেখিজড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলাম—ওখানে না, ওখানে না, কাপড়ে কালিটালি লেগে যাবে কি না—বারহয়ে এস—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভরে টল্ টল্ করছে। হিরণ্যীর চোখে জল ! অর্থাৎ, এ দৃশ্যতো কখনও দেখি নি ! ও জল-ভরা ধরা-গলায় বললে—আপনিবলুন, যাবেন না মাস্টার মশায়। আমি তখন পাঠশালায়বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তাহলে।আর কেউ নয়—আর সবাই আমায় ভয় করে, কেবল ওই মন্টুটা বড় দুষ্ট !

তারপর আমার দিকে চোখের জল আর হাসি মিশানো এক অপূর্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—যাবেন না, কেমন ?

হিরণ্যী এই প্রথম দুর্বলতা প্রকাশ করলে—এর আগেকখনও দেখি নি। ছেলেমানুষ, ও কথা তো তেমন জানে না, কিন্তু ওর ডাগর সজল চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ওর ভাষায়দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে এমন কিছু প্রকাশ করলে—এক জাহাজকথাতে তা প্রকাশ করা যেত না।

আমার মনে অনুতাপ হল—কেন ওকে মিথ্যে কাঁদালাম সন্ধ্যাবেলাটিতে ?

জীবনের এই-সব মুহূর্তেই না মানুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষকরে ?ব্রাউনিঙের ‘পলিন’ কবিতার সেই সর্বহারার লোকটির মত আমার মনও ভরে উঠল - I believe in God and Truth and Love !...

ওর হাতটি ধরে দরজার কপাটের ফাঁক থেকে বার করেএনে আন্তে আন্তে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়েবললাম—ওখানে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াতে নেই। বিছেটিছে বেরুতে পারে—এখানে বোস। রুটিগুলো বেলে দাও দিকি, লক্ষ্মী মেয়ে। আমি যাব না—বলছ তুমি যখন, তখন আরযাব না। চোখের জল ফেলতে আছে অবেলায় ?ছিঃ—

তার পরই রুটি তৈরি করতে বসে যে হিরণ্ময়ীসেইহিরণ্ময়ী—সেই মুখরা বালিকা, যে সকল কথা এমনকর্তৃত্বের সুরে বলে যেন ওর কথা না মেনে চললে ও ভয়ঙ্করএকটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবে, সেটা আবার খুবকৌতুকপ্রদ ও ভেবে দেখলে করুণ বলেই মনে হয়, যখনবুঝতে পারা যাচ্ছে যে মুখের বুলিটুকু ছাড়া ওর হুকুমের পেছনে ওর কোন জোর খাটাবার নেই—নিতান্ত অসহায় ওনিরুপায়।

প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি সূত্র ধরে। বড় বড় ঘটনাকে এড়ানো সহজ, কিন্তু এই সব ছোট জিনিস প্রাণে গেঁথে থাকে—ফলুই মাছের সরু চুল-চুল কাঁটার মত। গায়ের জোরে সে কাঁটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বৈ কমে না।

পুরুষমানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা ক’রে চলতেপারে না যেটা অনেক সময়ে মেয়েরা পারে। যেখানে যাহবার নয়, পাবার নয়, সেখানেও তারা বোকার মত ধরা দিয়ে বসে থাকে—এবং নাকাল তার জন্যে যথেষ্ট হয়। কিন্তুপুরুষমানুষই আবার বেগতিক বুঝলে যত সত্বর হাবুডুবুখেতে খেতেও সাঁতরে তীরের কাছে আসতেপারে—মেয়েরা গভীর জলে একবার গিয়ে পড়লে অত সহজে নিজেদের সামলে নিতে পারে না।

তবুও আমি হিরণ্ময়ীকে দূরে রাখবার চেষ্টাই করলাম।

একদিন দুপুরের পরে হিরণ্ময়ীদের বাড়িতে পুলিশএসেছে শুনলাম। পুলিশ কিসের ?একে ওকে জিজ্ঞেস করিকেউ সঠিক উত্তর দেয় না অথচ মনে হ’ল ব্যাপারটা সবাইজানে। এগিয়ে গেলুম—ওদের বাড়ির সামনেরতঁতুলতলায় বড় দারোগা চেয়ার পেতে ব’সে—পাড়ারলোকদের সাক্ষ্য নেওয়া চলছে। দেখলাম গ্রামে ওদের মিত্রবড় কেউ নেই। আমি আগেও যে একথা না জানতাম এমননয়—তবে পাড়াগাঁয়ের কানাঘুসোতে কান দিই নি।

বিকেলের দিকে হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিদিকেথানায় ধরে নিয়ে গেল। কাছারির মুহুরী সাতকড়ি মুখুয্যে আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলতে—ও মেয়েটার তত দোষ দিই নে—মা-ই যত নষ্টের গুরুমশাই। ওই তো ওকেশিখিয়েছে। নইলে মেয়েটার সাধ্যি কি,—কিন্তু মাগী কিডাকাত ! মেয়েটার প্রাণের আশঙ্কা করলি নে একবারও?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হল না। সাতকড়ি আরওবলল—কালীনাথ গাঙ্গুলী কি গ্রাম ত্যাগ করেছে সাধে ?এইজন্যেই সে বাড়িমুখো হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্করাখে না।

এত কথা আমি কিন্তু জানতাম না—এই নতুন শুনলাম।আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম—আমি এখন কি করি ?হিরণ্ময়ীর মা আর দিদি দোষী কি দোষী নয়—সে বিচারেরভার আছে অন্য বিচারকের ওপর—সাতকড়ি মুখুয্যের ওপরনয়। কিন্তু এদের মোকদ্দমা উঠলে উকীল নিযুক্ত কে ক’রে, এদের স্বার্থ বা কে দেখে, এদের জন্যে পয়সা খরচই বা কে করে ?

এদিকে আর এক মুশকিল। ওর মা আর দিদিদিকে যখনধ’রে নিয়ে গেল, হিরণ্ময়ী তখন ওদের বাড়ির সামনেআড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে অন্ধকার রাত, সেরাত্রে সেএকাই বা বাড়িতে থাকে কেমন করে, বাড়িতে আর যখন কেউই নেই—অথচ সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ তাকে নিজের বাড়িতে ডাকলে না। সন্ধ্যার সময় ও-পাড়ার কৈলাস মজুমদারের স্ত্রীএসে ওকে ও-অবস্থায় দেখে বললেন—ওমা, এ মেয়েটাএখানে একা দাঁড়িয়ে আছে যে ! ছেলেমানুষ, বাড়িতে একাথাকবেই বা কি করে ?ওর মা দিদি কি করেছে জানিনে—কিন্তু ওকে আমি চিনি। ও পাগলী, আনন্দময়ী। এসত মা হিরণ, তোমাদের হারিকেনটা বাড়ির ভিতর থেকে নিয়েঘরে চাবি দিয়ে এস। ওকে জায়গা দিলে যদি জাত নাথাকে—তবে না থাকল তেমন জাত !

মজুমদার-গিল্লী যদি কোন কথা না ব’লে নিঃশব্দেহিরণ্ময়ীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন তবে হয়ত কোনই গোলযোগ বাধতো না—কিন্তু শেষের কথাটি ব’লেফেলে তিনি নিতান্ত নির্বোধের মত কাজ ক’রে বসলেন।কাছেই গ্রামের সমাজপতি আচার্যি-মশায়ের বাড়ি। তাদের সঙ্গে বাধলো তুমুল ঝগড়া। শশধর আচার্যের স্ত্রী অনেকক্ষণ নিজের মনে একতরফা গেয়ে যাবার পর উপসংহারেবললেন—ও বড় ভাল মেয়ে—না

?মুখ খুললেই অনেককথা বেরিয়ে পড়বে। সব জানি, সব বুঝি। চুপ করে থাকিমুখ বুজে—বলি মাথার ওপর একজন আছেন, তিনিই দেখবেন সব—আমি কেন বলতে যাই ?

মজুমদার-গিন্গী বললেন—যা কর ন-বৌ, আবার এমেয়েটার নামে কেন যা তা বলছ ?সেটাই কি ভগবানসইবেন ?

আচার্য-মশায়ের স্ত্রী বারুদের মত জ্বলে উঠলেন—আরও দ্বিগুণ চোঁচিয়ে বললেন—ধর্ম দেখিও না বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না। ওই রয়েছে মুখুয়্যেরা, ভট্‌চাফিয়ারা, জিজ্ঞেস কর গিয়ে। ওই মেয়ে ওই পাঠশালার মাস্টার-ছোকরার কাছে রাত বারোটা অবধি কাটিয়ে আসে—রোজ তিনশ তিরিশ দিন। সারারাত্তিরও থাকে এক এক দিন। বলুক ও মেয়েইবলুক, সত্যি না মিথ্যে। ভেবেছিলুম কিছু বলব না—মরুকগে, যার আঁস্‌কুড়, সেই গিয়ে ঘাঁটুক, না ব'লে পারলাম না। কে ও মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়ে কালকে আবার একটাহাঙ্গমা বাধাতে যাবে ?

আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম, কথা বলি নি—কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত ছিল না বলে। চোঁচামেচি শুনে আচার্য-মশায়, সাতকড়ি ও সনাতন রায় ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম—আপনারা আমার মায়ের মত—আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, হিরণকে এ ঝগড়ার মধ্যে মিথ্যে আনবেন না। ও আমার ছাত্রী, ছেলেমানুষ, আমার কাছে যায় সন্ধ্যাবেলা গল্প শুনতে—কোনোদিন পড়েও। রাত নটা বাজতেই চলে আসে। একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ মেয়ের নাম এ-সবের সঙ্গে না জড়ানোই ভাল। মা আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যান।

এতে ফল হ'ল উল্টো। ঝগড়া না থেমে বরং বেড়েউঠল। মজুমদার মশায়ের দুই ছেলে ও ছোট ভাই এসে মজুমদার-গিন্গীকে বকাবকি করতে লাগল—তিনি কেন ওপাড়া থেকে এসে এই-সব ছেঁড়া ল্যাটার মধ্যে নিজেকেজড়াতে যান ?এ বয়সেও তার জ্ঞান যদি না হয় তবে আরকবে হবে...তিনি চলে আসুন বাড়ি। এ-পাড়ার ব্যবস্থাএ-পাড়ার লোকে বুঝবে, তিনি কেন মাথাব্যথা করতেযান—ইত্যাদি।

যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সে ভয়ে ও লজ্জায় কাঠহয়ে দাঁড়িয়েই আছে ওদের বাড়ির সদর দরজায়। ওর চোখেএকটা দিশেহারা ভাব, লজ্জার চেয়ে চোখের চাউনিতে ভয়ের চিহ্নই বেশী। ওর সেই কথাটা মনে পড়ল—জানেন মাস্টার মশায়, আমায় সবাই ভয় করে, সবাই মানে এপাড়ায়—আমার সঙ্গে লাগতে এলে দেখিয়ে দেব না মজা ?

বেচারী মুখরা হিরণ্যয়ী !

শেষ পর্যন্ত কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী ওকে না নিয়েই চলেগেলেন। তাঁর দেওর ও ছেলেরা একরকম জোর করেইতাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললুম—হিরণ, তুমি কিছুভেবো না। আমি এতক্ষণ দেখছিলাম এরা কি করে। যেভাবে তোমাকে ডাকতে পারি নি, সে ভয় আমার কেটেগিয়েছে। তুমি একটু একলা থাক—আমি কাওরাপাড়া থেকে মোহিনী কাওরাণীকে ডেকে আনছি। সে তোমার ঘরেরবারান্দাতে শোবে রাত্রে। তাহলে তোমার রাত্রে একাথাকবার সমস্যা মিটে গেল। আর এক কথা—তুমি রান্নাচড়িয়ে দাও; চাল-ডাল সব আছে তো ?

কাওড়াপাড়া থেকে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশীলাগল। মোহিনী বুড়ীকে চার আনা পয়সা দিয়ে রাত্রেহিরণদের বাড়িতে শোবার জন্য রাজী করিয়ে এলুম। ফিরেএসে দেখি দালানের চৌকাঠে বসে হিরণ্যয়ী হাপুস নয়নেকাঁদছে। অনেক করে বোঝালুম। বড় কষ্ট হল ওকে এবস্থায় দেখে। বললে—মার আর দিদির কি হবে মাস্টারমশায় ?আপনি কালই বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের ফাঁসি হবে না তো ?

হেসে সাঙ্ঘনা দিলাম। বললাম—রাঁধ হিরণ। খাওয়াদাওয়াকর। কিছু ভেবো না—আমি কাল রাণাঘাট যাব। ভালউকীল দিয়ে জামিনে খালাস করে নিয়ে আসবার চেষ্টাকরব, ভয় কি ?

হিরণ কিছুতেই রাঁধতে চায় না—শেষে বললে—আপনিওএখানে খাবেন কিন্তু। ঠিক তো ?

ও রাঁধছে ব'সে, আমাকে রান্নাঘরেই বসে থাকতেহল—ও যেতে দেয় না, ছেলেমানুষ, ভয় করে। কেবলজিজ্ঞেস করে, মা আর দিদির কি হবে !

রান্না হয়ে গেল, ঠাই করে আমায় ভাত বেড়ে দিল।এদিকে হিরণ বড় অগোছালো, কুটনো-বাটনা, এঁটো-কাঁটা, ভাতের ফেন, আনাজের খোসাতে রান্নাঘর এমন নোংরাকরে তুলেছে ! ভাত বাড়তে গিয়ে উনুনের পাড়ে আঁচললুটিয়ে পড়েছে—নিতান্ত আনাড়ি।

বললাম—দিনমানে কোনরকমে একা থেকে। আমি সন্ধ্যের আগেই রাণাঘাট থেকে ফিরবো। রুঁধে খেও কিন্তু। না হলে বড় রাগ করব।

মোহিনী কাওরাণী এল রাত ন'টার পরে। তার পরেআমি আমার বাসায় চলে এলুম।

পরদিন রাণাঘাটে গিয়ে দেখি কেস্ ওঠে নি আদালতে। উকীল ঠিক করে তার সঙ্গে জামিনের কথাবার্তা ব'লে এলুম।ফিরবার সময় হিরণায়ীর জন্যে দু-একটা জিনিস কিনে নিলুমওকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে। ফিরে দেখি ও ব'সে ব'সেআবার কাঁদছে কালকের মত। সারাদিন বোধ হয় রাঁধে নি, কিছু খায় নি। স্নানও করে নি, দু-এক গাছা রুক্ষ চুল মুখের আশেপাশে উড়ছে। মহা বিপদে প'ড়ে গেলুম ওকে নিয়ে কি করি এখন ?ওর বাবাকে আজ রাণাঘাটে পৌঁছেই টেলিগ্রাম করেছি, যদি তা পেয়ে থাকেন, তবে কাল তিনিএসে পৌঁছলেও তো বাঁচি। নইলে হিরণায়ীকে ভাবছিকালীগঞ্জ বৌদিদির কাছে রেখে আসব। কারণ, এসেশুনলুম মোহিনী বুড়ী ব'লে গিয়েছে সেরাত্রে এখানে আর শুতে আসতে পারবে না।

ও আমায় দেখেই ছুটে এসে বললে—মাকে দিদিকেদেখে এলেন মাস্টারমশাই ?তারা কেমন আছে ?খালাসপেলে না ?

আমি ওদের নিজে দেখতে যাই নি, উকীলের মুখেহিরণায়ীর সংবাদ পাঠিয়ে বলেছিলুম হিরণায়ীর জন্যে যেনতারা কিছু না ভাবে। বললাম সেকথা।

তার পর হিরণায়ী আমাকে বালতি ক'রে জল তুলে দিলেন্নানের জন্যে—ঘরে প্রদীপ জ্বলে উনুন ধরিয়ে চায়ের জলচড়ালে। রাণাঘাট থেকে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলুম, তার বেশী অর্ধেক আমায় রেকাবিতে ক'রে চায়ের সঙ্গেজোর ক'রে খাওয়ালে—তার পর রান্না চাপিয়ে দিলে। ওরমনে সুখ নেই, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে, ছেলেমানুষ, নইলে ওর মত হাস্যময়ী আনন্দময়ী চঞ্চলা মেয়ে এতক্ষণ কত কথা বলত, হাসি-খুশীতে ঘর ভরিয়ে তুলত।

একবার জিজ্ঞেস করলে—রাণাঘাটে নাকি সার্কাসএসেছে সবাই বলে ?দেখেছেন আপনি ?এত দুঃখেরমধ্যেও ওর ছেলেমানুষি মন সার্কাসের সম্বন্ধে কৌতূহলী নাহয়ে পারে নি ভেবে আমার হাসি পেল।

এ রাত্রে মোহিনী বুড়ী এল না—আমি ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরের বারান্দাতে শুয়ে রইলাম। বারান্দায় বিছানাপাতছি, ও আবার এত সরলা, নিষ্কলুষ—আমায় অবাক হয়েজিজ্ঞেস করলে, আপনি বাইরে শোবেন কেন ?

কোন নীতিবাদের সঙ্কোচ এনে ফেলে ওর নিষ্পাপ মনেদাগ দিতে আমার বাধল। বললাম—দেখছনাকি রকম গরমআজ ?বাইরে শোওয়াই আমার অভ্যেস, তা ছাড়া—।

সারারাত দু-জনে গল্প করে কাটালুম। ও ঘর থেকে কথাবলে, আমি বারান্দা থেকে তার উত্তর দিই।—বাবা বোধহয় কাল আসবেন, না ?মা, দিদি কবে আসবে ?সার্কাসওয়ালা কোথায় তাঁবু ফেলেছে ?কলকাতায় কখনওয়াই নি—একবার যাবার ইচ্ছে আছে। কলকাতার থিয়েটারদেখতে কেমন ?চৌধুরীরা বোধ হয় মোহিনী বুড়ীকে বারণক'রে দিয়েছে এখানে আসতে। আমার শীত করছে কিনা।রাত বেশী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে দেবার

একটা মোটা চাদরদেবো ?আরব্য-উপন্যাসের মত গল্প আর নেই। আচ্ছা, অঙ্ককতদূর শেখা যায় ?বিদ্যার শেষ নেই—না ?এম-এ পাসকরে আরও পড়া যায়, পড়বারআছে ?

ওর বাবা এলেন পরদিন সকাল দশটার সময়। তাঁর মুখে শুনলুম পুলিশ থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শীঘ্র বাড়িএসে মেয়ের ভার নিতে। তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী লোক, দু-একটা কথা শুনেই বুঝতে দেরি হ'ল না। আমার ওপরআদৌ তিনি প্রসন্ন হ'তে পারলেন না—তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া তত দূরের কথা, সেটাকেই তিনি আমার একটা অপরাধ ব'লে গণ্যকরে নিলেন এবং যে মুখ্যে ও চৌধুরীরা পরশু সন্ধ্যাবেলাহিরণ্যীকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায় নি, তাদেরই বাড়িতে খোশামোদ ক'রে তাদের সঙ্গে এ বিপদে পরামর্শ চাইতেগেলেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখলুম, তিনি হিরণ্যীকে আদৌদেখতে পারে না। আমার সামনেই তো তাকে তাড়না, তর্জন-গর্জন যথেষ্ট করলেন এ নিয়ে যে সে রাত্রে চৌধুরী-গিনীর পায়ে পড়ে কেন অনুরোধ করে নি তাকে জায়গা দেবার জন্যে। কারণ, তারা দেখলুম লাগিয়েছে যে তাদের কি আর ইচ্ছে ছিল না ওকে জায়গা দেবার ?ওমেয়ের তা ইচ্ছে নয়। হিরণের অপরাধ সে মুখ ফুটে কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। এ ওরা কেউ বুঝল না যে হিরণের বয়সের মেয়েরা মুখে কোন নাটুকে-ধরনের কথাবলে আশ্রয় চাইতে পারে না পরের কাছে—বিশেষ ক'রেহিরণ্যীর মত একটু তেজী মেয়েরা।

আমি হিরণ্যীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে কালীগঞ্জে চলেএলুম পরদিনই সকালেই। শুনেছিলুম হিরণ্যীর মা ও দিদিরাগাঘাট থেকে প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে এসেছেন।

কালীগঞ্জে এসে বসলুম বটে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্যকরলুম, মনের কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। হিরণ্যীর সেইশুকনো মুখখানা কেবলই মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় ওর যে মুখ দেখেছিলাম, যেদিন ওর মাকে আর দিদিকেথানায় নিয়ে গেল। হিরণ্যীর ব্যথা,...হিরণ্যীর দুঃখ,...ওই রকম বাড়িতে, ওই গাঁয়ের আবহাওয়ায় হিরণ্যীর মত মেয়ে শুকিয়ে ঝড়ে পড়বে। কে-ই বা দেখবে, বুঝবে ওকে ?একদিন মালতীর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই ভাবতুম। কতভেবেছি। এখন বুঝি কি দুর্জয় অভিমান করেই চলেএসেছিলাম ওর কাছ থেকে ! কিছুতেই সে অভিমানভাঙলো না। তার পর দাদা মারা গেলেন, দাদার সংসারপড়ল ঘাড়ে, নইলে হয়ত আবার এতদিনে ফিরে যেতাম।কিন্তু বৌদিদিদের নিয়ে তো দ্বারবাসিনীর আখড়াতে গিয়েউঠতে পারি নে ?একসময় যার ভাবনায় কত বিনীত রজনী কাটিয়েছিলে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, এই মালতী এখন আমারমনে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আ'ছে—হয়ে এসেছে। আর তোকাকে চোখে দেখলুম না ?ক্রমে তাই দূরে গিয়ে পড়ল। কিকরব, মনের ওপর জোর নেই—নইলে আমি কি বুঝতেপারি নে কত বড় ট্রাজেডি এটা মানুষের জীবনের ?শ্রীরামপুরের ছোট-বৌঠাকুরাণ আজ কোথায় ?কে বলবেকেন এমন হয় !

একদিন আবার হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তখন মাস দুই কেটে গিয়েছে, কামালপুরে আর যাই নি, সেখানে আমার বাসায় জিনিসপত্র এখনও রয়েছে—সেগুলো আনবার ছুতো করেই গেলুম সেখানে। মাস দুই পরে, গ্রামঠাণ্ডা হয়েছে, কেবল শুনলুম হিরণ্ময়ীরা একঘরে হয়ে আছে। হিরণ্ময়ী আগের মতই ছুটে এল আমি এসেছি শুনে। এখানে ওর চরিত্রের একটা দিক আমার চোখেপড়ল—লোকে কি বলবে এ ভয় ও করে না—এখানে মালতীর সঙ্গে ওর মিল আছে। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ওরতফাৎও আমি বুঝতে পারি। হিরণ্ময়ী যেখানে যাবে, সেখানে পেছন ফিরে আর চায় না—মালতীর নানা পিছুটান। সবাই সমান ভালোবাসতেও পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন আছে। খুব বড় শিল্পী, কি খুব বড় গায়ক যেমন পথেঘাটে মেলে না—খুব বড় প্রেমিক বা প্রেমিকাও তেমনি পথেঘাটে মেলে না। ও প্রতিভা যে যে-কোনো বড় সৃজনী-প্রতিভার মতই দুর্লভ। এ কথা সবাই জানে না, তাইয়ার কাছে যা পাবার নয়, তার কাছে তাই আশা করতে গিয়ে পদে পদে ঘা খায় আর ভাবে অন্য সবারই ভাগ্যে ঠিকমত জুটছে, সে-ই কেবল বঞ্চিত হয়ে রইল জীবনে। নয়ত ভাবে তার রূপগুণ কম, তাই তেমন ক'রে বাঁধতে পারে নি।

হিরণ্ময়ীর তনুলতায় প্রথম যৌবনের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই দু মাসের মধ্যে। আমায় বললে—কখন এলেন? আসুন আমাদের বাড়িতে। মা বলে দিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। কতদিনের ছুটি দিয়েছিলেন পাঠশালাতে, দেড় মাস পরে খুললো?

—ভাল আছ হিরণ? উঃ মাথায় কত বেড়ে গিয়েছ?

—এতদিন কোথায় ছিলেন? বেশ তো লোক। সেই গেলেন আর আসবার নামটি নেই?

হয়ত দু-বছর আগেও এ কথা কেউ বললে বেদনাতুর হয়ে ভাবতাম, আহা, দ্বারবাসিনীতে ফিরলে মালতীও আমায় এ-রকম বলত। কিন্তু সময়ের বিচিত্র লীলা। এসম্পর্কে মালতীর কথা আমার মনেই এল না।

দু-দিন কামালপুরে রইলাম। হিরণ্ময়ী এ কথা ভাবে নিয়ে, আমি আমার জিনিসপত্র আনতে গিয়েছি ওখানে, সেভেবেছিল আমি আবার পাঠশালা খুলব। ওখানেই থাকব। এবার কিন্তু সে আসবার সময় তর্ক, ঝগড়া করলে না, যেমন করে থাকে। শুধু শুকনো মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমার যাওয়া। ওর সে আগেকার ছেলেমানুষি যেন চলে গিয়ে একটু অন্য রকম হয়েছে। তবুও কত অনুরোধ করলেওখানে থাকবার জন্যে—গাঁ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, কেন আমি যাচ্ছি, গাঁয়ের ছেলেরা তবে পড়বে কোথায়?

কামালপুর গাঁ পিছু ফেলেছি, মাঠের রাস্তা, গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে চলেছে। কি মন খারাপ যে হয়ে গেল! মাঠের মধ্যে কচি মটর-শাক, খেসারি-শাকের শ্যামল সৌন্দর্য, শিরীষগাছের কাঁচা শাঁট ঝুলছে, বাসুদেবপুরের মরগাওঁর ভাগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। হিরণ্ময়ীর নিরাশার দৃষ্টি বুকে যেন কোথায় বিঁধে রয়েছে, খচ্ খচ্ ক'রে বাজছে। বেলা যায়-যায়, চাকদার বাজার থেকে গুড়ের গাড়ির সারি ফিরছে, বোধ হয় বেলে কিছু ডাঙ্গার বাজারে রাত কাটাবে। জীবনটা কি যেন হয়ে গেল, এক ভাবি আর হয়, কোথায় চলেছি আমিই জানি না। কেনই বা অপরের মনে এত কষ্ট দিই? এই রাস্তা রোদমাখানো মটর-মুসুরির মাঠ যেন বটেশ্বরনাথের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকোর সারি মুগ্ধের দিকে যেত, আমি মালতীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাষাণ-বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ মরগাওঁর ওপারে জমা সন্ধ্যার কুয়াশার মত—ফাঁকা, দু-দিনের জিনিস। এখানে ফল পাকেনা। জেরুসালেম পাথরের দেশ।

এর কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা আমার কাছে এলেন কালীগঞ্জে। আমায় একবার তাদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে। আর একটা কথা, মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি গরীব, অবস্থা আমি সবই জানি, গ্রামের সমাজে একঘরেও বটে। দু-তিন জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল,

নানা কানাঘুঘো শুনেতারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একগুঁয়ে, তাকেদেখতে আসছে শুনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। অত বড় মেয়ে, এখনও জ্ঞান-কাণ্ড হল না, চিরকাল কি ছেলেমানুষিকরলে মানায় ?সুতরাং তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আমিযদি ব্রাহ্মণের এ দায় উদ্ধার না করি তবে তিনি কালীকান্ত গাঙ্গুলী, সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার কি মত ?

আমি আর কিছুই ভাবলাম না, ভাবলাম কেবলহিরণ্ময়ীর আশাভাঙা চোখের চাউনি আর তার শুকনোমুখ, সেদিন যখন জিনিসপত্র বাঁধছি সেই সময়কারের।

একদিন হিরণ্ময়ী বললে—একটা কথা শোন। যেদিনতুমি প্রথম পাঠশালাতে পড়াতে এলে, আমি তোমার কাছেগেলাম, সেদিন থেকে তোমায় দেখে আমার কেমন লজ্জা করত। সেই জন্যে কাছে বসতে চাইতাম না। তার পর তুমিএকদিন রাগ করলে, তাতে আমারও খুব রাগ হল। তুমিতার পর বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিনভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনেরসজনেতলায় চলে এলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনেরমধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে !

হিরণ্ময়ী গুছিয়ে কথা বলতে শেখে নি এখনও।

ভগবান জানেন বিয়ের সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়েগিয়েছিলুম। সপ্তসমুদ্র পারের কোন্ দেশে অনেক দূরে এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাস্যমুখী তরুী কিশোরীপ্রদীপ হাতে ভাঙা বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে...পুকুরপাড়ের তমালবনের আড়ালে তার সঙ্গে সেইসেই সব কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত ঠাকুর-দেবতার কথা, সে সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন?কোথায় গেল সে মেয়েটি ?আর তাকে তেমন ক'রে তো চাই না ?যেন কত দূর-জন্মেতার সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্টহয়ে এসেছে—তাকে যেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তারস্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না ?কোথায় গেল সে-সবদিন, সে-সব প্রদীপ-দেখানো সন্ধ্যা ?

বছরখানেক পরে একদিন রাণাঘাটে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেদাঁড়িয়ে আছি। মুর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে অনেকগুলো বৈষ্ণবনামলো। তারা যাবে খুলনার গাড়িতে। তাদের মধ্যেএকজনকে পরিচিত বলে মনে হল। কাছে গিয়ে দেখিদ্বারবাসিনীর আখড়ার সেই নরহরি বৈরাগী—যে একবার জীবগোস্বামীর পদাবলী গেয়েছিল। সে পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, মাঝে মাঝে আখড়ায় আসত, আবার কোথায় চলেযেত। নরহরিও আমায় চিনলে, প্রণাম করে বললে—এখানে কোথায় বাবু ?এটা কি দেশ নাকি ?আপনিতো অনেক দিন দ্বারবাসিনী যান নি ?আর যাবেনই বা কি, সব শুনেছেন বোধ হয়, আখড়া আর সে আখড়া নেই।দিদিঠাকুরণ মারা যাওয়ার পরে—

—কে ?

—কেন আপনি জানেন না ?মালতী দিদিঠাকুরণ তো আজ বছর চারেক মারা গিয়েছেন।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। নরহরি আপনমনেই ব'লে যেতে লাগল—এখন উদ্ধবদাসের এক ভাইপো তার সেবাদাসী নিয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সে-ই এখন কর্তা। উদ্ধবদাস তো বুড়ো হয়েছে, সে কিছুদেখে-শোনে না। এখন অতিথি-বোষ্টম গেলে আর জায়গাহয় না। মালতী দিদিঠাকুরণ তো মানুষ ছিলেন না, স্বর্গের দেবী ছিলেন, কি বাপের মেয়ে ! তিনি স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন, এখন তাঁর অত সাধের আখড়ার কি দশা হয়েছে এই চার বছরে, দেখে চোখে জল আসে বাবু। তাই বড়-একটাসেখানে যাই নে।

ওরা চলে গেলে আমি স্টেশনের বাইরে সেগুন বাগানে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম। কতক্ষণ...কতক্ষণ। হিসেব করেদেখলাম আমি যখন বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে তখনই সে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ আমি আখড়া ছেড়ে আসবার এক বছরপরেই।

আজ হঠাৎ মনে হল তার ওপর কি সুবিচার করেছিলুম ?অভিমান ভাঙবার সুযোগও তাকে আর একবার দিই নি। আমার জীবনে সে মরে গিয়েছে অনেক দিন, যদিও খবরটাআজ পেলাম। আমার মন অলক্ষিতে

আত্মরক্ষা করেছে, বেদনার স্থানে শক্ত আবরণ গড়ে তুলেছে—শামুক যেমন আত্মরক্ষার জন্যে খোলা তৈরী করে। আজ সে খোলা হয়েপড়েছে শক্ত অনুভূতিহীন—অন্তত এতদিন তাই ভাবতাম। কিন্তু খোলার আবরণের তলায় ব্যথার জায়গাটা আজ মনেহচ্ছে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সারে নি।

কে আজ উত্তর দেবে—আমি চলে এলে গোপনে একটুখানি চোখের জলও কি ফেলে নি সে কোনদিন ? বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দিতে গিয়ে কখনো একদিনও কি অন্যমনস্ক হয় নি ? দিনের কাজ মিটে গেলে সে যখন ‘পাষণ্ড-দলনের অনুকরণে’ বই লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারসেই খাতাখানা খুলে বসত, একদিনও কি আমার কথা মনেপড়েনি...কত ঠাট্টা যে করতুম তার সেই বই লেখা নিয়ে ! আমার যদি আজ দশ হাজার টাকা থাকত, আমি চাইলেই সব টাকাই দিয়ে দিতে পারতাম, যদি এই খবরগুলো আমায়কেউ দিতে পারতো। টাকার মায়া করতুম না—করি নিকোনদিন। এই খবরের বদলে আমি কি না দিতে পারি !

পাগলের মত কি ভাবছি যা তা বসে ! লাভ কি আজ এ-সব ভাবনার ? ভালই হয়েছে মালতী, তোমার সঙ্গে আরআমার দেখা হয় নি। সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে পল্লীপ্রান্তের বনে মরচে-লতায় ফুল ফোটে, সুবাসে পথচারীদের মন আনন্দেভরিয়ে তোলে কিন্তু কতদিন তার আয়ু ? জ্যোৎস্না লুকিয়ে আঁধার পক্ষ নামে, বনফুল ঝরে যায়, পুষ্পসুরভি হিমের রাত্রির ঘন কুয়াশায় চাপা পড়ে, নয়ত অকাল বর্ষারবারিধারায় ধুয়ে মুছে যায়। মানুষের অনেক সেবা তুমিকরেছিলে, মানুষের মনে তোমার রূপ ভগবান ম্লান হ’তে দিলে না। ফুলের সুবাস চলে গেলে বনলতা পাছে অনাদৃত হয় ! তোমার বেলা ভগবান তা সহ্য করবেন না।

সেগুনবাগান থেকে উঠে এলুম, তখন রাত হয়েগিয়েছে।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একবার মালতীকে বলেছিলুম—আমাদের গাঁয়ে একটা হাতভাঙা বিষ্ণুমূর্তি আছে। ছেলেবেলায় তাঁকে বড় ভালবাসতুম। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁকে নিয়ে এসে তোমার বাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকরব।

দেখতে দেখতে কত দিন হয়ে গেল।

তার পর সাত-আট বছর কেটে গিয়েছে।...

আমার সে অল্প বয়সের ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে অনেকদিন। তবু সে-সব দিনের ছলছাড়া মুহূর্তগুলোর জন্যে এখনও মাঝে মাঝে মন কেমন ক’রে ওঠে, যদিও এখন বুঝেছি হারানো-বসন্তের জন্যে আক্ষেপ করে কোন লাভ নাই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখির কাকলিতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে...তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।

মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হ’লপৃথিবী ছেড়েকোন প্রেমের লোকে, নক্ষত্রদের দেশে, নক্ষত্রদের মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।

কেবল মাঝে মাঝে গভীর ঘুমের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে যেন মাথার শিয়রে ব’সে থাকে। ঘুমের মধ্যেই শুনি, সে গাইছে:—

মুক্ত আমার প্রাণের মাঠে।

ধেনু চরায় রাখাল কিশোর

প্রিয়জনে লয় সে হরি

ননী খায় সে ননীচোর।

সেই আমার প্রিয় গানটা...যা ওর মুখে শুনতে ভালবাসতুম।

চোখাচোখি হ’লেই হাসি হাসি মুখে পুরনো দিনের মততার সেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বলছে—
পালিয়ে এসে যে বড় লুকিয়ে আছো ? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই ?

তখন আমার মনে হয় ওকে আমি খুব কাছে পেয়েছি। দ্বারবাসিনীর পুকুরপাড়ের কাঞ্চনফুল-তলার দিনগুলোতেতাকে যেমনটি পেতুম, তার চেয়েও কাছে। গভীর সুষুপ্তিরমধ্যেই তন্দ্রাঘোরে বলি—সব মনে আছে, ভুলিনি মালতী।তোমার ব্যথা দিয়ে, ব্যর্থতা দিয়ে তুমি আমাকে জয় করেছ। সে কি ভোলবার ?